Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শ বর্ষ] ১৩৩৮ বৈশাখ, [১ম সংখ্যা]

১।	নব বর্ষ—	১
২।	শ্রীমদ বালানন্দ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২
৩।	স্মৃতির-রেখা—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৬
৪।	মায়াজাল—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৭
৫।	স্বর্গীয়-বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০
৬।	লুচি মোণ্ডার বিবাদ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৫
৭।	বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব	১৭
৯।	নিরাশায় আশার আলো—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	২৮
১০।	বন্ধকী পুত্র—	২৯
১১।	জীবই কৃষ্ণ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৩১

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

৩৯নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 6-7-31

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

গুরে যম জারমলীন সর্ব্বত্রগামী

পথ্যের বিচার না

দিলে জ্বর ছাড়ে!

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

82।B, মুজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Telegram,... GERMLING. Telephone No. 1388, B, B.

নিবেদন।

গ্রাহক-মহোদয়গণের প্রতি সানুনয় নিবেদন :—

১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা "জন্মভূমি" আপনাদের সমীপে প্রেরিত হইল। আশা করি, বৈশাখ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই অবিলম্বে জন্মভূমির ১৩৩৮ সালের বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা সত্বর প্রেরণ করিয়া উৎসাহিত করিবেন। আগামী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হইলেই আপনাদের নিকটে ভিঃ পিঃ পোষ্টে প্রেরিত হইবে। পোষ্ট আফিসের নূতন নিয়মানুসারে ভিঃ পিঃ বা রেজিষ্টার্ড প্যাকেট তিন দিনের মধ্যেই গ্রহণ না করিলে ফেরত আসিবে। এ নিয়মে ভিঃ পিতে খরচও অধিক লাগে অতএব গ্রাহকগণের মণিঅর্ডারে জন্মভূমির বার্ষিক মূল্য প্রেরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। মণিঅর্ডারে যাঁহাদের টাকা পাঠাইতে অসুবিধা হইবে, দয়া করিয়া লিখিবেন আমরা জন্মভূমি ভিঃ পিতে পাঠাইব।

শুভ সংবাদ।

পাঠকমহোদয়গণের অনুরোধে আমরা বর্ত্তমান বর্ষে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্‌বালানন্দ মহাত্মার জীবনী জন্মভূমিতে প্রচুর পরিমাণে প্রতি মাসে প্রকাশ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছি।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত।
৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট পোষ্ট বিডনষ্ট্রীট কলিকাতা।

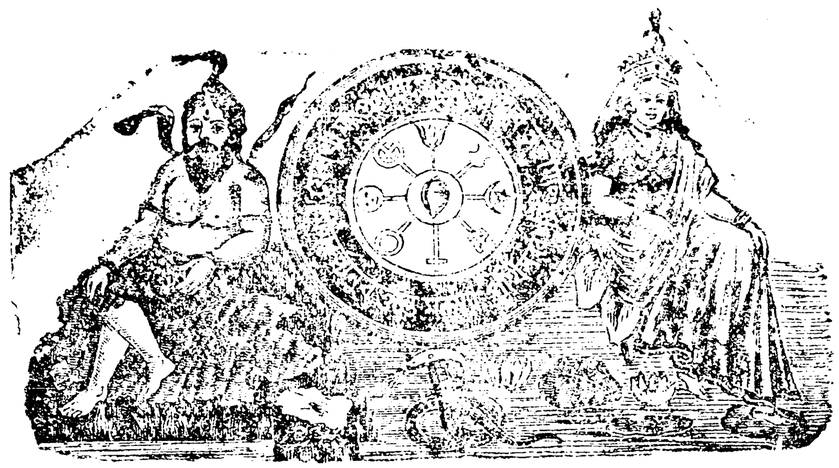

২২০/৩৭

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।
"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ } ১৩৩৮ সাল বৈশাখ, { ১ম সংখ্যা।

নব বর্ষ।

পরম করুণাময়ি! মা জগদম্বার অপার করুণায় এবং আমাদের পরমহিতৈষী বন্ধু-বান্ধবগণের অকৃত্রিম অনুকম্পায় "জন্মভূমি" মাসিক-পত্রিকা বর্ত্তমান বৈশাখ মাসে সপ্তত্রিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণকে নব-বর্ষের সাদর-সম্ভাষণ ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ কামনা করিতেছি। "জন্মভূমি" মাসিক-পত্রিকা সুদীর্ঘকাল যথানিয়মে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও সাহিত্য সেবায় কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়াছে। বিপদবারণ শ্রীমধুসূদনের কৃপায় বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া "জন্মভূমি" আপন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতেছে।

অসতো মা সদ্ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্ম্মা অমৃতং গময়। আবীরাবীর্ম্ম এধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥"

হে ভগবন্! তুমি আমাদের অসৎ হইতে সৎ-স্বরূপে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃ-স্বরূপে, মৃত্যু হইতে অমৃত-স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ! আমাদের নিকট প্রকটিত হও। হে রুদ্র! তুমি প্রসন্নমুখে আমাদিগকে রক্ষা কর।

হে নবীন! হে পরাৎপর! হে পরম পুরুষ! তোমায় কোটি কোটি নমস্কার, স্বাগতম্ সুস্বাগতম্

হে প্রবীণ! তোমায়ও কোটি কোটি নমস্কার— শিবাস্তে পন্থানঃ সন্তু।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নর্ম্মদাতীর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর একবারের ঘটনা এইরূপ। গুরুদেব একাকী নর্ম্মদাতীর ধরিয়া চলিয়াছেন। এ সময় বেলা যাইয়া প্রায় সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। যে স্থান দিয়া তিনি চলিতেছেন তাহা এরূপ যে, যদি ঠিক রাস্তা ধরা না হয় তবে ভুলক্রমে নর্ম্মদা অতিক্রান্তা হইয়া পরিক্রমা খণ্ডিতা হইবার সম্ভাবনা। এজন্য কি করিবেন, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। গ্রাম সেখান হইতে এক বা দেড় মাইল দূরে দেখা যাইতেছিল। এমত সময়ে দেখিলেন যে, এক সুন্দরী যুবতী মায়ী একটু তফাৎ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এরূপ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এ মায়ীর নিকট যাইয়া পথ জিজ্ঞাসা করা অকর্ত্তব্য মনে করিলেন ও একমনে চলিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় যেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন, অমনি দেখিলেন যে, মায়ীটী একেবারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। গুরুদেব শুনাইয়াছেন যে, এ মায়ীর চিত্র এখনও তাঁহার মনে বেশ উদিত আছে। তাঁহার কক্ষে এক ঝুড়ী ঘুঁটে ও সে দেশের মেয়েরা সচরাচর একখণ্ড কাপড় যেরূপ মস্তকে বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া থাকে, ইঁহারও সেইরূপ ছিল। মহারাজের আপনা হইতে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। মায়ী নিজেই জানিতে চাহিলেন যে তিনি কি পরিক্রমাকারী সাধু? মহারাজ "হাঁ" বলিলে কোন্ পথ ধরিয়া যাইতে হইবে দেখাইয়া দিয়া তিনি অন্য পথে চলিয়া গেলেন। কোথায় তিনি থাকেন জিজ্ঞাসা করায় মায়ী অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দূরের গ্রামটী যেন দেখাইয়া দিলেন। মহারাজের জ্ঞান হইল অদূরবর্ত্তী মহারাজপুরের তিনি বাসন্দা। কিন্তু এ মায়ীর চলিয়া যাইবার কিঞ্চিৎ পরেই মহারাজের চমক ভাঙ্গিল। তখন স্মরণ হইল যে অন্যান্য সাধুগণের নিকট তিনিও শুনিয়াছেন যে এরূপ সঙ্কট স্থানে নর্ম্মদা মাতা দর্শন দিয়া পথ জ্ঞাপন করেন। তখন ভাবিতে লাগিলেন যে ইনি নিশ্চয় নর্ম্মদা মাতা। নতুবা এ সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রাম হইতে এই বহু দূরে এরূপ যুবতী স্ত্রীলোকের আগমন নিতান্তই অসম্ভব। এরূপ স্থির করিয়া এ মায়ীকে দেখিবার জন্য তিনি বহুদূর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন

না। যাহা হউক, এরূপ অযাচিতভাবে দেবীর দর্শন পাইয়া তিনি আনন্দে বিভোর হইলেন ও সে দিন সে স্থানেই আসন স্থাপন করিলেন। মনে আরও ইচ্ছা হইল যে এ মায়ী মহারাজপুরের কোন স্ত্রীলোক কি না জানিতে হইবে। এজন্য ২ দিন সে স্থানে অবস্থান করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ ছলে উক্ত মহারাজপুরের প্রত্যেক ঘরে যাইয়া সেরূপ আকৃতিবিশিষ্টা কোন সুন্দরী মায়ী আছে কি না দেখিয়া বেড়াইলেন। সকল ঘরের মায়ীদিগকে দেখিলেন, কিন্তু তিনি যাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখিলেন না। ইহার পর বিশ্বাস হইল যে নর্ম্মদা দেবীর যথার্থ কৃপা তাঁহার উপর হইয়াছে ও এজন্য দর্শন দিয়াছেন। ইহার পর মাতাকে অন্তরে ধ্যান করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

আর একটী ঘটনা এইরূপ। মহারাজ একাকী নর্ম্মদাতীরে চলিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যে দুইটী সাধু ছিলেন তাঁহারা অগ্রে চলিয়া গিয়াছিলেন। পাছে পথ ভুল হয় এজন্য একেবারে নর্ম্মদাতীর ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। এরূপ ভাবে চলিতে চলিতে বেলা অধিক হইল দেখিয়া নদীর কিনারায় আসন স্থাপন করিলেন। পরে নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনয়নপূর্ব্বক ধুনী জ্বালাইয়া রুটী প্রস্তুতের বন্দোবস্ত করিলেন, ইহা প্রস্তুতও হইল। এমন সময়ে দেখিলেন যে এক বৃদ্ধা ভীলমায়ী মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে এক লাঠিতে ভর দিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া আসিল। রুটী প্রস্তুত দেখিয়া কিছু খাদ্য ভিক্ষা চাহিল। মহারাজ ৪ খানি মাত্র রুটী করিয়াছিলেন। ইহা হইতে দুইখানি তিনি সেই বৃদ্ধা মায়ীকে দিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া মায়ীটী একখানি দিলেই হইবে বলিল। মহারাজ তথাপি দেড়খানি তাহাকে দিলেন ও আড়াইখানি নিজের জন্য রাখিয়া নদীতে জল আনিতে গেলেন। জল লইয়া ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর মায়ীকে দেখিতে পাইলেন না। ইহার পরই মহারাজের চমক ভাঙ্গিল। এরূপ বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ কিরূপে অদৃশ্যা হইলেন। খাদ্য ভিক্ষা করিবার পর দুইখানি দিতে চাহিলেও একখানি মাত্রই চাহিলেন। ইহা নিশ্চয়ই নর্ম্মদা মাতার এক বিভূতি। এই ভাবিয়া তীরের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। কিন্তু সে বৃদ্ধা মায়ীকে আর দেখিলেন না।

উপর্য্যুপরি এই ২।৩টী গল্প শুনিয়া আমার নব্যশিক্ষিত পাঠকগণ হাসিতেছেন ইহা বুঝিতেছি। তাঁহারা বলিতেছেন যে বন জঙ্গলে কে কোথায় অভুক্ত হইল, কোন্ পাহাড়ী মায়ী একটু দুধ দিল, আর বিশ্বাস হইল কি না নর্ম্মদা দেবী দর্শন দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তর্ক করিয়া কিছুই বুঝাইবার নাই।

তবে এতটুকু বলিতে পারি যে ভক্তগণকে পরীক্ষার জন্য, বিপদাপদ হইতে উদ্ধার জন্য, তাঁহাদের মনোভিলাষ পূরণ জন্য দেবদেবীরা যে নানাভাবে দর্শন দিয়া থাকেন তাহা ভক্তমাল ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িলে জানিতে পারিবেন। কথিত আছে, সাধক-চূড়ামণি রামপ্রসাদ সেনের পাছে ভক্তির গান বন্ধ হয়, এজন্য দেবী নিজেই কন্যারূপে তাঁহার সহিত বেড়া বাঁধিয়াছিলেন। তুলসী দাস শ্রীরাম লক্ষ্মণকে দেখিয়াছিলেন। এ বৈদ্যনাথ বা তারকেশ্বরে এখনও ব্যাধিগ্রস্ত বহু ব্যক্তি ধারণা দিয়া ঔষধ প্রাপ্ত হয়।

মধ্য ভারতের প্রসিদ্ধ দস্যু তান্তিয়া ভীলের নাম অনেকেই অবগত আছেন। নর্ম্মদা ভ্রমণকালে একবার তাঁহার সহিত মহারাজের দেখা হইয়াছিল। তিনি একাকীই ভ্রমণ করিতেছিলেন। এরূপ করিতে করিতে ওঁকার ঝাড়ী নামক স্থানে আসিয়া এক স্থানে আসন স্থাপন পূর্ব্বক রুটী প্রস্তুত করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রসাদ পাইবে জানাইল। ইহা শুনিয়া মহারাজ ঝোলা হইতে আরও কিছু আটা বাহির করিয়া দুইজনের মত রুটী প্রস্তুত করিলেন। সে আনন্দ-চিত্তে এ প্রসাদ গ্রহণ করিল। আহার শেষ হইবার পর সে ব্যক্তি কাপড়ের ভিতর হইতে ১০।১২ ভরি ওজনের এক ছড়া সোনার হার বাহির করিয়া মহারাজের পায়ের সম্মুখে ধরিল, ও উহা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ইহা দেখিয়াই মহারাজ যেন অবাক্ হইলেন। ভিক্ষুক বেশে অন্ন গ্রহণ করিবার পর এরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার দান বড়ই বিচিত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল! গুরুদেব এ দ্রব্য লইবেন না জানাইলেন। তিনি বুঝাইলেন যে, তিনি একজন পরিক্রমা সাধু। ইহা তাঁহার নিকটে থাকিলে তাঁহার নানা বিপদ হইবে। তাঁহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে। সে ব্যক্তিটী বলিল যে কোন ভয় নাই, সে ইচ্ছা পূর্ব্বক দিতেছে। ইহা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ মিলিবে তাহাতে আহারীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া লইবেন! মহারাজ পুনরায় বুঝাইলেন যে বিক্রয় করিতে যাইলেই তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে, ও পুলিশ নানারূপ বিড়ম্বনা করিবে। তখন সে ব্যক্তি বলিল যে উহা গোটা না রাখিয়া সোনার চূর্ণ করিয়া লইলে কোন বিপদই হইবে না। ইহাতেও মহারাজ বলিলেন যে সাধু ইহা কোথায় পাইয়াছেন মনে করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিপদ উপস্থিত হইবে। এ প্রকারে যখন মহারাজ কিছুতেই ইহা লইতে স্বীকৃত হইলেন না তখন অগত্যাই সে ব্যক্তি উহা লইল। এরূপ করিবার পর মহারাজ উক্ত ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে সে বলিল যে তাহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার কোন ফল নাই।

ইহা বলিয়া পরিচয় দিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন যে লাভ বিছুই নাই ইহা সত্য, তবে তাহার ব্যবহার দেখিয়া জানিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তখন সে পরিচয় দিল যে তাঁহার নামই "তান্তিয়া ভীল।" এ পুরুষ সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্যজনক গল্প মহারাজ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। এজন্য তাহার পরিচয় পাইয়া তখন তাহার চেহারাটী বেশ করিয়া দেখিলেন। এ চেহারাটী বীরের মতই ছিল। আকৃতি যদিচ কৃশ ছিল, তথাপি বেশ বলিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। সে কোনরূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আইসে নাই। এ সকল দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে এত কি কৌশল জানে যে গভর্ণমেণ্ট নানা চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারেন না। নিশ্চয়ই তাহার কোনরূপ অমানুষিক ক্ষমতা ও কৌশল জানা আছে। সে ব্যক্তি তখন হাসিতে হাসিতে বলিল যে, সাধু মহাত্মাদের কৃপাই তাঁহার একমাত্র সম্বল। পরে বলিল যে কোন মহাত্মা তাঁহাকে কৃপা করিয়া এক পারদ নির্ম্মিত "গুটকা" দান করিয়াছেন। এ গুটকা তাহার মুখের ভিতর থাকিলে তাহার চলন শক্তি অতি দ্রুত হয় ও ইচ্ছা করিলে সকলের সম্মুখে অদৃশ্য বা আকাশগামীও হইতে পারে। এ গুটকা যতদিন থাকিবে ততদিন তাহাকে কেহ ধরিতে পারিবে না। ইহার পর সে সন্নিকটস্থ বনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

মহারাজের এ ঘটনা সম্বন্ধে বিবরণ পূর্ব্বে শুনা ছিল। ইহা পারদ প্রস্তুত দ্রব্য বিশেষ। ইহাতে খেচরত্ব লাভ হইতে পারে। কোন কোন সাধু ইহার প্রস্তুত প্রণালী অবগত আছেন। সংসারে তিন শক্তিকে কার্য্য করিতে দেখা যায় যথা (১) দ্রব্যশক্তি, (২) ক্রিয়াশক্তি ও (৩) মন্ত্রশক্তি বা শব্দশক্তি। সিদ্ধি খাইলেই নেশা হয় ইহা দ্রব্যশক্তি, প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া করিলে শরীর লঘু হয়, ইহা ক্রিয়াশক্তি মন্ত্র জপ করিলে, নাম কীর্ত্তন শুনিলে বা করিলে বা বেদপাঠ করিলে এক অপূর্ব্বতা লাভ হয়। ইহা শব্দ-শক্তির সহিত ক্রিয়াশক্তি জড়িত। এ সমুদয় উপদেশাবলীতে কতক কতক ব্যক্ত হইবে। এজন্য তান্তিয়া ভীলের কথাগুলি কতকটা বিশ্বাস হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

স্মৃতির-রেখা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

আজিও সে কালিন্দীর কালো স্থির নীরে
কুসুমিত কৃষ্ণচূড়া-ছায়া দোলে ধীরে।
আজিও ব্রজের বালা
ভরিয়া ফুলের ডালা
গাঁথিয়া ফুলের মালা ফেলে দেয় নীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে মালা নেচে যায় ধীরে।
কোথায় সে কালাচাঁদ যমুনাবিহারী?
কোথায় সে নন্দলাল গোবর্দ্ধনধারী?
মোহন বাঁশিটি বাজে
গোকুলে গোপিনী সাজে
কক্ষেতে কলসী রাজে যায় যমুনায়
সে সকল কথা সখি! মনে পড়ে হায়!
সেই সে অক্ষয়বট
শ্যামবপুঃ দীর্ঘজট
যমুনার কালো জল আঁধার করিয়া
বিরাজে অতীত দিনে মনে পড়াইয়া।
অক্রুর যে ক্রূর হয়ে নিয়ে গেল তাঁরে সই
ব্রজ আঁধারিয়া।
আর ত এলো না ফিরে বর-বিনোদিয়া॥
সেই ইন্দ্রধনুঃ আঁকা শিরেতে শিখীর পাখা
বদন অমিয়মাখা হেরিব না আর,
মনে হলে প্রাণসখি! করি হাহাকার।
রজত ভূধরসম
বলরাম অনুপম
কি চাহনি মনোরম কব আর কিবা সই!
কিবা আর কই?

দিবানিশি তুষানলে দেহ মন
সমর্পিয়া বেঁচে শুধু রই লো
শুধু বেঁচে রই।
আছে সেই বৃন্দাবন, আছে সেই গোবর্দ্ধন,
আছে নিত্য চিরন্তন ক্রন্দন আমার।
সব যায় স্মৃতি রহে,
উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বহে,
"পাগলিনী" লোকে কহে গোকুল মাঝার
দেখে নিত্য চিন্তামগ্ন বদন আমার॥

মায়াজাল।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

একদিন দেবর্ষি নারদ হঠাৎ অনন্যমনে স্বচ্ছন্দে আকাশ পথে যাইতে যাইতে হরি-গুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবিতেছেন, আমি ত কত রকমই দেখিলাম, বুঝিলাম, শুনিলাম, জানিলাম; আমার দেখিবার, বুঝিবার, শুনিবার জানিবার আর কিছুই নাই। কৈ আমি ত এমন কোন বস্তু দেখিতেছি না যাহা আমার অগোচর বা বুদ্ধির অগম্য। আমি নিত্য হরিদাস, তাঁরই গুণগানে অহর্নিশ মগ্ন ও তৎপর, আমিও তবে মায়ামুক্ত—মায়াতীত অবস্থা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইয়াছি। নৈলে কৈ মায়াত এত বিস্তৃত মায়াজাল পাতিয়া ত্রিজগৎকে নাচাইতেছে, হাসাইতেছে, কাঁদাইতেছে, কত কি করিতেছে, কিন্তু কৈ আমি ত সে সবের মধ্যে নাই, আমি ত সে সব হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নির্লিপ্ত। কি আশ্চর্য্য! বিশ্ব-চক্রীর চক্রকৌশলে ভক্তকুলাগ্রগণ্য ভক্তকুলতিলক দেবর্ষি নারদের মত মহাপুরুষেরও অন্তরাকাশে ঈষৎ অহমিকা-মেঘ সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্র কীটানুকীট মায়ামুগ্ধ আমাদের ত প্রতি মুহূর্ত্তেই পদস্খলন ও পতন অবশ্যম্ভাবী। প্রিয় ভক্তের এই ভাব শ্রীপতির ভাল লাগিল না; তাই তিনি নিষ্কলঙ্ক নারদকে আরও নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য কিছু শিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। শ্রীনারদ একদিকে হরি-গুণগান করিতে করিতে শ্রীদ্বারকায় উপনীত হইলেন প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন মানসে, যথাযোগ্য অভিবাদনাদির পর প্রভু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নারদ সমভিব্যহারে

বহির্গত হইলেন। দ্বারকার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে উভয়ে এক সরোবর তীরে পেঁছিলেন। সুপ্রশস্ত সুধাধবল সোপানোপরি উভয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "নারদ তুমি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া পাবত্র হইয়া এস, আমি তোমাকে কিছু শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।" শ্রীনারদ আনন্দে বিভোর, প্রভু স্বয়ং আজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাকে শিক্ষা দিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি এমন কি মহাভাগ্য করিয়াছি। অহো ভাগ্য! আমি আজ ধন্য, কৃতকৃতার্থ; সার্থক আজ আমার শ্রীদ্বারকায় আসা। মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পরম পুলকিত-চিত্তে তিনি স্নানে চলিলেন। কত কি ভাবিতে ভাবিতে একগলা জলে দাঁড়াইয়া ডুব দিলেন। কি আশ্চর্য্য! কি অচিন্তিত অননুভবনীয় পরিবর্ত্তন! কোথায় আমি? কোথায় বা সে রাধা-রমণ শ্রীকৃষ্ণ, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ যে দেখিতেছি, অলৌকিক রূপ-যৌবন-সম্পন্না এক ষোড়শী যুবতী। আমি ইহা ব্যতীত আর কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না। এদিকে আবার বিপদের উপর বিপদ, আমার অঙ্গে ত কোন বস্ত্র নাই দেখিতেছি। কাহার কাছেই বা বস্ত্র ভিক্ষা করিব? ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে মায়াতীত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মায়াজালে নিপতিত আত্ম-বিস্মৃত নারদ জলে গাত্র নিমজ্জিত করিয়া রহিলেন। আশা যদি কাহাকেও নিকটে দেখিতে পাই, বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া লইয়া লজ্জা নিবারণ করিবেন। এ দিকে অঘটন-ঘটনপটীয়সের মঙ্গল-ইচ্ছার দৈবযোগে এক রাজা সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিয়া ব্যর্থ মনোরথ, শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন ও পরিশ্রমে পিপাসিত হইয়া জল অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই মায়াসরসী তীরে সমুপস্থিত হইলেন, দিনমনি তখন অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইয়া পাটে যাইতে বসিয়াছেন। রাজা এ হেন অসময়ে অপরূপ রূপ-লাবণ্যমণ্ডিত ললনারত্নকে সলিলমাঝে গাত্রমার্জ্জনে রতা দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মৃত ও চমৎকৃত হইলেন। রমণী রাজাকে দর্শনমাত্র একখানি কাপড়ের নিমিত্ত করুণ প্রার্থনা জানাইলেন। রাজার আর দ্বিতীয় বস্ত্র না থাকায় তৎক্ষণাৎ স্বীয় বহুমূল্য উত্তরীয় উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। পরে স্বীয় জলপিপাসা নিবারণ হইলে ঘোর তামসী রজনীতে বনমধ্যে তাঁহাকে একাকিনী ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছুক ও সাহসী না হইয়া তাঁহার সম্মতি ক্রমে তাঁহাকে স্বীয় অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজধানীতে লইয়া চলিলেন। রাজা তখন পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। কিছুদিন পরে রাজা আদেশক্রমে অমাত্যবর্গ রাজ্যময় রাজার বিবাহ

ঘোষণা করিলেন। চারিদিক আনন্দের উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠিল। এখন সেই বনপ্রাপ্তা মহিলা আমাদের ভাবী রাণীও সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতা, আনন্দ ও সুখ-সাগরে ভাসমানা। মহাসমারোহে বিশেষ শুভদিনে শুভকার্য্য বিধাতার শুভ ইচ্ছায় শীঘ্রই নিরাপদে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

একে, একে, একে ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে রাজার বহু পুত্র কন্যায় রাজপুরী আলোকিত মুখরিত ও নিয়ত নিনাদিত হইতে লাগিল। রাজা ও রাণী উভয়েই মনের আনন্দে খুব সুখেই আছেন, সংসারের সকল সাধ পূর্ণমাত্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেই হয়। এমন সময় ঘটনাচক্রে সবই উল্টাইয়া গেল।

মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর! হায় মানুষ! তবুও তোমার এত অহমিকা! ক্ষুদ্র কীটাণুকীট বালুকণা সদৃশ অনিত্য তুমি, স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়া ভাসিয়া অকূল কালসমুদ্রের কিনারায় এ বিশাল জগৎ যাঁর নিত্য-লীলানিকেতন তাঁরই কৃপা রূপ অনুকূল বায়ুভরে ক্ষণিকের জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছ; আবার কবে কখন কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্‌খানে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তার ঠিকানা নাই। তবে তোমার এত আস্ফালন, এত বড়াই, এত গর্ব্ব কিসের, মানুষ! নিত্য নিয়ত শত সহস্র অনিত্য বিষয়ে মাতিয়া মারামারি কাটা-কাটি করিয়া বৃথাই অমূল্য আয়ুনিধি কালসমুদ্রের অগাধজলে বৃথাই নিক্ষেপ করিতেছ! নিজেকে নিজে বুঝিলে না, চিনিলে না, জানিলে না, হেলায় মানবজীবন—দুর্লভ মানবজীবন হারাইলে! আত্ম-দর্শনই যে মানুষের একমাত্র লক্ষ্য তা ভুলিয়া গেলে! ভ্রমেও বিশ্বনাথের রাতুল চরণ চিন্তা কর না। যাঁর প্রসাদের ক্ষুদ্র এক কণিকায় তোমার—শুধু তোমার কেন, এই বিশ্বের অতুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার! তাই বলি ভাই মানুষ! চল, আপনাকে বুঝিয়া চল, জানিয়া চল, চিনিয়া চল, তাহা হইলে আর পদে পদে ঠকিবার ভয় থাকিবে না, খানায় পা পড়িবে না!

ধীরে ধীরে ধীরে, এদিকে রাজা ক্রমেই বড় অসুস্থ, অবসন্ন ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে ধীরে তৎপূর্ব্বেই একে একে স্নেহের দুলাল বৎসগুলি কালের আহ্বানে অনন্ত কাল-সাগরে মিলাইয়া গেল! ধীরে ধীরে ধীরে একদিন রাজা স্বয়ং অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালিত প্রকৃতিপুঞ্জকে তথা রাজ্যের সকলকে ফাঁকি দিয়া নিজ রাজ্য ছাড়িয়া কোন অজানা, অচেনা রাজ্যে চলিয়া গেলেন—যার ঠিকানা কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। এখন পতিপুত্র নিমিত্ত

দারুণ শোকাতুরা বিরহবিহ্বলা রাণী রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকিনী ঘুরিতে ঘুরিতে একটী বৃক্ষতলে বসিয়া নিজ পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অদৃষ্ট স্মরণ করিয়া অধীর ভাবে করুণ কণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া অজস্রধারে কাঁদিতেছেন। তাই ভক্তের কান্নায় ভগবানের আসন টলিল। তিনি এক বৃদ্ধ সাধুর বেশে সেখানে আসিয়া বলিলেন, "মা! তুমি কাঁদ কেন, তোমার কি হইয়াছে?" রাণী আনুপূর্ব্বিক অকপটে সকল কথা সাধুকে নিবেদন করিলেন। সাধু বলিলেন, "আমি তোমার শান্তির উপায় করিয়া দিতেছি। অগ্রে ঐ যে পুষ্করিণী দেখা যাইতেছে, উহাতে স্নান করিয়া এস।" সাধুর আদেশে রাণী তাহাই করিতে চলিলেন। কিন্তু একি! স্নানের সঙ্গে সঙ্গে এ কি অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক পরিবর্ত্তন! আমি রাণী আর রাণী নই, দেবর্ষি নারদ; সে সরোবর আর সরোবর নয়, শুষ্ক স্থল; সে বৃদ্ধ সাধু আর সাধু নয়, মুরলীবদন শ্রীরাধারমণ; তাহা হইলে আমি এখন কোথায়? কেনই বা আমি এখানে? আমি স্বপ্ন দেখিতেছি? একটু স্থির হইয়া প্রভুর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক দেবর্ষি ধ্যানে বসিলেন। আর কি কিছু লুকান থাকে? পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণের ছলনাময় পরীক্ষায় তাঁহার এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে কেবল তাঁর সামান্য একবিন্দু এই অহঙ্কারের জন্য যে, আমি মায়াতীত হইয়াছি, মায়ার বন্ধন পার হইয়াছি। তাই বলি, কেহ মায়াতীত নহে, সকলেই মায়াধীন, আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত মায়ায় মোহিত, জড়িত। একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মায়াতীত, কারণ তিনি মায়াধীশ, তাঁহাকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নির্গুণ নিরাকার আবার সগুণ সাকার।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য সমাজের চিহ্নিত মহাজনগণের মধ্যে যিনি অন্যতম, বৈষ্ণবগ্রন্থের টীকাকারসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহার আসন অতীব উচ্চ, যিনি কন্দর্পবিনিন্দিত-কমনীয়মূর্ত্তি পরম ভাগবত ও যাঁহার হৃদয় ধর্ম্মভাবপ্রবণ ছিল, যিনি দুর্ব্বোধ্য ভাগবত গ্রন্থের পদ ও ভাব সমূহকে সহজবোধ্য করিবার অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যিনি প্রেম

ভক্তি ভাবে বিগলিত হইয়া বৈধাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে যাপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে সেই অলৌকিকশক্তি-সম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বিশ্বনাথের আবির্ভাবকাল, পরিচয় ও শিক্ষাদি—

১৫৭৬ শকে বা ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবগৌরব, অলৌকিক-প্রতিভাশালী, দেশমান্য পণ্ডিত, পদকর্ত্তা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু দুরূহ বৈষ্ণবগ্রন্থের টীকাকার ও গ্রন্থরচয়িতা মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নদীয়া জেলার (বর্ত্তমান ই, বি, আর, ষ্টেসন) দেবগ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মপরিগ্রহ করেন। দেবগ্রামেই তিনি চতুষ্পাঠীর প্রাথমিক পাঠ সাঙ্গ করিয়া সৈদাবাদে আসিয়া জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার অধীন দ্বারকা নদীর তীরস্থ পাতড়াঙ্গা বা পাটড়াঙ্গা নামক ক্ষুদ্র পল্লীর একাংশে তাঁহার সাধনাশ্রম ছিল বলিয়া জানা যায়। উক্ত পাতড়াঙ্গার বর্ত্তমান চক্রবর্ত্তী বংশীয়েরা বিশ্বনাথের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তথায় বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত গোপাল মূর্ত্তির সেবা পূজাদিও অদ্যাপি তাঁহারাই সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। * শুনিতে পাওয়া যায় বিশ্বনাথের হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল টীকাগুলি এই পাতড়াঙ্গার আশ্রমেই ছিল। এক সময়ে জনৈক সাধু পরিব্রাজক প্রতারণাপূর্ব্বক সেই টীকাগুলি রাত্রিকালে পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া শেষরাত্রে পলায়ন করেন। বিশ্বনাথেরা তিন সহোদর ছিলেন, জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ ও কনিষ্ঠ বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ বাল্যে বহু অধ্যাপক অধ্যুষিত দেবগ্রামেই ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারাদির পাঠ শেষ করিয়া ভাগীরথীতীরস্থ বহরমপুর সৈদাবাদে আগমনপূর্ব্বক তথায় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ও বাস করিতে থাকেন।

বিশ্বনাথের বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য ও দীক্ষা গ্রহণ—

* বিশ্বনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই একরূপ সংসারে বীতস্পৃহ হন। তাঁহার সন্তানাদিরও কোন সংবাদ অবগত হওয়া যায় না। পাতড়াঙ্গার চক্রবর্ত্তীগণ সম্ভবতঃ বিশ্বনাথের ভ্রাতৃবংশীয়। কোন্ সময় বিশ্বনাথ পাতড়াঙ্গায় আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা স্থির করা কঠিন। তবে বৃন্দাবন গমনের পূর্ব্বেই তিনি তথায় স্বীয় আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

বিশ্বনাথ দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, এবং অপ্রাপ্ত বয়সেই এক রূপবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ভগবানের আদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে কখনই আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই পিতামাতার স্নেহপাশ, রূপসী পত্নীর প্রণয়-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই ধর্ম্মের সেবায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিশ্বনাথ সংসারের অসারত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক স্থায়ী-ভাবে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট না হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করেন, এবং সৈদাবাদের কৃষ্ণ-চরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক গুরু-গৃহে অবস্থিতি করিয়া ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার ও টীকাদি প্রণয়ন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। বিশ্বনাথ বৃন্দাবনধামে অবস্থিতিকালেও এই সৈদাবাদ-নিবাসী রাজকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট ভক্তি ও রসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন, উক্ত রাজকৃষ্ণ আচার্য্যের নিকট, আবার কেহ বলেন তৎপুত্র কৃষ্ণচরণের নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বনাথ "স্তবামৃত-লহরী" গ্রন্থের, শ্রীগুরুচরণস্মরণাষ্টকম্ স্তবে রাধারমণকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরাধারমণং মুদাগুরুবরং বন্দে নিপত্যাবনৌ।" অর্থাৎ আমি রাধারমণ নামক গুরুবরকে ভূমিতে নিপতিত হইয়া আনন্দ সহকারে বন্দনা করিতেছি। ইহাতে অনুমান হয় রাধারমণ বিশ্বনাথের জনৈক শিক্ষাগুরু ছিলেন।

বিশ্বনাথের বৈষ্ণবসমাজের কর্ণধারত্ব—বিশ্বনাথ অসাধারণ প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে বৈষ্ণবসমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রজধামবাসী প্রভুপাদ গোস্বামীবৃন্দের অপ্রকটকালে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ই ব্রজধামের বৈষ্ণবসমাজের কর্ণধারস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া বৈষ্ণবসমাজকে বহু বিপদের হাত হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সময়ে (কিঞ্চিদূন খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) সাধারণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রভুপাদ গোস্বামীগণের সিদ্ধান্তগ্রন্থের অর্থোদ্ধারে অপারগ হইয়াছিলেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর বাঙ্গালা ভাষায় "প্রার্থনা" ও "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" গ্রন্থ প্রচারপূর্ব্বক বৈষ্ণববৃন্দের সাধনার পথ প্রদর্শন করেন। পণ্ডিত বিশ্বনাথ "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" ও "চৈতন্য-চরিতামৃত" যাহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় তজ্জন্য টীকা প্রণয়ন করেন। এবং তাঁহার সেই সময়ের রচিত টীকাতেই বিশ্বনাথ স্বাপনাকে সৈদাবাদনিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ব্রজমণ্ডলে বিশ্বনাথের ক্রিয়াকলাপ—বিশ্বনাথ সৈদা-

বাদ হইতেই বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া ব্রজধামের বহুস্থানে বসবাস করেন। সেই সময়েই তিনি স্বদলভুক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলীর অনুরোধে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি ভাগবতের "সারার্থদর্শিনী" টীকা প্রণয়ন করেন। যমুনাতটে অবস্থিতিকালে বিশ্বনাথের ভাগবতের তৃতীয় স্কন্দের টীকা রচনা শেষ হয়, এবং ১৬২৬ শকে "সর্ব্বার্থদর্শিনী" টীকা প্রণয়ন শেষ হইয়াছিল। সেই সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ব্রজধামের গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মণ্ডলী ক্রমশঃ লুপ্ত-প্রভাব হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীধামের এবম্বিধ দশা দর্শনে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত ধামের পূর্ব্বগৌরব পুনরানয়নের জন্য স্বতঃ পরতঃ সচেষ্ট হইলেন। ভগবানের আদেশে তৎকালে বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও অযাচিত ভাবে ব্রজধামে উপস্থিত হইয়া মহাত্মা চক্রবর্ত্তীর সঙ্কল্পসিদ্ধির সহায় হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহায়তায় ব্রজধামে অধ্যাপনা ও প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। অতঃপর বিশ্বনাথ অল্প সময়ের জন্য বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া গৌড়-মণ্ডলে আগমন করেন। কারণ সে সময় গৌড়-মণ্ডলে তাঁহার বহু শিষ্য বর্ত্তমান ছিলেন। যাহাহউক সত্বরেই তিনি ব্রজধামে প্রত্যাগমন করেন, এবং বৃন্দাবনের গৌড়ীয় তীর্থ পরিভ্রমণান্তে গোবর্দ্ধনের সমীপে আরিট গ্রামে রাধাকুণ্ডের পবিত্র-তীরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শিষ্য মুকুন্দ দাসের সহিত এ ক্ষেত্রে কবিরাজ গোস্বামীর কুটীরেই চিরজীবনের জন্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন, এবং ব্রজধামে গোকুলানন্দ নামক বিগ্রহমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক ব্রজধামে পরকীয় মতের প্রবর্ত্তন—জয়পুরের রাজসভায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা চৈতন্য-সম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষিত হয়। তিনি স্বয়ং পরকীয় মতাবলম্বী ছিলেন, এবং ব্রজধামেও উক্ত মতের প্রবর্ত্তন করেন (অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা রূপে অবধারণ পূর্ব্বক তদনুরূপ ভজন সাধনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন)। এই কারণে শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যবর্গ বিশ্বনাথের উপর অসন্তুষ্ট হন। বলা বাহুল্য যে কালক্রমে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতই প্রবলাকার ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া উঠে। যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বিশ্বনাথ ব্রজধামে বাস করিতে আরম্ভ করেন, এবং তথায় বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ কর্ত্তৃক বিশ্বনাথ নামের ও চক্রবর্ত্তী পদবীর ব্যাখ্যা—

"বিশ্বস্য নাথ রূপসৌভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তি চক্রে বর্ত্তিনত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যায়াভবৎ ."

অর্থাৎ—তিনি বিশ্বকে বা সকলকে ভক্তিপথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশ্বনাথ হইয়াছিল, এবং ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার "চক্রবর্ত্তী" এই আখ্যা হইয়াছিল।

বিশ্বনাথের তিরোভাব—১৭৭৬ শকে একশত বৎসর বয়সে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীরাধাকুণ্ডে অন্তর্দ্দশার অবস্থায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে চক্রবর্ত্তী মহাশয় অপ্রকট হন। শ্রীশ্রী৺ বৃন্দাবন ধামের পাথুরিয়াঘাটায় অদ্যাপি তদীয় সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। কাঙ্গলের শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানে বিশ্বনাথের একটী মঠ রহিয়াছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক সকলের নাম—

(১) উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ।
(২) গৌরাঙ্গ স্মরৈকাদশ।
(৩) ভক্তিরসামৃত বিন্দু।
(৪) ভাগবতপুরাণ টীকা।
(৫) রাধামাধব রূপচিন্তামণি।
(৬) সাধ্যসাধনকৌমুদী।
(৭) স্মরণক্রমমালা।
(৮) হংসদূত টীকা।
(৯) শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত।
(১০) মাধুর্য্যকাদম্বিনী।
(১১) রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা।
(১২) স্বপ্নবিলাসামৃত।
(১৩) অনুরাগবল্লী।
(১৪) রূপচিন্তামণি।
(১৫) সঙ্কল্পকল্পদ্রুম।
(১৬) সুরথকথামৃত।
(১৭) গৌরগণচন্দ্রিকা।
(১৮) চমৎকারচন্দ্রিকা।
(১৯) ব্রহ্ম সংহিতা।
(২০) গোপালতাপনী।
(২১) অলঙ্কারকৌস্তভ।
(২২) চৈতন্য চরিতামৃত।
(২৩) বিদগ্ধ মাধব প্রভৃতি ৩৬ খানি গ্রন্থ আছে।

লুচি মোণ্ডার বিবাদ।

লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

একদিন লুচি আসি ভাঁড়ার হইতে।
আরক্ত লোচনে কিছু লাগিল কহিতে॥
লুচি বলে আমি দেখ গজানন প্রায়।
সর্ব্ব অগ্রে পড়ি পাতে কত শোভা তায়॥

তা শুনে বেগুণভাজা উঠে এসে বলে।
আমি না থাকিলে তোর জন্ম যে বিফলে॥
শাক ভাজা ছক্কা আদি তার পর আসে।
নিজ নিজ গুণপনা সকলে প্রকাশে॥

উঠিয়া পাঁপর কহে আমি হই রাজা।
কি আনন্দ করে লোক পেলে মোর ভাজা॥
লুচি হয় গুরুপাক সকলেই কয়।
গুরুপাক দোষ তার আমি করি ক্ষয়॥

তার পর দেখা দিল লাউয়ের অম্বল।
জান না জগতে আমি ধরি কত বল॥
লুচি খেতে খেতে যবে মুখ মেরে যায়।
আমারে চাখিয়া লোক কত তৃপ্তি পায়॥

তার পর দধি আসি দিল দরশন।
সাবাসে আমার গুণ জন সাধারণ॥
আমার হজমি গুণ কি বলিব আর।
শেষ পাতে যে না খায় সর্ব্বনাশ তার॥

ক্ষীর রসগোল্লা মোণ্ডা পরেতে আসিল।
নিজ নিজ গুণ সবে বর্ণিতে লাগিল॥
মোণ্ডা কহে গণ্ডা গণ্ডা খায় যেই জন।
খাইতে খাইতে করে স্বরগে গমন॥

পান্‌তুয়া দরবেশ মিলিয়া দুজনে।
প্রবৃত্ত হই দোঁহে বিলবাদ ভঞ্জনে॥
তার পর খাজা গজা দুইজন মিলি।
কচুরির সঙ্গে আসি করে কোলাকুলি॥

শেষকালে দেখা দিল খিলি করা পান।
পান দেখি লুচি তবে ক্রোধ অবসান॥
লুচি বলে শ্রেষ্ঠ আমি হই সবাকার।
যাই থাক্ লোক করে নাম যে আমার॥

লুচি যদি খায় লোক গিয়া নিমন্ত্রণে।
করে সে আমারি নাম জানে সর্ব্বজনে॥
রসগোল্লা মোণ্ডা আদি খায় ত সকলে।
কিন্তু কার নাম করে বল না সুধালে॥

কলাপাতা বলে সব বুঝেছি বড়াই।
আমার উপর থাকি করিছ লড়াই॥
সক্রোধে উঠিয়া আসি কহিল লবণ।
মিথ্যাকথা তুমি লুচি কহ কি কারণ॥

সর্ব্ব অগ্রে পায় লোক মম দরশন।
মনে বুঝে দেখ লুচি কেবা গজানন॥
অল্প মূল্য বটে কিন্তু শ্রেষ্ঠ সবাকার।
আমি না থাকিলে লুচি খাওয়া হ'ত ভার॥

গেলাস হইতে জল উঠিয়া তখন।
কহিল আমি ত শ্রেষ্ঠ জগত-জীবন॥
লুচি যদি খায় কেহ খেতে চাবে জল।
বুঝিয়া দেখহ মনে মোর কত বল॥

জলের নিকটে সবে হার মেনে গেল।
"হরি হরি" বল সবে পালা সাঙ্গ হ'ল॥

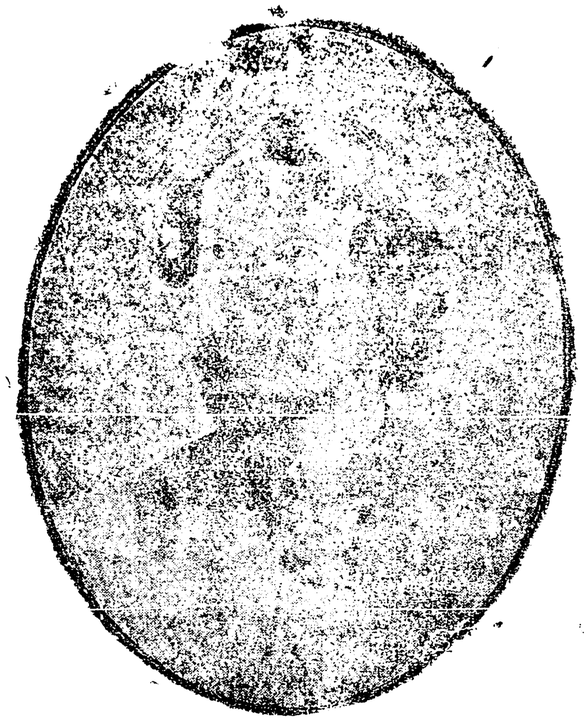

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব।

বোলপুর শান্তিনিকেতন।

যাঁহারা মানব-সমাজ গঠন করেন, তাঁহারা নূতন ভাবে এবং নূতন চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তর প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যোগ কোথায়,—অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কিরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে,—বিশ্ব নিয়ন্তার বিচিত্র লীলা ব্যক্তিগত জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে কতদূর প্রকট;—মহাপুরুষগণ এই সকল সমস্যার সমাধান করেন। তাহাতেই পৃথিবীর মানবমণ্ডলী যুগে যুগে নব আশা ও নব আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত হয়।

কবিগণ নূতন কিছু দেখেন। তাঁহারা যাহা দেখেন, তাহার প্রকাশক জগতের এবং চিন্তাধারার পরিচালক। তাঁহারা মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশে নব নব যুগের অবতারণা করেন। সত্যকে উপাদেয় সরস ও মনোরম করিয়া তাঁহারা মানব বুদ্ধির সম্মুখে লইয়া আসেন। চিন্তার মানস-মূর্ত্তিকে তাঁহারা ভাষায়, ছন্দে ছন্দে, সঙ্গীতে অলঙ্কৃত করিয়া অভিনব আদর্শের সৃষ্টি করেন। এই আদর্শই কর্ম্মী পুরুষগণের লক্ষ্য স্থল।

কবির সঙ্গীতের সুর কখনও থামে না, কবির চিত্রের বর্ণসম্পদ কখনও পরিম্লান হয় না,—কবির শব্দ-বিন্যাস মানব-চিত্তকে নিত্যকাল স্পন্দিত করিয়া থাকে।

"কবির কি উচ্চাসন, যে কাল তরঙ্গ
ঊর্দ্ধতম গ্রহ তারা করে তিরোধান,
যায় সেই কাল বহি লহরী খেলিয়া
কবির চরণাম্বুজে করিয়া প্রণাম।
কোথা সত্য ত্রেতা যুগ নাহি নিদর্শন,
কোথায় কালের স্রোতে গিয়াছে মিশিয়া
এখনও গায় ঋক্ গায়ক সকল,
বাজে বীণা বাল্মীকির জগৎ মোহিয়া ;
সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য বীর্য্য জগত নশ্বর,
কবিতা অমৃত ;—আর কবিরা অমর !"

বাঙ্গালী কবির এই সুরের প্রতিধ্বনি ইংরাজী কবিতায় পাইতেছি,—

Princes and conquerors leave
a little dust.
And kings a duibous legend
of a reign.
The swords of Caesar, they are
turned to rust
The poet doth remain,

কবি অন্ধকারের মধ্যে আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া আসেন,—কণ্টকময় পথে পুষ্পদল বিকীর্ণ করেন,—চিন্তাস্রোতের গতি ফিরাইয়া দেন। এইজন্য সমস্ত গঠনকারীদের মধ্যে কবি চিরস্মরণীয়, অটলকীর্ত্তিমান্।

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, একথা বলিলে তাঁহার প্রতিভার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ হয় না। তিনি সমগ্র জগতে নূতন ভাবের বন্যা আনিয়াছেন, নূতন চিন্তার প্রবাহ ছুটাইয়াছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে ভাবের আদান প্রদান দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মিলন ঘটাইয়াছেন। তাঁহার চিন্তা-সম্পদে আজ বিদেশের সাহিত্যও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া সেই অভিনব ভাব রাশি আধ্যাত্মিক

ব্যাপারে, রাষ্ট্রীয় সমস্যায়, সমাজতন্ত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। তিনি প্রসারিত চক্ষে ও উদার দৃষ্টিতে একদিন গাহিয়াছিলেন,—

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগরে ধীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ;

আজ আমরা তাঁহার সপ্ততিতম জন্মোৎসবে এই আকাঙ্খা করি, সেই সঙ্গীত সত্য হউক।

গত ৮ই মে শুক্রবার বোলপুর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মনীষীগণের সমক্ষে, ছাত্র, শিষ্য ও বন্ধুগণের সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশ্রমের বালক বালিকাগণ মিলিতকণ্ঠে বেদগান করেন, এবং কবিকে কুঙ্কুম চন্দনে ও সময়োচিত বেশ-ভূষায় সজ্জিত করেন। চীনদেশীয় একজন চিত্রশিল্পী তাঁহাকেএকখানি স্বহস্তাঙ্কিত ছবি উপহার দেন। প্যারিসের অধ্যাপক কুসার, সিলভাই লেভি, প্রেগের ডাঃ লেন্‌সী, টিয়েনসিন্ (চীন) এর চীনস্থ সম্প্রদায় এবং জাতি-সংঘের শ্রমিক বিভাগের কতিপয় সদস্য কবির দীর্ঘ জীবন কামনা ও শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সমাগত বন্ধুজনকে ধন্যবাদ জানাইয়া অন্তরের গভীর ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহার কথায় সকলের হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত ও আধুনিক নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করেন,—

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানাবর্ণে চিত্র করা বিচিত্রের লুপ্ত বাঁশীখানি
যাত্রাপথে। সে প্রত্যূষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
তুলিয়া হিল্লোলদল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্ব্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া, শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ চলা হ'লো অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশী কিছু
হয়নি সঞ্চয় করা, কতবার গেছি পিছু পিছু

আমি শুধু বাঁশরীতে ভরিয়াছি প্রাণের নিঃশ্বাস
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপন বীণার তন্তুজালে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্ম্মে বেদনার যে স্পন্দন জাগে,
আমন্ত্রণ ক'রেছিনু তা'রে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠা কম্পিত মূর্চ্ছনার। ছিন্ন পত্র মোর এতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস ধরণীর অন্তঃপুরে
রবি-রশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া
এ বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক বন্দনা মন্ত্র জপে—আমার বাঁশীরে রাখি
আপন বক্ষের পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয় কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোর-কোরক মাঝে স্বপ্ন-স্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্য ডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশীর কলস্বনা।
চেতনা-সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জ্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখের অট্টহাস্য সনে
অতল অশ্রুর লীলা মিশে গিয়ে কলরব-রোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের অন্তরবেদনা নিখিলের অনুভূত
সঙ্গীত সাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতি পথপ্রান্তে, হে মানব! তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্ম্ম বাণী—এই মোর রহিল প্রণাম।

বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

আপনার নিজের পরিচয় পেতে বিলম্ব হয়। বিধাতা আমার আয়ু যদি দীর্ঘ না কর্‌তেন, আজ ৭০ বৎসরে পৌঁছিবার অবকাশ যদি না দিতেন, তাহ'লে আমিও নিজের সম্বন্ধে ঠিক সুস্পষ্ট ধারণা যে কর্‌তে পার্‌তুম, মনে করি না। নানাক্ষণে নিজেকে দেখেচি। সংসারে নানা কর্ম্মে, নানাক্ষণে নিজেকে প্রবর্ত্তিত করেচি। তার থেকে নানা কর্ম্মে, নানাভাবে, নানারসে আপনার ভিতরকার পরিচয় বিক্ষিপ্ত হয়ে গেচে। এই দীর্ঘ জীবন-পথ, এই চক্রপথ প্রদক্ষিণ কর্‌তে কর্‌তে যখন বিদায়ের কালের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রপথ দেখ্‌লুম, তখন একটি কথা বুঝ্‌তে পেরেচি—আমার নিজের সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই।

ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য।

নানা কাজ করেচি—মুখ্য ও গৌণ ভাবে নানা জনের মাঝখানে আপনাকে উপস্থিত করেচি। সে সমস্ত আমার সম্পূর্ণ অন্তরের পরিচয় দিয়েচে কিনা জানি না, কিন্তু একটা পরিচয় এই—আমি দার্শনিক নই, গুরু নই, নেতা নই, আমি কিছু নই, একদিন যা বলেচি আমি চাই না নব বঙ্গের—নব যুগের নেতা হ'তে। সেটা আমার অন্তর থেকে সত্য বলেছিলাম। সেটা আমার কর্ম্ম নয়। বিধাতা আমাকে যে কাজে প্রবর্ত্তিত করেচেন সেটা আমি জেনেচি, বুঝ্‌তে পেরেচি। শুভ্র যিনি—যাঁদের তিনি প্রেরণ করেচেন, তাঁরা পৃথিবীর গুরু, তাঁরা পৃথিবীর পাপ ক্ষালন করেন, মানুষের চিত্তকে শোধন করেন, মানুষের গতিকে কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁদের নমস্কার করি। তাঁরা আমাদের পূজ্য। তাঁরা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়ে পৃথিবীর তাপ হরণ করেন, অন্ধকার দূর করেন, কিন্তু যিনি শুভ্র, যিনি এক, তিনি যখন খেলা করেন, তখন তিনি নানাবর্ণে নানা রসে বিচ্ছুরিত হন, তাঁর যে শুভ্রতা, সেটা বহু বর্ণে প্রকাশিত হয়ে রঞ্জিত করে চিত্তকে এবং বিশ্বকে। আমি সেই বিচিত্রতার দূত। যিনি খেলা করেন, তিনি আমাদের এনেচেন ; যারা—কেহ বা গান গায়, কেহ বা ছবি আঁকে, কেহ বা নানা রকম রসের সৃষ্টি করে—প্রকাশের দূত আমরা তার। বিচিত্রের বিচিত্র লীলাকে অন্তরের ভিতর গ্রহণ ক'রে তাঁর উৎসবে যোগ দিয়ে কিছু যেন দিতে পারি—এইজন্য আমাদের আহ্বান। কাউকে কোন পথে প্রবর্ত্তিত ক'রে কোন্ কঠিন স্থানে নিয়ে যাব, সে আমাদের কাজ

নয়; সে জানি না। পথিকদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে হবে। বহুর সঙ্গে যিনি যে করেন, তাঁর প্রকাশকে বিচিত্রের মধ্যে প্রকাশিত করার সুরে, গানে, নানা রসে, নানা ভাবে প্রকাশ করার কত আয়োজন আছে, প্রণালী আছে তাঁর খেলার মধ্যে গানের—বর্ণের—রূপের বৈচিত্র আছে। সেখানে সুখ-দুঃখে আঘাত সংঘাত, ভাল মন্দ নিয়ে দ্বন্দ্ব—কত কি আছে। তিনি ডাক দিয়েছেন বাসনা দিয়েছেন, আমি জানি সে আমার কাজ। আমি বল্‌ব, বলতে এসেছি অন্তরের ভিতর বিশ্বের আঘাত আমাকে বলাচ্চে। তাঁর প্রেরণা বল্‌তে এসেচি এই আমার একমাত্র পরিচয়।

আমার কাজ ?

আমাকে অনেকে অনেক রকম ক'রে ব'লে থাকেন, তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, কেহ বা স্কুল মাষ্টারের পদে বসান, কেবল ছোটদের নয়, বড়দেরও শিক্ষা দেওয়ার ভার দেন। আমি তা এড়িয়ে এসেচি। আমি বারবার সকলকে বলি—আমাকে ভুল যেন না বুঝেন। আমি কোনরূপ কাউকে চালনা কর্‌তে অধিকারী নই। আমি বল্‌তে এসেচি, ব'লে যাব, বাঁশী দিয়েছেন বাজিয়ে যাব। আমার কাজ প্রদোষের কথা ও প্রভাতের কথা বলা। শৈশবে আলো অন্ধকারের মিলন আমাকে যেমন মুগ্ধ করেছিল, সেদিনের কথা মনে পড়্‌চে, আলো অন্ধকারে শুভ মিলন যে বালককে স্পর্শ করেছিল, প্রভাতের তরঙ্গে যে উদ্বেলিত হয়ে উঠেচে, সে বাণী আমার কানে পৌঁচিয়েচে, আমাকে বিচলিত করেচে। ভাল ক'রে বোঝাতে পেরেচি কি না পেরেচি বল্‌তে পেরেচি কি না পেরেচি—জানি না। বিশ্বের লীলা-চঞ্চলতার যে স্পর্শ বালকের চিত্তকে তখন চঞ্চল করেচে, আজ পর্য্যন্ত সে চলেচে। একথা বল্‌ব না আমি আবদ্ধ হয়েচি, মৌন হয়েচি, শান্ত হয়েচি, পরম পদকে লাভ কর্‌তে পেরেচি। আমি যে কাজে এসেচি—সে কাজ চল্‌চে।

চঞ্চলের লীলা-সহচর ?

আজ ৭০ বৎসর বয়স হলো। হয়ত অনেক বন্ধু অনুশোচনা করেন, আমি তাঁদের সকল কাজে যোগ দিই না, যিনি লীলা করেন, তাঁর সমস্ত ফরমাসে গাম্ভীর্য্য থাকে না। সমুদ্রের তরঙ্গে, চপল বসন্তের হিল্লোলে, পুষ্পের পল্লবে, অরণ্যে অরণ্যে তিনি চঞ্চল। আমি তার চেয়ে গম্ভীর হব কি ক'রে? সে চঞ্চলতার ভিতর গানের সুরে তিনি আমায় ডেকেচেন। সে কাজে আমি এসেচি, এ কথা

বল্‌বার দিন এসেচে। এই ৭০ বৎসর বয়স ধরে নিজকে পরীক্ষা করে দেখেচি—নানাদিকে, নানাকর্ম্মে, নানাভাবে। আজকে সংশয় নাই, আমি সেই চঞ্চলের লীলার সহচর। কতটা পেরেচি না পেরেচি জানি না, কি হয়েচে না হয়েচে জানি না। আজ যা করেচি, কাল তা থাক্‌বে কি না জানি না। যিনি চঞ্চল, তিনি সব ধুয়ে মুছে ফেল্‌তেও পারেন। এই যে আলাপনা করেচেন, রাত্রিতে সব ধুয়ে মুছে গেল, সকাল বেলা তা নূতন ক'রে পাত্‌তে হ'ল। তেমনি করে তাঁর খেলার ঘর তিনি রাখেন না। আমরা তাঁর খেলার সাথী। যুগ যুগ থেকে মহাকাল কি খেলা সঞ্চয় করবেন, কে জানে। কেউ ভাঙ্গার খেলা খেলেন, কেউ গড়ার খেলা খেলেন।

একটিমাত্র কামনা ?

যা কিছু লিখেচি যদি তাতে আনন্দ দিয়ে থাকি, আমার কাজ হয়ে গেচে। আমি কোন দাবী রাখি না। আমাকে বিচার করা মিথ্যা, আলোচনা করা মিথ্যা। কারো চেয়ে ছোট কি বড় আলোচনার দরকার নাই। আমি কিছু চাই না। আমার একটিমাত্র কামনা, সে তিনি আমার মনের ভিতর দিয়েচেন, বিশ্ব-লীলার সঙ্গে সঙ্গে লীলার যে বাঁশী তাতে আমার সুর দিয়ে বাজাব, এইটুকু ছিল বাল্যকাল থেকে আমার একমাত্র ইচ্ছা। এইজন্য সব কিছু করেচি। এই একটা কর্ম্মক্ষেত্রে আমাকে অনেকে দেখ্‌তে পেয়েচেন। এর ভিতর যেটুকু প্রকাশের দিক আছে, সেটা আমার দিক। অনেক যন্ত্রী আছেন, তাঁরা যন্ত্র চালনা কর্‌চেন কর্‌বেন; কিন্তু আমি মানবাত্মার একটা কিছু উদ্যোগকে প্রকাশ করে রূপ দিবার জন্য এসেছিলাম। তার জন্য তপোবনের মত জায়গা খুঁজেচি। কলিকাতা সহরে ইট-কাঠ ক'রে সভা করে তা করিনি। আমার সভা তিনি তৈরী করেচেন—আম বাগানের ভিতর নীলাকাশের নীচে, সমুজ্জ্বল আলোকের মাঝে, যেখানে সূর্য্যের উদয়াস্তের খেলা হয়। বালক-বালিকারা তাঁর লীলার সহচর। আশ্রমের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের মধ্যে সে রূপ পেয়েচে প্রকাশ পেয়েচে। সে আমার কাজ। বাইরের যে কাজ, তার সঙ্গেও আমার যোগ আছে, কিন্তু তার ভিতর রূপ যেখানে দেখা দিয়েচে, সে গ্রামের মাঝখানে, দারিদ্রের মাঝখানে। যেখানে অন্তরের বেদনা পরিস্ফুট, সেখানে সে আপনার রূপ প্রকাশ কর্‌চে কর্ম্মের ভিতর দিয়ে। এখানে বালক-বালিকাদের দিয়ে গাছতলায় ক্লাশ হয়েচে সেটা গৌণ। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে উন্মুক্তভাবে জ্ঞানরস আহরণ কর্‌বার প্রথম যে

অধ্যবসায়—তাতে সৌন্দর্য্য আছে, খেলা আছে. ছুটী আছে—তা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেচি। নইলে গোঁড়া স্কুল মাষ্টার হয়ে আইন-কানুন আর Syllabus নিয়ে মর্‌তুম। এখানে যে তা নাই তা নয়, সে গৌণ। সে বহন কর্‌বার জন্য বন্ধুরা আছেন। তাঁরা সে ভার লাঘব করেন। আমার কাজ তা নয়। এর ভিতর লীলাময়ের লীলাকে যতটুকু প্রকাশ করতে পার্‌ব—নাচে, গানে, আনন্দে, ছুটীতে, পূর্ণিমা অমাবস্যায়, বনে প্রান্তরে দূরে খেলা কর্‌তে নিয়ে গিয়ে যতটুকু বিকশিত কর্‌তে পারব, তাতে সৌন্দর্য্য আছে, কল্যাণ আছে।

আমি কবি, আর কিছু নয়!

বন্ধুরা হয়ত প্রত্যাশা করেন—উচ্চমঞ্চে চড়ে এক ঘণ্টা কিছু বলব। পৃথিবীর ধূলো মাটীতে যে ফুল ফুটেচে, শস্য জন্মেচে, মাটী থেকে যে রস নিয়েচে, তাদের ভাল বেসেচি। মাটী কর্ষণ কর্‌তে কর্‌তে যারা দুঃখ পেয়েচে, তাদের জন্য আমি বেদনা অনুভব করেচি। উচ্চমঞ্চ আমার জন্য নয়—এ কথা বারংবার জানাচ্চি! সকলের বেদনার রূপকে প্রকাশ করা আমার কাজ। আমি কবি, আর কিছু নয়। এ কথা আমি কবিতায় বলেচি, ছন্দে লিখেচি! অর্থ কিছু বুঝি না। কবি যিনি, তিনি নানাবর্ণে চিত্র করেন। যদি শুন্‌তে চান, কিছু শোনাতে পারি।

অতঃপর কবি স্বরচিত ২টী নূতন কবিতা সুললিত ছন্দে পাঠ করেন। প্রথম কবিতার মর্ম্ম এই—গভীরের স্পর্শ পেয়ে আমি ছুটিয়াচি, বিচিত্রতার সুরগুলি বীণায় ফোটাতে চেষ্টা করিয়াছি, ধরণীর অন্তঃপুরে রবি-রশ্মির নিস্তব্ধতায় যে হুহু ধ্বনি জাগে, তাকে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াছি। বন্দী স্বপ্ন-স্বর্গের সন্ধানে ফিরিয়াছি, সেখানে আমার বাঁণী কলস্বরে গাহিয়াছে। আমি তীরে বসিয়া মহারুদ্রের তালে তালে অনন্তের আনন্দ বেদনা রচিয়াচি। বিচিত্রের মর্ম্মবাণী আমিএকের চরণে রাখিয়াচি।

দ্বিতীয় কবিতার ভাবার্থ এই—তপস্বী তুমি দেখা দাও। যেখানে সন্ধ্যা তারা বাক্যহারা, অনন্তের ডালি যেখানে সাজায়, তার বার্ত্তা লইয়া তুমি দেখা দাও। বিশ্বের প্রাঙ্গনে আজ আমার ছুটী হউক। জীবনের পরম সন্ধ্যায় বিশ্বসত্তার পরশ ধ্যানে জাগরণে অনুভব করিব। সকল সন্দেহ, সকল খ্যাতি, সকল দুরাশা দূরে রেখে ভালবাসা রেখে যাব। আমি কবি ধরণীর কাছাকাছি আছি। এক তীর ভাঙ্গিয়া অন্য তীর ভাসিয়া উঠে, সেখানেও সূর্য্যের রশ্মি বিকীর্ণ হয়। সে ছন্দে আমার মুক্তি। হে মহাপথিক! তোমার অবারিত দ্বারে তোমার সঙ্গে চলিয়া চলার সম্পদ পাই।

কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আমরা বিগত ১৩০৭ সালে "জন্মভূমি" পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া উক্ত বৎসরে "কবিকেশরী-রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধে ধারাবাহিক রূপেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জীবনের ও কাব্যের আলোচনা করিয়াছিলাম। তৎকালে অনেক সমালোচক, আমাদের আলোচনায় বিদ্রূপ করিতে ত্রুটী করেন নাই। যারপর নাই আনন্দের বিষয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সূর্য্য-রশ্মি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশে বিকশিত হইয়াছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত-জীবনবৃত্তান্ত জন্মভূমির পাঠক মহোদয়গণের জ্ঞাতার্থ লিপিবদ্ধ হইল।

বাঙ্গালা ১২৬৮ সাল, ২৫ সে বৈশাখ তারিখে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ধনে মানে কুলে শীলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ-সন্তান, পরিতাপের বিষয় শৈশবেই মাতৃহীন হইয়া বাটীর দাসদাসীগণের তত্ত্বাবধানেই তাঁহার বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়। শিক্ষার জন্য গৃহ-শিক্ষক প্রভৃতি নিযুক্ত থাকিলেও লেখাপড়ায় কবির তাদৃশ মনোযোগ ছিল না। জীবনের বাঁধাধরা নিয়মের বিরুদ্ধে তিনি সদাসর্ব্বদাই বিদ্রোহ করিতেন। স্কুল পাঠ্য-পুস্তক কিম্বা শিক্ষকের উপদেশানুযায়ী তাঁহার শিক্ষালাভ হয় নাই। প্রকৃতিকেই তিনি করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের শিক্ষাগুরু। কবির শৈশবে বাড়ীর একজন পুরাতন ভৃত্য সুর করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিত, তৎ শ্রবণে পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক শিশু রবীন্দ্রনাথ সুর করিয়া "রামায়ণ" ও "মহাভারত" পাঠ করিয়া বাড়ীর সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলে পাঠকালে নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া শিক্ষকগণের প্রশংসাভাজন ও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এখানেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে পরে ডালহুসী পাহাড়ে তৎপরে অমৃতসর, হিমালয় প্রভৃতি স্থানে তিনি কিছুকাল ভ্রমণ করেন। এই সময় পিতার নিকটে জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অনন্তর বঙ্গে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সিবিলিয়ান রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্ম্মস্থল আমেদাবাদে

গিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় তথায় ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে প্রত্যেক বিষয়েই কবির অনুসন্ধিৎসা আরও বৃদ্ধি পায়। বাড়ীর পার্শ্বে পর্ণকুটীরে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি বাস করিত, বিস্ময়ে কবি তাহাদের লক্ষ্য করিতেন। প্রত্যেক ঘটনাতেই তিনি নূতন একটা কিছু দেখিতে পাইতেন। কবির ভ্রাতাগণও প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা কবিকে লিখিতে উৎসাহ দিতেন। সকলেই ভালবাসিতেন, বিশেষতঃ কবির ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কবিকে শৈশবে খুবই স্নেহ করিতেন প্রকৃতিকে কবি বাল্যকাল হইতেই ভালবাসিতেন। তিনি শৈশবে একবার কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী কোনও এক গ্রামে গমন করেন, তথায় প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্যে কবিবর মোহিত হন; নির্ম্মল উষা, বৃক্ষের মাথায় সূর্য্যাস্তের শেষ কিরণ সম্পাত—পাখীর গান—প্রত্যেক বিষয়ে কবি আনন্দ পাইতেন। পঞ্চদশ বৎসরের পূর্ব্বেই কবির লেখা "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হয়। কবির প্রথম জীবনের লেখা "বনফুল" ও এই সময় বাহির হয়। "বনফুলে" বনের বিষয় লিখিত, সহজ সরল সুন্দর ভাষায় বনের ফুলের কথা কবি বুঝাইয়া দেন। তৎকালে কবির বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর মাত্র। সেই সময়েই ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "ভারতী" নাম্নী মাসিক-পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর কবিবর প্রথম বিলাত যাত্রা করেন; বিলাতে গমন করিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবেশ করিয়া কিছুদিন ইংরাজী-সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার ইনি ইউরোপ খণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভাব অসাধারণ। গীতিকাব্যে উচ্চ পবিত্র পরমার্থ-তত্ত্ব পূর্ণ কবিতা ও সঙ্গীতে কি, নাটক উপন্যাস ও প্রহসনে কি, সাহিত্য, সমাজ বা দার্শনিক প্রবন্ধাদিতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁর বিরচিত গ্রন্থ বিস্তর। আমরা কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিতেছি—বৌ ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, রাজা ও রাণী, মানসী, কড়ি ও কমল, বিসর্জ্জন, ইত্যাদি। কিছুদিন "সাধনা" নামক মাসিক পত্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সাধনা উঠিয়া যায়। কলিকাতা মজুমদার লাইব্রেরি হইতে স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বঙ্গ দর্শন" (নব পর্য্যায়) নামক মাসিক পত্রের বিশেষ যোগ্যতার সহিত কিছুদিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত

বঙ্গের বিখ্যাত মাসিক-ও সাময়িক পত্র ও পত্রিকায় ইনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। ইহাঁর রচনাগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সমাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও ইহাঁর শক্তি অল্প নহে। নিজের বিরচিত সঙ্গীত নিজেই স্বরযোজনা করিয়া স্বাভাবিক সু-কণ্ঠে শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে মন্ত্র-মুগ্ধ করিবার অসাধারণ শক্তি আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কলিকাতা জোড়াসাঁকো আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক-ব্রাহ্মোৎসবের সময় ১১ই মাঘ ঠাকুর বাটীতে শত সহস্র মহানুভব ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য সমাবেত হইতেন। ইদানীং রবীন্দ্রনাথ জীবনের অধিকাংশ সময় বোলপুর শান্তি নিকেতনেই অবস্থান করেন। শান্তি নিকেতনে অনেকগুলি বালক বালিকা ও যুবককে প্রাচীন আর্য্যরীতিনীতি অবলম্বনে ধর্ম্ম-মূলক সুশিক্ষা প্রদানের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ২০ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের উদ্‌যোগে দেশের যাবতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাহিত্য রথীগণ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ) রবিবার কলিকাতার টাউন হলে একটী বিরাট সভার অনুষ্ঠান করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গজ-দন্ত-ময় পাত্রে (প্রাচীন পুঁথির আকারে) ক্ষোদিত অক্ষরে রচিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ইংলণ্ডে ইহাঁর বিরচিত "গীতাঞ্জলি" নামক পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হওয়ায় ইহাঁর অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির খ্যাতি পাশ্চাত্য প্রদেশের বুধমণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিবেচিত হওয়ায় জগদ্বিশ্রুত "নোবেল প্রাইজ" প্রাপ্ত হন; এই প্রাইজের মূল্য ১ এক লক্ষ ২০ বিশ হাজার টাকা। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সম্মান সূচক "ডাক্তার" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ সে জুন ভারত-গভর্ণমেণ্ট রবীন্দ্রনাথকে "নাইট" (স্যার) উপাধি প্রদান করেন।

চিরায় ভবতঃ—রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার সুসন্তান, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের সম্মান অর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও বঙ্গ-সাহিত্য-সেবকগণের মুখউজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে কাব্যে, সাহিত্যে শান্তি নিকেতনে আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মনীতি শিক্ষা কার্য্যে যে ভাবে সপ্ততি বৎসরকাল বঙ্গদেশের অশেষ হিতসাধন করিতেছেন। আমরা কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি, রবীন্দ্রনাথের নাম অক্ষয় হউক, ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

নিরাশায় আশার আলো।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

ব্যর্থতায় আর নাহি কোন ক্ষোভ
পরাজয়ে আর নাহিক লাজ,
ব্যর্থতার ব্যথা ভুলিয়া এখন
সফলতা আনা মোদের কাজ,
কে বলিবে কাজ কবে শেষ হবে,
হতাশার নিশি প্রভাত হইবে,
সফলতা রবি পূরবে উঠিবে,
পরিয়া নবীন রঙ্গীন সাজ।
কত কর্ম্মী রবে পথের মাঝারে
হতাশা আঁধারে পড়িয়া লুটি,
কোনও দিকেতে না চাহিয়া ভুলি
লক্ষ্যের পথে চলেছে ছুটি,
কত কাঁটা তব বিঁধিবে চরণে,
কত শেলাঘাত সহিবে পরাণে,
কতই কাঁদিবে নীরবে বেদনে,
তথাপি চলিতে হইবে ছুটি।
যে পথেতে নাই বেদনার জ্বালা
দুঃখ নাহি আছে কেবলি সুখ,
যে চোখে বহে না তপ্ত-অশ্রু
ভাসায়ে নিজের কঠিন বুক,
সে পথের পানে কভু না চাহিয়া,
মরীচিকা ভ্রমে বৃথা না ঘুরিয়া,
পরের কষ্ট নিজের করিয়া,
বরিতে হইবে সবার দুখ।
সত্যের ধ্বজা উড়াতে হইবে
ধুইয়া ফেলিয়া মনের কালো,

হৃদয় মাঝারে অতি সঙ্গোপনে
দেবতার তরে দেউটী জ্বালো,
ল'য়ে চল যদি সততার ডালা,
তবে নাহি পাবে ব্যর্থতার জ্বালা,
পরাজয় আনে বিজয়ের মালা
নিরাশার পরে আশার আলো।

বন্ধকী পুত্র।

প্রকৃত ঘটনা।

অনেক দিনের কথা বলিতেছি, জেলা মেদিনীপুরে নিশ্চিন্তপুর মহকুমায় ধর্ম্মদাস বাবু মুন্সেফী করিতেন। মৌলিক কায়স্থ, পিতার একমাত্র পুত্র। পিতা বৃদ্ধ বয়সে সকল কর্ম্মে অবসর গ্রহণ করিয়া একমাত্র পিতৃভক্ত পুত্রের উপার্জ্জনে সংসার ক্ষেত্রে দিনপাত করেন। প্রতি মাসে বেতনের সমস্ত টাকা ধর্ম্মদাস পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন, পিতাও মাসে মাসে পুত্রের আবশ্যক মত সমস্ত খরচ পত্র দেন। দুই মাস হইল, পুত্র আর পিতার নিকট টাকা পাঠান না, পত্রও লিখেন না; অবশ্য বধূমাতা পুত্রের নিকটেই ছিলেন। বৃদ্ধ পিতা মনক্ষোভে, অভিমানে আজ তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া পুত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত। পরস্পর প্রেমালিঙ্গনের ও কুশলাদি প্রসঙ্গের পর প্রতিমাসে টাকা না পাঠাইবার কারণ পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুত্র কহিল,—বাবা! বন্ধকী সম্পত্তি যতদিন দায়-মুক্ত না হয়, ততদিন তাহাতে সত্ত্বাধিকারীর ত কোন অধিকার থাকে না। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! বন্ধকী সম্পত্তি কি? আমি ত বুঝিলাম না।

পুত্র। বাবা, বুঝিলে বোধ হয়, এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না। স্মরণ আছে কি? আপনি আমাকে বন্ধক দিয়া একদিন ৩০০০৲ টাকা লইয়াছিলেন। যতদিন সুদ সমেত সেই ৩০০০৲ টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, ততদিন আমার উপার্জ্জিত অর্থ আপনার নহে। ততদিন আমি আপনার পুত্রও নহি।

পিতা। স্থির হও ধর্ম্মদাস, স্থির হও। তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ছুটী লইয়া বাটী চল; আমি তথায় বৈদ্য দ্বারা তোমায় চিকিৎসা করাইব।

পুত্র। চিকিৎসা পরে করাইবেন। আপাততঃ যাহা করিয়াছি শুনুন। স্মরণ আছে কি, ১১ বৎসর পূর্ব্বে এই নিশ্চিন্তপুরে এক নিরীহ ভদ্র-লোকের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। কালমাহাত্ম্যে আপনার ন্যায় সদাশয়েরও মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়াছিল। নগদ ৩০০০৲ টাকা লইয়া আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। আপনি জানিলেন—বিবাহ দিলেন. আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই জানিল বিবাহ দিলেন, আমিও তখন তাহাই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার মস্তকে বজ্রাঘাত পড়িয়াছে। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার ভদ্রাসন জমাজমী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধক দিয়া সেই ৩০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধের উপায় কিছুই না পাইয়া উত্তমর্ণের কটূক্তি অসহ্য বোধে উদ্বন্ধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। বিধবা অল্পদিন পরে উত্তমর্ণের তাড়নায় সামান্য কুটীর আশ্রয় করিয়া কোনদিন অনশনে, কোনদিন অর্দ্ধাসনে দিনপাত করিতেছিলেন। আমি সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার ভদ্রাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, স্বয়ং সেই উত্তমর্ণদিগের গিয়া বন্দোবস্ত করিয়া ভদ্রাসন তাঁহার নামে করিয়া দিয়াছি। আমার সামান্য খরচ ও সপুত্র বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় করিয়া আমার বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকে, গত দুই মাস সেই সমস্ত উত্তমর্ণকে দিয়াছি। ভবিষ্যতে যত-দিন ঋণ পরিশোধ না হইবে, এই নিয়মে টাকা পরিশোধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।

পিতা। আঃ! অবাগের বেটা! বলিস্ কি?

পুত্র। আর বলাবলি কি? প্রথমেই ত বলিয়াছি যে, আমি আপনার বন্ধকী সম্পত্তি। যতদিন ঋণ পরিশোধ না হয়, এবং বিধবার সেই অপগণ্ড সন্তানের কোন একটা বন্দোবস্ত করিতে না পারি, ততদিন আমি আপনার পুত্র নহি, এবং আপনি আমার পিতা নহেন। নিষ্কৃতি কালাবসানে আপনার পুত্র আপনারই দাসানুদাস হইয়া থাকিবে।

পিতা পরদিন অধোমুখে নিরুত্তরে, ভগ্নহৃদয়ে, মন্দ গমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য ধর্ম্মদাস প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ হন নাই।

বঙ্গীয় যুবকগণ! আর উন্মত্ত ধনলিপ্সা পিতার লোভে বশীভূত হইয়া চির-জীবন ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইও না। পিতার পুত্র হইয়া থাক। দশের মধ্যে গণ্য মান্য হইয়া নিজে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পিতামাতাকে রক্ষিত করিও না। এই ঘোর দুঃসময়ে তোমরাই একমাত্র আশা। পিতা মহাশয়েরা আজ কন্যাদায়ে জড়িত হইলে সভা করিতে যান, পুত্রের বিবাহ কালে কিন্তু সে কথা ভুলিয়া পণ প্রথার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়াও মেয়ের পিতার হৃদ্‌পিণ্ডের শোনিত

পূর্ণ টাকার থলি হাসিমুখেগ্রহণ করেন। তদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন বোধ হয়, তাঁহাদের এই অবস্থাই থাকিবে। কেন আর আপনা আপনি ঝগড়া করিয়া মর। আত্মবিরোধের প্রথম সোপান বিবাহে পণপ্রথা।

বাঙ্গলার যুবকগণ! ধনলোভী পিতার এই অপকর্ম্মের জন্য বাঙ্গলায় কত সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে জান কি? কত কুমারী স্নেহ-লতার ন্যায় জলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে? ধিক্ তোমাদের শিক্ষাগৌরবে! ধর্ম্মদাসের ন্যায় পিতার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিতে পার না? উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই, শ্বশুরের সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নবাবী করিতে লজ্জা হয় না? সঃ ২।২।৩৮

জীবই কৃষ্ণ।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

জীবই কৃষ্ণ, এ কথা ধ্রুব সত্য। আশৈশব আমরা শুনিয়া আসিতেছি, "যত্র জীব তত্র শিব," যত জীব তত শিব। সাধক রামপ্রসাদের সঙ্গীতে আছে, কালী ঘটে ঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন!" আচার্য্য শঙ্করাচার্য্য প্রভু বলিয়াছিলেন, "সচ্চিদানন্দ রূপ শিবোহহং" সোহহং শব্দের অর্থ তিনিই আমি আমিই তিনি। আমার আমিত্ব কিছুই নাই, তিনি ছাড়া এ জগতে কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারে না, থাকা অসম্ভব। জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, স্থাবর জঙ্গমে লতায় পাতায় সর্ব্বত্রই তিনি বিরাজ করিতেছেন। আমার যে, এই আমিত্ব স্বরূপ দেহ তাহাও তাঁহারই। দেহ রূপ উপাধি আছে, বলিয়াই আমার আমিত্ব, কিন্তু আমি কোথায়, তাহা আমিই খুঁজিয়া পাই না, তা অন্যে পাইবে কিরূপে? এই আমি কে, যেদিন সন্ধান পাইব ও সাক্ষ্যাৎকার লাভ করিব, সেই-দিন সেই মুহূর্ত্তে আমার আমিত্ব লয় হইয়া যাইবে। তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইব, তিনি এক, অখণ্ড অনন্ত অব্যক্ত তিনি ছাড়া আর কিছু নাই, আমার আমিত্ব যাহা তাহাও তাঁহার স্ফুলিঙ্গ মাত্র। সুতরাং জীবই কৃষ্ণ এ কথা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইল।

আত্ম-দর্শন বা আত্ম-সাক্ষ্যাৎকার জীবের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। মানুষ যতদিন সেই লক্ষ্যে উপনীত হইতে না পারে, ততদিন ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি তর্ক

বিতর্ক বাকবিতণ্ডা করিয়া থাকে, লক্ষ্য স্থির হইলে আর কিছু করিবার প্রয়োজন হয় না। এই লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য সাধন-ভজন সৎসঙ্গ সদালাপ সদ্‌গ্রন্থ পাঠ সাধু মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ প্রয়োজন। ইহার মধ্যে গুরু করণ সর্ব্বোপরি, বিনা গুরু কেহই গন্তব্য পথে উপনীত হইতে পারে না। গুরুকে মনুষ্য বোধ করিয়া সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিলে অপরাধী হইতে হয়। গুরু-গোবিন্দ কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। গুরুর কৃপালাভ করিতে পারিলে কিছুরই অভাব হয় না। এমন দুর্লভ গুরু লাভ যিনি করিয়াছেন, তিনি ধন্য ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।

জীবই কৃষ্ণ, এ কথা আমরা প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে অনুভব করিয়াও স্বীকার করি না, ইহাই অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। যে অজানা রত্ন মানুষ জন্মাবধি লাভ করিয়াছে এবং মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত দেহে অবস্থান করিবে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই জীবই কৃষ্ণ, এ কথা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। প্রাণ বায়ুরূপী অজপা মহারত্ন লাভ করিয়াও যদি মানুষ জীব-কৃষ্ণ এ কথা স্বীকার না করে, তাহা হইলে যেদিন গুরু কৃপা হইবে সেইদিন অতি সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

এই অজাপাকে ব্রহ্মময়ী মা, কৃষ্ণ, শিব, কালী, দুর্গা, যা কিছু বলিয়া তৃপ্তিলাভ হয়, তাহাই প্রাণ ভরিয়া বলিয়া আনন্দে বিভোর হইতে পার। সবই তিনি, সবই তিনি, সবই তিনি। তিনি ভিন্ন এ জগতে কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারে না, কিছুই থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মানুষ বৃথা কচ্‌কচি বিবাদ বিসম্বাদ দ্বেষ, হিংসা দ্বন্দ, কলহ কেন করে, তাহা বুঝিতে পারি না। ইহাও সেই অনন্ত ইচ্ছাময়ের অনন্ত ইচ্ছার মধ্যে অন্যতম ইচ্ছা ভিন্ন অপর কিছুই নয়।

"জীবই কৃষ্ণ" "জীবই ব্রহ্ম" "জীবই কালী" "জীবই তারা" "জীবই দুর্গা" সবই লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা। প্রত্যেক দেহেই ব্রহ্ম সুপ্তভাবে অবস্থিত। সেই সপ্ত ভাবকে সাধনার দ্বারা জাগরিত করিতে পারিলে আত্ম-দর্শন বা ব্রহ্ম সাক্ষ্যাৎকার লাভ হয়। তখন জীবই কৃষ্ণ, এ কথা অকুণ্ঠ-চিত্তে স্বীকার করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। তখন জ্বালা যন্ত্রণা অভাব অভিযোগ কিছুই থাকে না। তখন পূর্ণানন্দে পূর্ণ ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। জীবই কৃষ্ণ এ কথা আমার ক্ষুদ্র ধারণায় যৎ সামান্য যতটুকু উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, গুরু কৃপায় সাধ্যানুসারে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম মাত্র। সজ্জন-মণ্ডলী দোষ গুণ কৃপা করিয়া মার্জ্জন ও গ্রহণ করিবেন। অলমতি বিস্তারেণ গুরোঃ কৃপাহি কেবলং।

বটকৃষ্ণ পালের এড্‌ওয়ার্ডস টনিক বা

য়্যান্টি ম্যালেরিয়াল স্পেসিফিক্।

ম্যালেরিয়া ও সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এরূপ আশু শান্তিদায়ক মহৌষধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত।

মূল্য বড় বোতল ১৷৷০, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ১৲, ছোট বোতল ১৲, প্যাকিং ও ডাক মাশুল ৵০ আনা। রেলওয়ে কিম্বা ষ্টিমার পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভে হয়। পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

সাইটোজেন।

নব যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টনিক ওয়াইন।

অজীর্ণতা সাধারণ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিম্বা প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার সমতুল্য উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। মূল্য প্রতি বোতল ১৷৷০ মাত্র

গোল্‌ড সার্শা-প্যারিলা

স্বর্ণঘটিত সালসা।

দূষিত শোণিত শোধিত ও শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা অদ্বিতীয়।

উপদংশ, মেহ, পুরুষত্ব হানি, স্মৃতিশক্তির হ্রাস প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগে বহুদিন যাবৎ ভুগিয়া যাঁহারা জীবনে হতাশ হইয়াছেন,—তাঁহারা আমাদের এই মহৌষধ সেবন করিয়া দেখুন, শরীরে নববল সঞ্চারিত হইবে, সৌন্দর্য্য, পুষ্টি, মেধা স্মৃতি ও ধারণা শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৷৷০ আড়াই টাকা মাত্র।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাব্‌লেট্।

কলিকাতার হেলথ আফিসারের ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত।

কলিকাতার হেলথ আফিসারের অনুমত্যানুসারে আমরা তাঁহারই ব্যবস্থা (Formula) অনুযায়ী এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ প্রস্তুত করিয়াছি। পাঁচশ বটিকা পূর্ণ-প্রতি শিশি মূল্য ৸০ বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বি. কে. পাল এণ্ড কোং কেমিষ্টস ও ড্রাগিষ্ট।

১ ও ৩ নং বন ফিল্ডস লেন, কলিকাতা।


স্বাস্থ্যের পথে

অমৃতবল্লী কষায়

কি রোগী কি সুস্থ

সকলের পক্ষেই ইহা সমান উপকারী।

কবিরাজ
নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
১৮।১।১৯ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শ বর্ষ] ১৩৩৮ জৈষ্ঠ, [২য় সংখ্যা]

১। শ্রীমদ্ [illegible]—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩
২। চিরদুঃখী—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪১
৩। সত্যকাম জাবাল শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাব্যরত্নাকর ৪২
৪। শ্রেষ্ঠ কে ?—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ৪৩
৫। সুন্দরীর উপকথা—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু ৪৬
৬। বিদায়কালে—শ্রীযুক্ত শৈলরাণী বসু বি, এ, ৫৬
৭। কবিবর৺দাশুরায়ের অনুপ্রাস—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৫৭
৮। অভিমান ও অহঙ্কার—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬০
৯। তিনটি কবিতা ভিন্ন ভিন্ন লেখক ৬১, ৬৩
১০। সমালোচনা ৬৪

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

7-8-31

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বরছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B. মজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৮৩৩

চিরানুগত

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারীং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

Post Box 337 Cal Phone : 5580 Cal

নিবেদন।

গ্রাহক-মহোদয়গণের প্রতি সানুনয় নিবেদন :—

১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা "জন্মভূমি" আপনাদের সমীপে প্রেরিত হইল। আশা করি, বৈশাখ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই অবিলম্বে জন্মভূমির ১৩৩৮ সালের বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা সত্বর-প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৬৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

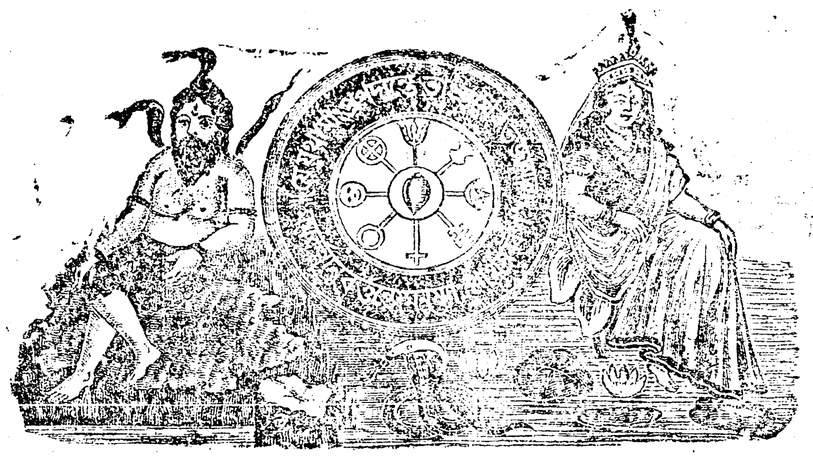

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ } ১৩৩৮ সাল জ্যৈষ্ঠ, { ২য় সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরমাত্মাদেবই সাধুদের সদারক্ষক।

প্রথম ঘটনা—নরাসংগড়ে।

পরমাত্মাদেবই যে সাধুদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করেন ইহার ২।৪টী ঘটনা যাহা গুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, তাহার ২।১টী পাঠক-বর্গকে শুনাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।

ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত নারায়ণগড় নরসিংহগড় নামক একটী ছোট করদ প্রদেশ আছে। ইহার রাজধানীর নাম নরসিংহগড়। এই রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটী পাহাড়ে এক মনোহর ঝরণা আছে। সে স্থানটী বেশ নির্জ্জন

ও যোগীদিগের পরম আরামদায়ক। সেখানে বহুসংখ্যক যজ্ঞডুমুরের বৃক্ষ আছে। লোকমুখে ইহার বিবরণ শুনিয়া গুরুদেবের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সেস্থানে একান্তে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন। এ স্থানে অন্য কোন আহার্য্য মিলিবে না জানিয়া সঙ্গে চারি দিনের মত আটা লইয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল ৪ দিন সেখানে অতিবাহিত করিবেন। এইরূপ স্থির করতঃ উক্ত স্থানে গিয়া একটী বৃক্ষমূলে আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। চারিদিনের মত আটা চারি সমান অংশে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন ও সুপক্ক যজ্ঞডুমুর সহ রুটী ভক্ষণ করিবেন স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। জঙ্গলে ধুনির কাষ্ঠ সহজ প্রাপ্য ছিল। ঝরণার জল ছিল সুমিষ্ট ও সুপেয়; ইহার উপর আটা সঙ্গে থাকায় কোন চিন্তাই ছিল না। স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্যও ছিল অতি মনোরম, এজন্য একান্ত মনে পরমানন্দে সেখানে অতিবাহিত করিবেন ইহা বেশ বোধ হইয়াছিল। বাস্তবিকই এরূপ ভাবে তিন দিন কাটিয়া গিয়াছিল। এক দিনের মত আটা ছিল, তথাপিও এ মনোরম স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। মনে এ স্থির করিয়াছিলেন যে সেখানে আরও ২।৪ দিন বাস করিবেন। তখন হইতে এক দিনের আটা আরও অংশ করিয়া ডুমুরের সহিত আহার করিবেন ও ইহার পর ২।১ দিন না হয় কেবল ডুমুর খাইয়াই থাকিবেন। কোন কোন স্থানের যে এরূপ এক আকর্ষণী শক্তি আছে ইহা আমাদের মত অজ্ঞানীরও সিংভূম মানভূম ও উড়িষ্যা প্রদেশে অনুভবে আসিয়াছিল। সুতরাং সংসারবিরক্ত যোগীগণের যে এরূপ হইবে তাহার বিচিত্রতা কি? যাহা হউক, এরূপ স্থির হইবার পর গুরুদেব নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষ শাখায় ঝোলাটী লট্‌কাইয়া কৌপীন ও বস্ত্র শুকাইতে দিয়াছিলেন ও পরম শান্তিতে নিজ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এরূপ সময়ে চতুর্দ্দিক হইতে অকস্মাৎ হো হো হো শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। চারিদিক হইতেই বন্দুকের গুলি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল ও ২।৪টী গুলি মহারাজের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। ২।১টি গুলি আসিয়া তাঁহার কটী বস্ত্র ও উত্তরীয়াচ্ছাদন বিদ্ধও করিল। এরূপ অবস্থায় ইহা এক বিষম বিপত্তিই উপস্থিত করিল। গুলি চারিদিক হইতেই আসিতেছিল। এজন্য সেখান হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলেও নিস্তার পাইবার আশা ছিল না। এজন্য মহারাজ স্থির করিলেন যে প্রাণ যদিই বা যায় তবে ভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে যাওয়াই ভাল। এরূপ মনে করিয়া একটী বৃক্ষকে আচ্ছাদন দিয়া নিজ আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তিনি সমাধিস্থ হইলেন। কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিলেন বলিতে পারেন না।

কিন্তু যখন তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন যে রাজপরিচ্ছদধারী এক পুরুষ কতিপয় সঙ্গীর সহিত তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। পরিচয় লইয়া জানিলেন যে ইনিই নরসিংহগড়ের রাজা। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি জানাইলেন যে, তিনি সঙ্গীদিগের সহিত শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রক্ষিপ্ত গুলি মহারাজের বস্ত্র ও তাঁহার আচ্ছাদিত বৃক্ষটীও ভেদ করিয়াছে। ক্ষমা চাহিবার কারণ এই যে এখনি তিনি সাধুহত্যা করিয়া মহাপাতকী হইতেন। নানাভাবে তিনি কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন, ও অমাত্যবর্গ সহিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ বুঝাইলেন যে তাঁহাদের কিছুমাত্র অপরাধ হয় নাই। কারণ কিরূপে তাঁহারা জানিবেন যে, এই নির্জ্জন প্রদেশে তিনি অবস্থান করিতেছেন। ইহার পর কথাবার্ত্তার ক্রমে তাঁহারা অবগত হইলেন যে, মহারাজ তিনদিন সেখানে অবস্থান করিতেছেন, রুটী ও ডুমুর খাইয়া আছেন। ইহাতে আরও যেন চমৎকৃত হইয়া গেলেন। মহারাজকে রাজধানীতে যাইবার জন্য নানারূপ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন ও জানাইলেন যে সে মনোরম স্থানে আর কয়েক দিন থাকিবার তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা অগত্যাই বিদায় লইলেন। যাইবার সময় তাঁহার সহিত যে নানাবিধ মেওয়া ছিল তাহার দ্বারা মহারাজের ঝোলাটী পরিপূর্ণ করিয়া গেলেন।

গুরুদেবকে দেখিয়া রাজার হৃদয়ে এক পরম ভক্তিভাবের উদয় হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি যাইয়া এ ব্যাপার রাণীকে বলিয়াছিলেন। কারণ দেখা গিয়াছিল যে পরদিন রাজা ও রাণী কতিপয় ভৃত্য ও সহচরীর সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের এ সময়কার আকৃতি অতি মনোহর ছিল। তাঁহার শরীরের বর্ণ ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কান্তি ছিল সুবর্ণময় ও গঠন ছিল এক বলিষ্ঠ যুবা পুরুষের। ইহার উপর দীর্ঘ জটা, প্রশস্তায়তন ললাট, সুঠাম দেহ ও প্রফুল্লায়তন চক্ষু যে দেহের এক অপূর্ব্ব শোভা আনয়ন করিয়াছিল, ইহা যাহারা তাঁহার বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়সের আকৃতি দেখিয়াছেন তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। রাণী গুরুদেবকে দেখিয়া কাঁদিয়াই আকুল হইলেন। বাটীতে কে কে আছে, কি জন্য ও কতদিন সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন ইত্যাদি বহু প্রশ্নই তিনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছিল মহারাজ কোন রাজকুমার। সকলে ভক্তিভাবে স্তব স্তুতি করিবার পর তাঁহাদের সহিত রাজধানীতে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। রাণী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সেই

হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ জঙ্গলে একাকী থাকা অকর্ত্তব্য বুঝাইতে লাগিলেন। গুরুদেব জানাইলেন যে, সে আরামদায়ক স্থানে আরও ২।৪ দিন তাঁহার থাকিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তখন অগত্যাই তাঁহারা ফিরিতে উদ্যত হইলেন। সঙ্গে যে সকল খাদ্য দ্রব্য আনিয়াছিলেন, তাহা দিয়া গেলেন ও যাইবার সময় বিশেষ ভাবে প্রার্থনা করিলেন যে, সেখান হইতে উঠিবার সময় রাজধানীতে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তবে যেন অন্যত্র গমন করেন। মহারাজ চেষ্টা করিবেন, এইমাত্র বলিলেন। পরে তিনি আর রাজধানীতে গমন করেন নাই। কারণ তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, হয়ত সেখানে গিয়া কোনরূপ বন্ধনে পতিত হইবেন।

পাঠকগণ! বুঝিলেন যে এরূপ জঙ্গলের ভিতরও পরমাত্মাদেব কিরূপ ভাবে খাদ্য আনাইয়া উপস্থিত করেন। যথার্থ সাধু তাঁহারই বাহ্যিক কলেবর। শ্রীভগবান গীতাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "এবং সতত যুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং।" আমরা তাঁহাতে সতত যুক্ত হওয়া যে কি তাহা বুঝি না। এজন্য সর্ব্বদাই ভীত হইয়া বেড়াই।

দ্বিতীয় ঘটনা—কামাখ্যার পথে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গুরুদেব প্রথমে একবার কামিখ্যা দর্শন করিবেন মনে করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করেন। কিন্তু এবারে পথিমধ্যে কোনরূপ আদেশ পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহা কিরূপ তাহা শুনাইতেছি।

এবার ভ্রমণ করিতে করিতে পদব্রজে তিনি ধুবড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ইচ্ছা হইয়াছিল সেখান হইতে ষ্টীমার যোগে কামাখ্যায় যাইবেন। সঙ্গে ষ্টীমারের ভাড়ার মত টাকা ছিল না। এজন্য ধুবড়ীতে এক মাড়োয়ারীর নিকট যাইয়া কিছু অর্থ ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু এ ব্যক্তি কিছুই সাহায্য করিল না। অগত্যা ষ্টীমার ঘাটের নিকট যাইয়া সেখানে কাঙ্গালীদের যে একটী আশ্রম ছিল তাহার সন্নিকটে বৃক্ষমূলে যাইয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষ্টীমার অদূরে তীরে বাঁধা ছিল। মহারাজ স্থির করিয়াছিলেন যে, পরদিন যখন ষ্টীমার ছাড়িবে সে সময়ে কোনরূপে উহাতে যাইয়া বসিবেন ও তখন তাঁহাকে সাধু দেখিয়া হয়ত যাইতে দিবে। ইহা স্থির করিবার পর রাত্রে নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া গৌরীশঙ্কর মালা জপ করিতে আরম্ভ করেন। কতক্ষণ এরূপ ভাবে জপে নিবিষ্ট ছিলেন তাহা স্মরণ হয় না। তবে এ অবস্থায় উপবেশনকালে তাঁহার যেন বোধ হইয়াছিল যে, দুইদিক হইতে দুইটী দেওয়াল তাঁহার উপরে আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ও তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার মত হইয়াছে। এ অবস্থায় আরও বোধ হইয়াছিল যে, একটী ছোট কন্যা

আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে "গোঁসাই! তুই ফিরিয়া যা।" হঠাৎ এরূপ একটা ভাব হওয়ার পর তিনি জাগরণ অবস্থা পাইলেন এরূপ বোধ করিয়াছিলেন। তখন মনে করিলেন যে, প্রাচীর চাপা পড়া ও কন্যাটীর আদেশ "গোঁসাই! তুই ফিরিয়া যা" ইহা একটা স্বপ্নেরই ব্যাপার। তবে জাগরণের ভাবে আসিয়া দেখিলেন যে হাতের মালা ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে। তখন পূর্ব্ব অবস্থাটী স্বপ্ন বলিয়াই ধারণা হইল। সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিলেন যে অদূরে ষ্টীমার পূর্ব্ববৎ বাঁধাই আছে। তখন আদেশে জানিয়াছেন যে, "তুই ফিরিয়া যা।" ইহা শুনিয়া এক্ষণে কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। এমত সময়ে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন যে, তখন রাত্রি ৩টা বা ৩॥ টা বাজিয়াছে। পর্য্যটনকালে এই সময়ই মহারাজের "বিশ্রামদান" যাইবার বা শৌচ-স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরম গুরুদেবেরও এরূপ নিয়ম ছিল তাহা তাঁহার জীবনীতে জানাইয়াছি। এখনও গুরুদেবের প্রায় এই নিয়ম আছে। তবে ৩টা বা ৩॥ টায় উঠিয়া শয্যায় বহুক্ষণ ধ্যানস্থ থাকেন ও ইহার পর প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই শৌচ-স্নান সম্পন্ন করতঃ প্রাতঃকৃত্য করিতে থাকেন ও পরে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করেন। তিনি অনেকবার বুঝাইয়াছেন যে, এ সময়ই শয্যাত্যাগ ও জপাদি ক্রিয়ার প্রশস্ত সময়, ও ইহাই হইতেছে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত। এ সময়ের বায়ু অতি বিশুদ্ধ ও প্রকৃতি দেবী এ সময়ে এক বিশেষ সাম্যভাবে থাকেন। গুরুদেবের শিষ্যগণের অনেকেই এই নিয়ম প্রতিপালন করেন। তিনি আরও শুনাইয়াছেন যে, পর্য্যটনকালে এ সময়ে শয্যাত্যাগ আরও প্রশস্ত। এ সময়ে শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য বিশেষ অসুবিধা হয় না। প্রত্যূষ হইবার পর এ সকল জন্য লোক চক্ষুর সমীপে পতিত হইয়া অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

যাহাহউক শৌচাদির পর নিত্যক্রিয়ার জন্য পুনরায় আসনে বসিলেন, ও ইহার পর সকাল হইয়া গেল। পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনা স্মরণ করিয়া কামাখ্যা যাইবেন কি না, ভাবিতে ভাবিতে আসন উঠাইলেন ও নিকটে আকালীদের যে মঠ ছিল সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটী মুসলমান ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ফকীর মহারাজকে সম্ভাষণ করিয়া "দর্শন সদা" বলিয়া অভিবাদন করিলেন ও মহারাজও তাঁহাকে "দিদাদোরকানফা" বলিয়া প্রত্যভিবাদন জানাইলেন। পরে ফকীরজী মহারাজ কোথায় যাইবেন? জিজ্ঞাসা করায় কামাখ্যা যাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। ইহা শুনিয়াই ফকীরজী মহারাজকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, কামাখ্যায় ভয়ানক "হাজাবেমার" বা

কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন বিস্তর লোক মারা যাইতেছে। কত লোক মরিয়া পড়িয়া আছে, উঠাইয়া ফেলিবার লোক মিলিতেছে না। পূর্ব্ব রাত্রিতে কুমারী কন্যার স্বপ্নে আদেশ ও এক্ষণে ফকীরের মুখে এ বৃত্তান্ত শুনিয়া মহারাজ বুঝিলেন যে, দেবীর যাইবার আজ্ঞা নয়। এতদূর আসিবার পরও অগত্যা এ যাত্রা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সাধুগণের উপর পরমাত্মাদেবের কিরূপ কৃপা হয় ইহা হইতে অবশ্যই সকলে বোধ করিতে পারিবেন।

তৃতীয় ঘটনা—কামাখ্যা দর্শন ও ইহার পথে।

পূর্ব্বে সংক্ষেপে জানাইয়াছি যে কলিকাতা হইতে তারকেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক সেখানে প্রায় এক বৎসর অবস্থানের পর মহারাজ পুনরায় কামাখ্যা দর্শনে যাত্রা করেন। এবার পদব্রজে বুড়ি গ্রাম পর্য্যন্ত গমন করেন। সেখানে এক মাড়োয়ারীর নিকট তাঁহার ঔষধের পেটীকাটি রাখিয়া সেখান হইতে ধুবড়ী গমন করেন। এবার পাগল বেশে কয়েক দিন কামাখ্যায় অবস্থান করেন। ইহার কারণ শুনাইতেছি।

গুরুদেবের প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থার রূপ-মাধুরী অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহা হইতে তাঁহারা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, যৌবনকালে তিনি কিরূপ সুন্দরকান্তি-বিশিষ্ট পুরুষ ছিলেন। এ যুবা বয়সেই তিনি কামিখ্যায় গমন করেন। তিনি কামাখ্যায় যাইতেছেন শুনিয়া ও তাঁহার যুবাবস্থার এ সৌন্দর্য্য দেখিয়া পথে ২।১টি সাধু পরিহাস পূর্ব্বক বলেন যে, ব্রহ্মচারীজী এবার কামাখ্যায় গিয়া কিরূপে সাধনভজন করেন বুঝা যাইবে। তিনি অন্যান্য স্থানেও শুনিয়াছিলেন যে, কামাখ্যা বড় কঠিন স্থান। সেখানে প্রকৃতি দেবীরা এরূপ মোহজাল বিস্তার করেন যে, তাঁহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা বড়ই সুকঠিন। বিশেষতঃ সাধুসন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা আরও কঠিন। আমাদের দেশে বরাবর এক প্রবাদ আছে যে, কামাখ্যায় গমন করিলে মানবের ভাবান্তর ঘটিয়া থাকে। এই ভাবান্তর হইবার কারণ এই যে, সেখানকার প্রকৃতি দেবীরা পবিত্র সরলতার আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাদের কপটতশূন্য মোহিনী শক্তিতে মোহিত হইয়া অনেক পুরুষই অন্যবিধ হইয়া যায়। আমাদের পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে "চাক্ষুষী বিদ্যা" বলিয়া এক বিদ্যার উল্লেখ আছে, যথা—

চাক্ষুষী নাম বিদ্যায়ং যাং সোমায় দদৌ মনুঃ।
দদৌ স বিশ্বাবসবে মনু বিশ্বাবসুর্দদৌ॥

মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি বহু বিদ্যার মন্ত্রসিদ্ধ এই কামাখ্যা হইতে হইয়াছে এরূপ অনেকের বিশ্বাস। বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন যে, নানাছন্দে ও ভাষায় ওঝাগণ যে সব অপূর্ব্ব ভূতের ও সাপের মন্ত্র উচ্চারণ করে তাহার শেষে ভণিতা দেয়, "লাগ্ লাগ্ কাহার আজ্ঞা, না কামরূপ কামিখ্যাদেবীর আজ্ঞা।" এ সকল বিষয় কতদূর সত্য বলা যায় না। তবে ইহা খুব সম্ভব যে, কামাখ্যাবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অনেকেই এ চাক্ষুষী-বিদ্যা বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করিত। আধুনিক Hypnotism. কতকটা ইহা গ্রহণ করিয়াছে। এ বিদ্যা দ্বারা স্ত্রীলোকগণ অনেককেই বশীভূত করিয়া ফেলিত। ইহা বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত "ভেড়া" হইয়া যাওয়া। তবে ইহা শুনা গিয়াছে যে, এখানকার স্ত্রীলোকেরা অনেকেই সুন্দরী ও বহু বিষয়ে তাহারা স্বাধীনা ও প্রগল্‌ভা। সুতরাং চঞ্চলমতি পুরুষেরা সহজেই যে তাহাদের বশীভূত হইয়া যায় ইহা বিচিত্র নহে।

যাহাহউক গুরু মহারাজ পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি শুনিয়া সঙ্কল্প করেন যে, কামাখ্যায় এরূপ ভাবে অবস্থান করিবেন যে তাঁহার নিকটে কেহ যেন না আসিতে পারে। এ কারণে সেখানে উপস্থিত হইয়া কামাখ্যা দেবীর পূজার পর তিনি পাগলের বেশ ধরিয়াছিলেন। গায়ে বেশ করিয়া কাদা মাটী ও ছাই মাখিতেন ও লোকালয় হইতে দূরে আসন গ্রহণ করিতেন। কেহ নিকটে আসিতেছে দেখিলেই নানারূপ পাগলের ভাবভাব দেখাইয়া তাহাদের দিকে কাদা ও ইষ্টকাদি ছুড়িতেন। দুই চারিবার এরূপ করিলেই আর কেহ নিকটে ঘেঁসিত না। বরং তাহারা অপরকে সাবধান করিয়া দিত। এরূপ হইবার পর বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি সাধন ভজন করিতেন।

এরূপে কয়েক দিন কামাখ্যায় অবস্থানের পর গুরুদেব তথা হইতে পদব্রজে মাদারগঞ্জে আগমন করেন। এখানে একটী সাধুর সামান্য এক আশ্রম ছিল। ইহার কুটীরের একখানিতে তিনি আসন গ্রহণ করেন। ইহার পরদিনই তাঁহাকে ভয়ানক কলেরায় আক্রমণ করে। যতক্ষণ শরীরে বল ছিল ততক্ষণ মল ও বমনাদি পরিস্কার করিয়া সেখানে পড়িয়া থাকেন। ক্রমে অনবরত বমন ও মলত্যাগ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে একেবারে অবসন্ন হইয়া উক্ত কুটীরের সেঁতসেঁতে মাটীতে পড়িয়া থাকিলেন। নিজের এ অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল এ যাত্রা তিনি রক্ষা পাইবেন না। এজন্য অতি ক্ষীণস্বরে সে আশ্রমের সাধুটীকে ডাকিয়া নিজের নিকটে যে পাঁচটী টাকা ছিল তাঁহাকে দিলেন ও বলিলেন যে, মরিয়া গেলে এই টাকা হইতে তিনি যেন ২টী কলসী ও দড়ি খরিদ করেন এবং কলসী

২টী মৃত্তিকায় পূর্ণ করিয়া তাঁহার কোমরে বন্ধন করেন ও তাঁহার মৃতদেহ নদীর জলে নিক্ষেপ করেন। তিনি ইহা করিতে সম্মত হইলেন। এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া শরীর নিশ্চয় ছুটিয়া যাইবে এই ধারণার পর একান্ত মনে তিনি পরমাত্মার চিন্তায় তৎপর হইলেন। যখন এরূপ অবস্থায় পড়িয়া আছেন তখন বোধ করিলেন যে, একটি ছোট বালিকা আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল ও তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল "গোঁসাই! তুই ভাব্‌ছিস্ কেন? তুই তো মরিবিনি, তুই বাঁচিয়া যাবি। তবে সত্বর প্রস্থান করিবি।" এরূপ হঠাৎ এক দৈববাণী শুনিয়া গুরুদেব চক্ষুরুন্মীলন করিলেন, কিন্তু সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। উঠিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং সেখানেই পড়িয়া রহিলেন। এরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে যেন তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রা হইয়াছিল স্মরণ ছিল না। তবে প্রত্যূষ হইলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। উষার আলোক দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, ইহাকে সন্ধ্যার আলোক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এ ভ্রমবশে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে মোটে তখন সন্ধ্যা-কাল। এ অবস্থায় কিরূপে সুদীর্ঘ রাত্রি অতিবাহিত হইবে? সুতরাং পড়িয়াই রহিলেন। ক্রমে এ ভ্রম দূর হইল, কারণ সূর্য্য প্রকাশিত হইতে দেখিলেন। রাত্রি তবে কাটিয়া গিয়াছে বোধ করিয়া যেন একটু আশা পাইলেন। এ সময় তাঁহার অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইল। নিকটে একটি কূপ ছিল, একরূপ গড়াইতে গড়াইতে তাহার নিকটে যাইয়া পড়িলেন, এবং যাহাকেই জল আনিবার জন্য যাইতে দেখিলেন, তাহাকেই মাথায় জল ঢালিয়া দিবার জন্য কাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এরূপ ক্ষণ মুমূর্ষু কলেরা রোগীর মাথায় কেহই জল ঢালিয়া দিতে রাজী হইল না; জল ঢালিলে এখনই মরিয়া যাইবে এরূপ সকলে বলিতে লাগিল। তখন ক্ষীণস্বরে তাহাদিগকে বলিলেন যে, তাহারা জল ঢালিয়া না দিলে তিনি কূয়ায় যাইয়া পড়িবেন। ইহা শুনিয়া দুই একজন বলিল যে, জল ঢালিলেও মরিবে, কূয়ায় পড়িলেও মরিবে। এরূপ অবস্থায় কূয়াটি নষ্ট না হইবার পূর্ব্বে জল ঢালিয়া দেওয়াই ভাল। এরূপ বলাবলির পর একজন মাথার উপর খুব খানিকটা জল ঢালিয়া দিল। ইহা করিতেই মহারাজ যেন বেশ একটু সুস্থতা বোধ করিলেন ও সেখানেই বহুক্ষণ পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এ ভাবে পড়িয়া থাকিবার পর তাঁহার অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। কেহ কিছু খাইতে দেয় এরূপ সকলের নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রস্তুত অন্ন আনিয়া দিব দুই একজন এরূপ বলিল। কাহারও প্রস্তুত অন্ন তিনি গ্রহণ করেন না জানাইলেন ও এজন্য প্রার্থনা করিলেন যে কেহ যদি দয়া করিয়া তাঁহার লোটাতে কিছু চাউল ডাউল ও জল দিয়া একটা ইটের চুলায় বসাইয়া দেয় তবে তিনি শুইয়া শুইয়া উহা নামাইয়া লইতে পারিবেন।

দুই একজন দয়া করিয়া তাহাই করিল, ও তিনি শুইয়া শুইয়া খিচুড়ী অন্ন নামাইয়া লইয়া ভক্ষণ করিলেন। ইহাকেই বলে, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" আর এজন্যই এ প্রবন্ধ করেকটি আরম্ভ করিয়াছি এই বলিয়া যে, "পরমাত্মা দেবই সাধুদিগের রক্ষক।" নতুবা এরূপ ভয়ানক কলেরার পর ঠাণ্ডাজলে স্নান ও পরে খিচুড়ী ভক্ষণ ইহা শুনিলেই বিজ্ঞানবাদী ডাক্তারেরা চমকাইয়া উঠিবেন।

এরূপ করিবার পর তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন ও তখন কুমারী মাতার আদেশ "শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ কর" মনে আসিল; কিন্তু চলিবার শক্তি নাই। এদিকে জগদম্বার আদেশ, এ অবস্থায় মায়ের আদেশ রক্ষা করাই উচিত মনে করিলেন ও স্থান ত্যাগে উদ্যোগী হইলেন। একটু উঠিয়া দাঁড়ান, পুনরায় বসিয়া পড়েন, এরূপ ভাবে প্রথম দিন ১০।১২ কদম মাত্র চলিয়া সেদিন আদেশ রক্ষা করিলেন। ক্রমে ক্ষীণভাবে গমন ও অবস্থান করিতে করিতে ক্রমশঃ সুস্থতা আসিতে লাগিল। প্রায় ২০।২৫ দিনের পর কুড়িগ্রামে আসিলেন। যে মাড়োয়ারীর নিকট ঔষধের পেটী রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার নিকট যাইলেন। কিন্তু এই কলেরা রোগের দ্বারা তাঁহার চেহারা এরূপ শীর্ণ ও বিকৃত হইয়াছিল যে, সে ব্যক্তি তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারে নাই। পরে পরিচয় পাইয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহার সেবা ও যত্ন করিতে লাগিল ও যতদিন সম্পূর্ণ সুস্থ না হন ততদিন সেখানে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার পর সুস্থ হইয়া পুনরায় পর্য্যটনে বাহির হইলেন।

পাঠকগণ। এ গল্প পড়িয়া অবশ্যই বুঝিলেন যে, মহারাজার এ পর্য্যটন কালে তিতিক্ষা ও ব্রহ্মচারীর নিয়ম পালন কিরূপ দৃঢ় ছিল। এরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়াও অন্যের প্রস্তুত অন্ন তিনি গ্রহণ করেন নাই, এবং ইহাও স্নানান্তে শুচি হইবার পর। মহারাজ শুনাইয়াছেন ও আমরা পরে শুনাইব যে, "ভজন ও ভোজন" সর্ব্বদাই পরিশুদ্ধ রাখিতে হইবে।

চিরদুঃখী।

চিরদুঃখী করেছ মাগো, তাই বলে কি কাঁদি শ্যামা!
সহনের শক্তি কেন দিলে না মা হররমা!
চাহি না মা ধনরাজ্য
চাহি না মা পদমানজ্য
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাও দেবি! এই প্রার্থনা শিরমা!
বিপদে পতিত হ'লে
"মা" "মা" বলেই ডাকে ছেলে,
তুমি মা নিদয়া হ'লে আর কোথায় দাঁড়াব শ্যামা?

সত্যকাম জাবাল।

(উপনিষদ্)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্বকালে সরস্বতী নদীর তীরে মহর্ষি গৌতমের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে মহর্ষি অনেকগুলি মুনিবালককে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তৎকালে আর্য্য-সন্তান ব্যতীত অন্য কেহ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযুক্ত পাত্র বিবেচিত হইত না।

একদা সন্ধ্যাসমাগম শান্তকালে মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে জনৈক প্রিয়দর্শন বালক উপস্থিত হইয়া কহিল, "ভগবন্! আমায় শিষ্য মধ্যে স্থান দান করুন। আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। আমার নাম সত্যকাম, নিবাস কুশক্ষেত্র।"

মহর্ষি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। তোমার কোন্ গোত্রে জন্ম জানিতে পারিলে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও এ বিদ্যায় অধিকার নাই।"

বালক কহিল, "আমি কোন্ গোত্রজাত তাহা জানি না, জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া বলিব।" মুনি কহিলেন, "বেশ, আইস।" বালক ঘনান্ধকারে বনপথে চলিয়া গেল। গৃহে গিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমার পিতার নাম কি? কোন্ বংশে আমার জন্ম?

অবনত মুখে মাতা কহিলেন—"যৌবনে দারিদ্র্য-দুঃখে বহু-পরিচর্য্যা করিয়া তোমাকে কোলে পেয়েছি। তোমার মা ভর্ত্তৃহীনা। তুমি কোন্ গোত্রোদ্ভব তাহা ত জানি না বাবা!"

পরদিবস প্রাতে সত্যকাম গৌতমাশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আশ্রমবাসী মুনিকুমারগণ স্নানান্তে স্নিগ্ধ সমীরণে তরুতলে বেদপাঠ করিতেছেন, কেহ চন্দন ঘষিতেছেন, কেহ হোমানলে আহুতি দান সমাপন করিয়া তিলক করিতেছেন, কেহ বা সূর্য্যার্ঘ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় সত্যকাম আসিয়া কুশাসনে উপবিষ্ট মহর্ষি গৌতমের চরণে প্রণত হইলেন।

মহর্ষি দক্ষিণকর উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস! কি গোত্র তোমার?" সত্যকাম কহিল, "ভগবন্! আমার মাতা বলিলেন, "বৎস! বহু-পরিচর্য্যা করিয়া তোমাকে কোলে পেয়েছি। তোমার গোত্র জানি না।"

এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ মৃদু-গুঞ্জনে কেহ বা উপহাস করিল, কেহ বা হাসিল, কেহ বা মৃদু তিরস্কারে সত্যকামকে আশ্রমের বাহিরে তাড়াইয়া দিল। কেহ বা কহিল, "অনার্য্যের অহঙ্কার দেখ। ব্রহ্মবিদ্যা শিখ্‌তে এসেছেন!"

মহর্ষি গৌতম এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বালকের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। বালকের সরল ও সত্য বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস ও বিস্ময় জন্মিল। তিনি আসন হইতে উঠিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সত্যকামকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং মিষ্ট-কণ্ঠে কহিলেন,—"সত্যকাম! তুমি অব্রাহ্মণ নও। তুমি দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার অন্য কোনও গোত্রে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি সত্যবংশ—জাত। তোমার পিতা সত্য, মাতা জবালা সত্য-প্রিয়া, তুমি "সত্যকাম জাবাল।"

শ্রেষ্ঠ কে?

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

একদিন বৈকুণ্ঠে নারায়ণ সমীপে বিশ্বামিত্র নিবেদন করিলেন, "বশিষ্ঠদেব ও আমার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা আপনি কৃপা করিয়া বলুন।" নারায়ণ বলিলেন "এ সম্বন্ধে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ কে, তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত তিনজন আছেন, আপনি তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া মন্তব্য নিবেদন করুন। সেই তিনজন হইতেছেন সূর্য্য, বাসুকি ও কপিল মুনি।"

বিশ্বামিত্র নারায়ণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সূর্য্যসন্নিধানে গমন করিয়া বক্তব্য জ্ঞাপন করিবামাত্র সূর্য্যদেব বলিলেন, "আমি এ সম্বন্ধে নির্ণয় করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যদি আমার কার্য্যের ভার লইতে পারেন এরূপ কোন লোক অল্প সময়ের জন্য পাই তাহা হইলে আমি অচিরাৎ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছি।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনার কার্য্যের ভার লইবার উপযুক্ত কাহাকেও দেখিতেছি না, আপনি ভিন্ন আপনার কার্য্যভার বহন করে এমন আর কে আছে?" এই বলিয়া তথা হইতে বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিয়া বাসুকির নিকট গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ নিবেদন করিলে বাসুকি বলিলেন, "আপনার প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি মস্তকে করিয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছি, ক্ষণমাত্র নড়িবার অবকাশ নাই। যদি কেহ অতি অল্প সময়ের জন্য আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে

আপনার প্রস্তাবিত বিষয় মীমাংসা করিবার চেষ্টা করি।" বিশ্বামিত্র বাসুকির নিকট বিদায় গ্রহণ কালীন অতীব দুঃখের সহিত বলিলেন, "আপনার সদৃশ দ্বিতীয় আর কেহ নাই যে আপনার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সুতরাং আমার প্রস্তাবিত বিষয় মীমাংসা হওয়া সুদূরপরাহত।" সর্ব্বশেষে বিশ্বামিত্র কপিল মুনির নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, "বশিষ্ঠদেব ও আমার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা আপনাকে নির্ণয় করিয়া দিতে হইবে। আমি নারায়ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপনাকে এই কথা জানাইবার জন্য আসিয়াছি।" কপিল মুনি প্রসন্নচিত্তে নারায়ণের আদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, আমি যে কার্য্যে ব্রতী আছি তাহা অতীব কঠিন ও গুরুতর, আমার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আপনি এমন কি গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন যে, আপনার তিলমাত্র অবকাশ নাই। যদি আমি শুনিবার যোগ্য হই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।" কপিল মুনি বলিলেন, যে কুমারী' স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা প্রত্যেকে এক একটী ঢিল লইয়া খেলা করিতেছেন, তাঁহাদের ঢিল যাহাতে কোথাও হাত হইতে চলিয়া না যায়, তাহার অতি যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ ও লক্ষ্য করিতেছি। যদি অতর্কিত ভাবে কোন ঢিল হস্তচ্যুত হয় তাহা হইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অচিরাৎ ধ্বংস হইবে। এরূপ অবস্থায় আমার কার্য্য কিরূপ কঠিন ও কিরূপ অবকাশাভাব তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন। যদি আমার কার্য্য করিতে পারেন এরূপ প্রতিনিধি পাই তাহা হইলে আপনার প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখি। হতাশ হইয়া বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এরূপ অবস্থায় আপনি কি প্রকারে আমাদের উভয়ের শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিবেন ?"

কপিল মুনির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠে নারায়ণ সকাশে বিশ্বামিত্র উপনীত হইয়া আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। নারায়ণ একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই সকল কথা কি আপনি বশিষ্ঠ দেবের নিকট বলিয়াছেন ?" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "আমি তাঁহার নিকট যাই নাই বা কোন কথা বলি নাই।" নারায়ণ বলিলেন, "একবার তাঁহার নিকট গমন করুন ও সকল কথা বলুন। তাহাতে তিনি কি বলেন, শুনিলে যাহা হয় প্রতিকার করিব।" এই কথা শুনিবামাত্র দ্রুতপদসঞ্চারে বশিষ্ঠদেবের নিকট বিশ্বামিত্র উপনীত হইয়া সমস্ত কথা বলিলেন। ইহাতে বশিষ্ঠদেব বলিলেন, "উত্তম কথা, আমি সকলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া অবসর দিবার ব্যবস্থা করিব। তাঁহারা অবশ্যই অবকাশ পাইবেন স্থির চিত্তে ধীর মনে বিষয়টী বিবেচনা ও বিচার পূর্ব্বক মীমাংসা করিতে পারিবেন।

হইবেন।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ দণ্ড কমণ্ডলু ও ঝোলা লইয়া বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রের সহিত সূর্য্যদেবসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কার্য্যভার গ্রহণের জন্য আমার এই ঝোলা নিযুক্ত রহিল, ইহা যথারীতি আপনার ন্যায় আলোক ও কিরণ বিতরণ করিবে, যতক্ষণ আপনি পুনরায় নিজ কার্য্যে ফিরিয়া না আসেন।"

বাসুকির নিকট বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠদেব গমন করিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনার কার্য্যভার গুরুতর, কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনাকে অবসর দেওয়া যাইতেছে, সেই সময়ের মধ্যে এই দণ্ড আপনার কার্য্যভার গ্রহণ করিবে।" এই বলিবামাত্র দণ্ডকে বাসুকি স্থানে নিয়োগ করিলেন। বিশ্বামিত্র দেখিয়া স্তব্ধ, বিস্মিত, বাক্য-নিঃসরণ হইতেছে না। মন্ত্রমুগ্ধকর ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল না বাস্তব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, একদৃষ্টে বশিষ্ঠ দেবের দিকে চাহিয়া আছেন। তারপর বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রকে সঙ্গে লইয়া কপিল মুনির নিকট গমন করিলেন।

কপিলাশ্রমে বশিষ্ঠদেব ও বিশ্বামিত্র উপনীত হইবামাত্র যথাযোগ্য অভ্যর্থিত হইলেন। বশিষ্ঠদেব কপিল মুনিকে বলিলেন, "আপনার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কেহ না থাকায় আমি কুমারীদের হস্তস্থিত ঢিল যাহাতে হস্তচ্যুত হইয়া অনর্থ ও প্রলয় উপস্থিত না করে, তজ্জন্য আমার এই কমণ্ডলুর জল সকলের উপর প্রক্ষেপ করিয়া দিলাম। এখন আপনি নিশ্চিন্ত মনে প্রস্তাবিত বিষয় মীমাংসা করুন।" বিশ্বামিত্র তখন কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আর মীমাংসা করিতে হইবে না, সমুদয় অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সু-মীমাংসিত হইয়াছে। আমার দম্ভ, দর্প, অভিমান, সাধন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব—সকলই নিমেষের মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ সুচূর্ণ হইয়াছে। আমি তমোভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া এরূপ ঘোর আত্ম-বিধ্বংসকারী কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম, আজ দিব্য-চক্ষু উন্মীলিত হইল। ধন্য ব্রহ্মন্! আপনি ধন্য; আপনি অতি শ্রেষ্ঠ, আমি অতি নিকৃষ্ট।"

বশিষ্ঠদেব বলিলেন, "মহাত্মন্! কেন অনর্থক আত্মনির্ব্বেদকর বাক্য প্রয়োগ করিয়া মনে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন, ইহাতে আপনার বিন্দুমাত্র দোষ নাই। ইহা সকলি মহামায়ার মায়ার প্রভাব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। চলুন আমরা নারায়ণ দর্শন করিয়া মনের সকল জ্বালা যন্ত্রণা অশান্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।" এই বলিয়া উভয়ে নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ মহানন্দে উভয়ের সম্মিলন দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন, এবং বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

নারায়ণ বলিলেন, সকলেই শ্রেষ্ঠ, আবার সকলেই নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব কাহারও এক চেটিয়া সামগ্রী নহে, যাহার যখন যেরূপ অভিনয় করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে তখন তাহাকে সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়; এইমাত্র প্রভেদ। তোমরা অন্য কেহ নও, তোমরাও আমারি অংশসম্ভূত, সুতরাং আমি। ইহা বুঝিবার তারতম্য মাত্র, আর কিছু নহে।"

সুন্দরীর উপকথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

তরুণ ভাস্কর নিকোলাস ভেনের মত সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণের নিপুণতা বড় একটা কাহারও দেখা যাইত না। এমনি ছিল তাহার অলৌকিক প্রতিভা। মৃত্যুর গতি অনির্ণেয়, তাই কয়েকটি লোক বিস্মৃতির গর্ভ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহার নিকটে আসিয়া সমাধি-স্তম্ভের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইত, পাছে আত্মীয়-স্বজন ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করে। তাহা ছাড়া নিকোলাস-নির্ম্মিত মর্ম্মর-স্তম্ভের নিম্নে নিদ্রা গেলে তাহারা নাকি আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিত। নিকোলাসের এমনই কেরামত—এমনই সৃষ্টি-কৌশল।

আপনার গৃহ-কুট্টিমে আবদ্ধ রহিয়া নিকোলাস মর্ম্মর-স্বপ্নে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। নগরের কোলাহল সুদূর সাগর-গর্জ্জনের মত কাণের কাছে আসিতে আসিতে দীর্ঘপথে বিলীন হইতেছিল। রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া একজন অপরিচিত কৃশাঙ্গ ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিক নিমেষপাতে দেখিয়া লইয়া বলিল,—"মহাশয়, আপনি একাকী এখানে?"

নিকোলাস ঝঙ্কৃতস্বরে কহিল,—"না, না, কে বলিল, একাকী? যে জীবন মৃত্যুর দুয়ারে দিয়া নিযুত নর নিত্য যাতায়াত করিতেছে, তাহার অতি সন্নিকটেই আমার বাস।"

আগন্তুক তাহার কৃশ করযুগ একত্র করিয়া বলিল,—"অত উচ্চকণ্ঠ হইবেন না, আমি মিনতিকরি আমি যে এখানে উপস্থিত আছি, জগৎ যেন না জানিতে পারে।"

"বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আপনি কি এতই মহাশোক?" নিকোলাস হাসিয়া ফেলিল,

কারণ আগন্তুকের দেহে ঐহিকের কোন চিহ্নই বর্ত্তমান ছিল না। পরতালি-বিশিষ্ট কৃষ্ণবেশ হইতে জীর্ণ দেহ যেন লজ্জাবতী লতার মত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। ধূলায় ধূসরিত পাদুকাদ্বয় হইতে পদাঙ্গুলি সকল মধ্যে মধ্যে উঁকি দিতেছিল। আর দীর্ঘ কেশরাশি মস্তকোপরি যেন জটাজাল বিন্যস্ত করিয়া বসিয়াছিল।

আর্ত্তস্বরে চাপা গলায় সে বলিয়া ফেলিল,—"আমি কবি।" তাহার দৃষ্টি স্বতঃই নত হইয়া পড়িল, পাছে কোন অদরদী শ্রোতা সমালোচনায় তৎপর হয়। "আমি কবি, আমি আপনার সহিত স্মৃতি স্তম্ভের—আমার সমাধি-স্তম্ভের—বিষয় গোপনে কহিতে আসিয়াছি। আমার ভয় হয় পাছে লোকে আমায় ভুলিয়া যায়। এ বিস্মৃতির চিন্তা যে ভয়ঙ্করী।"

নিকোলাস শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার কবিতা আপনাকে অমর করিবে এ বিশ্বাসটুকু আপনার নাই কি?"

"সে বিশ্বাসটুকু থাকিত বটে, যদি লোকে আমার লেখা বেশী করিয়া পড়িত। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আধুনিক যুগ আমায় চিনিল না। তথাপি তাহাতে আমার দুঃখ, ক্লেশ নাই, কারণ আমি লিখিয়াছি ভবিষ্যৎ যুগের জন্য,—আমার মনে হয়, ভবিষ্যতের উপরেই আমার প্রতিপত্তি নির্ভর করিতেছে।"

"তবে সমাধি-স্তম্ভের জন্যও ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া থাকুন না কেন?"

"হায় মহাশয়!" সে চীৎকার করিল। "জগতে এত কবি আছে যে উত্তর-কালে হয়ত আমি সম্যক্ উপেক্ষিত হইব, যদি এ যুগে আমার সম্মানের কোনও চিহ্ন না থাকে।"

"তা আপনাকে ভুলিলেই বা ক্ষতি কি? সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্যে জীবিত থাকাই কি কবির পক্ষে যথেষ্ট নহে?"

"না," সে শশব্যস্তে বলিল,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা একটা প্রকাণ্ড ভুল, কারণ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই কবির কাজ। কিন্তু সে সৃষ্টি করিল কিনা, কিরূপে জানা যাইবে? তাহার নিজের মন দিয়া? হায়, কবির মন তাহাকে শুধু সৌন্দর্য্যেরই সন্ধান দেয়। যশোলাভ—তাহার প্রকটিত সৌন্দর্য্যের উপর মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেই সে তাহা জানিতে পারে।"

এই বলিয়া সে আপনার লম্বা ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে একখানি জীর্ণ মলিন Duodecimo volume বাহির করিয়া নিকোলাসের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। "ইহাই আমার কবিতাবলির

সম্পূর্ণ সঙ্কলন।"

নিকোলাস সহানুভূতি সূচক স্বরে জানাইল—"সত্য!"

"হাঁ, আমার সমস্ত সঞ্চয় এই। আমি আরো বেশী লিখিয়াছি, এবং যাহা লিখিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতেও ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু সঙ্কলনের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাই যেগুলি অপচয় করিলে প্রাণে ব্যথা বাজে সেইগুলি শুধু ইহাতে একত্রিত করিয়াছি। ইহার মধ্যে কয়েকটী বিলাপগাথা উৎকৃষ্ট, সেগুলি আমার বৃহৎ পরিবারবর্গ ও আমার সকল সুহৃদবর্গ বন্ধুবান্ধবই অতি সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ইহা হইতে একটি অংশ আমার সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ করিলে মন্দ হইবে না, কারণ যাহারা ঐ অংশটুকু পড়িবে তাহারা সম্পূর্ণ কবিতাটীই পাঠ করিতে আগ্রহী হইবে। আবার যাহারা সম্পূর্ণ কবিতাটী পাঠ করিবে তাহারা সম্পূর্ণ সঙ্কলনই পড়িতে চাহিবে। এখন এই সকল বিলাপগাথা আমি আপনাকে শুনাইব।"

নিকোলাস শান্তস্বরে কহিল, "আমি শুনিয়া সুখী হইব; কিন্তু আমার অবকাশ কই? জীবিতেরা আর আমার উপর প্রতীক্ষা করিতে পারিতেছে না। মৃতেরা এত সহিষ্ণু হইয়াছে যে তাহাদের প্রবঞ্চনার ভয় নাই।"

কবি তাহার দীপ্ত-চক্ষু তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"আপনি অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে একটি শুনিতে আপত্তি করিবেন না।"

নিকোলাস একটি উপলখণ্ডে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তবে পড়ুন একটি।"

কবি এক হস্তে তাহার কপালদেশ মুছিয়া নিকোলাসের উপর তাহার সীমাহারা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পড়িতে লাগিল।

"সে ঝঞ্ঝার বুকে বুক পাতি দিয়া
নীরবে সহেছে দুঃখ;
সে শুধু চেয়েছে সু-উচ্চ নিয়তি
কবি-সাধে উৎসুক।"

নিকোলাস বাধা দিয়া বলিল. "যদি আপনি সাধারণ ভাগ্য না চাহেন, তবে আপনি বিস্মৃতি লাভেই তৃপ্ত থাকুন।"

কবি কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তাহার "সম্পূর্ণ সঙ্কলন" বন্ধ করিয়া পকেটে পুরিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। দীপ্ত চাহনীতে ও দীপ্ত স্বরে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সে বলিল, "আমাকে এখনি কোন গুপ্তদ্বার দিয়া বাহির হইতে দিন্।"

নিকোলাস তাহার মর্ম্মরগৃহের পশ্চাদ্দার দেখাইয়া দিয়া, হাসি-অশ্রু লইয়া কমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। কবি তখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেছে।

দ্বিতীয় আগন্তুক উল্লেখযোগ্য। তাহার একটি পদ পূর্ব্ববৎ দৃঢ়ক্ষম থাকিলেও পরটী কৃত্রিম। স্থূল বপুতে মলিন রণকুর্ত্তি, মুখমণ্ডলে অস্ত্রলেখা।

তাহার স্বভাবকর্কশস্বরে সে বলিল,—"আমি আপনার সহিত আমার স্মৃতি-স্তম্ভ সম্বন্ধে কহিতে আসিয়াছি। আমার বন্ধুবান্ধবেরা কেহ রণক্ষেত্রে ও কেহ বয়তিক্রমে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার স্ত্রী-পুত্রেরাও বহুপূর্ব্বে চলিয়া গেছে। আমি বৃদ্ধ ও বিস্মৃত। এখন শান্তির সময়। এখন আমার রণকৌশল শুনিবার মত একটি বালকও নাই। আমি একাকী। আমি যদি কালই মরিয়া যাই, আমার সমাধি হয়ত সমাধিস্তম্ভও পাইবে না। লোকে হয়ত কাপুরুষ বলিয়া জানিবে। প্রকৃত সৈনিকের উপযুক্ত একটি সমাধিস্তম্ভ আমার করিয়া দিউন।"

নিকোলাস বলিল,—"তোমার কৃতজ্ঞ দেশ তাহা করিয়া দিবে।"

"হাঁ?" বৃদ্ধ যোদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল। যুদ্ধের শব্দাঘাত তাহাকে বহুপূর্ব্বেই বধির করিয়াছে।

নিকোলাস তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "তোমার দেশ—তোমার দেশ তোমার স্মৃতিকল্পে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবে।"

"আমার দেশ!"—কথা কয়টী শোকগম্ভীর হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল—"আমার দেশ এরূপ কিছুই করিবে না। কত লক্ষ সৈন্য তাহার রণ-ভূমিতে পতিত হইয়াছে! তাহাদের স্মৃতিস্তম্ভ কোথায়?"

"কিন্তু তোমার পক্ষে তুমি যে প্রকৃত সৈনিক ইহাই কি যথেষ্ট নয়? ইহার জন্য তুমি পরিচিত ও অবিস্মৃত হইতে চাহিতেছ কেন?

সে সরলভাবে উত্তর দিল,—"আমি জানি আমি বিস্মৃত হইতে ইচ্ছা করি না। আমি জানি আমার একটী চিন্তায় আনন্দ আছে যে, আমি বিস্মৃত হইবার বহুপরে আমার সমাধিস্তম্ভের মুখ দিয়া স্থানীয় প্রত্যেক পথিকের কর্ণে ধ্বনিত হইবে, এখানে একজন প্রকৃত সৈনিকের দেহ আছে। সাহসী হওয়া একটা উচ্চ জিনিষ।"

"তবে তোমার স্মৃতিস্তম্ভ তোমার বীরত্বের সম্মানে অথবা তোমার নিজের সম্মানে নির্ম্মিত হইবে?"

"প্রভেদ কিছুই নাই। বীরত্ব-ই আমি।" সে দ্রুতস্বরে বলিল।

"কিন্তু তুমি বলিলে দেশ তোমার প্রতি দৃক্‌পাত করে নাই—তোমার কোন

বন্ধুবান্ধব নাই ; কোন আক্রোশ বোধ হয় না ?”

“না, না,”—কথা দুইটী দ্রুত উচ্চারণ করিয়া,তাহার অংসকূট অবনত করিল।

“আর তুমি—যে জগৎ তোমায় ভুলিতে চাহিতেছে তাহা কর্ত্তৃক স্মৃত হইবে?”

সে অবশেষে তাহার শির উঠাইল। বলিল—“জগতে বহু প্রকৃত লোক আছেন, জগৎকে তাঁহাদের কথা ভাবিতে হইবে। আমার যথাসর্ব্বস্ব যাহা আমি জগৎকে দিতে পারি, তাহাই আমি তাহার কাছে ঋণী ; প্রকৃত ব্যক্তির স্মৃতি ছাড়া আর আমি তাহাকে কি দিতে পারি ?”

* * *

কিছুদিন পরে নিকোলাসের শিল্পাগারে একজন সম্মানার্হ ব্যক্তি আসিলেন। তাঁহার আকৃতিপ্রকৃতিতে গাম্ভীর্য্য-মাধুর্য্য-প্রাবীণ্যের অপরূপ সমাবেশ। তিনি নিকোলাসকে সম্মুখের বাতায়ন-পার্শ্বে লইয়া গিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বলিলেন,—“ঐ চূড়া দেখিতেছ ? যেন মেঘ ছুঁইয়া রহিয়াছে ! উহারই নিম্নে গির্জ্জাঘরে আমি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ কত নর-নারীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছি। কত জনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া বিবাহবন্ধে আবদ্ধ করিয়াছি। আর তাহাদের দুঃখে অভাবে আমি কি না করিয়াছি ; তাহাদের আরো পবিত্র আনন্দের পথে লইয়া যাইতে ও তাহাদের ঝটিকাক্ষুব্ধ আশাপোত নিরাপদে নঙ্গর করিতে আমি কত না পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি। আর সেই তারা আমাকে কত শীঘ্র ভুলিতে বসিয়াছে ! এখনই কতজন বলিয়া দিয়াছে যে আমি অতিবৃদ্ধ হইয়াছি। অতি বৃদ্ধ ! জীবনে এরূপ ধর্ম্মপ্রচার আর আমি কখনও করি নাই। আমার অদৃষ্ট। আমি এই মাত্র আমার শেষ Sermon লিখিয়া আসিতেছি ; তাহাতে আমি আমার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছি যে, তাহাদের নাম জীবন-গ্রন্থেই (Book of life) লিপিবদ্ধ হইবে, পার্থিব স্মৃতিস্তম্ভে অথবা মানব অন্তরে নহে। ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ বিষয়। যদি কখনো আমি বাগ্মী হই, যদি কখনো আমি প্ররোচক হই, যদি আমি কখনো মুহূর্ত্তের নিমিত্তও অন্তশ্চক্ষু হইতে অনন্তের শান্তিময় আনন্দপূর্ণ ছায়াপথের আবরণী পর্দ্দা সরাইয়া দিই, তখনই আমার সীমাবদ্ধ শক্তি এই বিরাট কর্ম্মের কাছে কতটুকু তাহা উপলব্ধি করি। কিন্তু কেন ? কারণ ইহারাই আমার আত্মোন্নতির প্রচারবাণী। আমি আমার নিজেরই আত্মার নিকট ইহাদের প্রচার করি। সেই নগ্ন আত্মার সহিত মুখোমুখি হইয়া এই সকল ধর্ম্মবাণী আমি প্রণয়ন করি—প্রণয়ন করি যখন সকলেই নিদ্রিত, কেবল সেই নিদ্রাহীন চক্ষু আমার উপর চাহিয়া আছে ; এমন কি সেই চক্ষুর দীপ্তিতেই

আমি বিস্মৃত হওয়ার চিন্তা হইতে বিরত থাকি।”

“আপনার পক্ষে আপনার একমুষ্টি উত্তম উপদেশের বীজ ছড়াইয়া দেওয়াই কি যথেষ্ট নয় ? ঘাসের মত তাহা অশেষরূপে পরিপক্ক হইলে, যাহারা তাহা কুড়াইবে তাহারা নাই বা জানিল কে তাহা বপন করিয়াছে ?”

“তাহাই যথেষ্ট নহে। আমি চাই আমার সৎকর্ম্মের সহিত আমার স্মৃতিও জগতে চিরকাল জাগরূক থাকুক। অন্তরের ভালটুকু লইয়াই আমি ও আমার অস্তিত্ব। এই সূত্রেই আমি অনন্ত ও পূর্ণের নিকট আবদ্ধ আছি। সেই পূর্ণপুরুষ তাঁহার নামের সঙ্গে তাঁহার সৎ-কে বিজড়িত দেখিতে ইচ্ছা করেন না কি ? না,—না, আমি বিস্মৃত হইতে ইচ্ছা করি না !”

“এ বাঞ্ছা অনর্থক মাত্র।”

“অনর্থক বাঞ্ছা নহে,”—বৃদ্ধ সেবক বিনীতভাবে বলিলেন,—“যে অবধি না তুমি বৃদ্ধ হও, যে অবধি না তোমার অসহায় পদে সমাধি আসিয়া পৌঁছে, সে-অবধি অপেক্ষা কর ; বুঝিবে জীবন-প্রেম (love of life) কি।”

দুই।

দোকানে কেহ আসিবার সময় প্রায় উৎরাইয়া গেছে। সন্ধ্যার ম্লানমাধুরী ক্লান্ত সূর্য্যালোকে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। মর্ত্তমানবের মর্ম্মরমূর্ত্তিসমূহের উপর অর্দ্ধালোকছায়া পড়িয়া ক্রমশঃই বিরাট বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। নিকোলাসের হস্ত হইতে যন্ত্রপাতি কখন ভূতলে পতিত হইয়া ক্ষুদ্র ঘরখানিকে নিস্তব্ধ করিয়াছে। তাহার শিথিল মস্তক প্রস্তরোপরি বিন্যস্ত হইয়া জগতের কলকোলাহল হইতে স্বপ্নলোকে শান্তিলাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এই-স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য ভঙ্গ করিয়া কে যেন শান্ত, স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে কহিল,—“আপনি কি সমাধিস্তম্ভের নির্ম্মাতা ?”

চমকিয়া উঠিয়া,সে রুক্ষস্বরে বলিল,—“ইহাই আমার বিষাদবিমর্ষ ব্যবসায়।” তাহার অতিসম্মুখে অবগুণ্ঠিতা এক নারীমূর্ত্তি, এক হস্তে যেন বক্ষের ব্যথা চাপিয়া অপর হস্তে শিলাগাত্র স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

“কাহার স্মৃতিস্তম্ভ ইহা ?”

“কোন সদ্যোমৃত উপেক্ষিত কবির। শীঘ্রই, বোধহয়, আমাকে একজন বৃদ্ধ সৈনিকের ও একজন মুমূর্ষু সাধুপুরুষের স্মৃতিশিল্প গঠন করিতে হইবে।”

“কয়েকটী সমাধিস্তম্ভ অপরগুলি অপেক্ষা বেশী বিষাদজনক নহে কি ?”

“হাঁ, নিশ্চয়ই।”

"সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদকর স্তম্ভ তুমি কি করিয়াছ ?"

"সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদকর স্তম্ভ আমি করিয়াছিলাম একজন পুত্রহারা জননীর।"

"কিন্তু তথাপি একটি স্মৃতিস্তম্ভ হইতে পারে সম্পূর্ণ বিষাদজনক, পারে না কি ?"

"হইতে পারে, কিন্তু আমি জানিনা তাহা কাহার হইবে।"

"তাহারই কি হইবে না, যাহাকে তুমি ভালবাস সে যদি মরিয়া যায় ?"

"যে অবধি না আমি ভালবাসি, এবং যে অবধি না আমার প্রণয়িনীর মৃত্যু হয়, সে অবধি আমি বলিতে পারি না,"—বলিয়া নিকোলাস হাসিয়া ফেলিল।

"অধিকাংশ সমাধিস্তম্ভের উৎপত্তি কোথা হইতে ?" তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিয়া সে যেন আপনার চঞ্চলতাকে ঢাকা দিল।

"অনেকের উৎপত্তি গর্ব্ব হইতে। কতকগুলির কৃতজ্ঞতা হইতে, আর কতকগুলির ক্ষমা ও দাক্ষিণ্য হইতে। কিন্তু বিশ্বাস হইতে আরও বেশী উৎপত্তি, আর ভালবাসা! ভালবাসা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপত্তি।"

"কিন্তু, যে সমস্তের স্মৃতিকল্পে সমাধিস্তম্ভ গঠিত হয়, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী প্রিয়তম ও সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র বিস্মরণশীল ?" সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

"তাহা আমি বলিতে পারি না।"

"রূপসী রমণী নহে কি ? তুমি বলিলে এ স্মৃতিস্তম্ভ একজন কবির। কবি বৃদ্ধ হইলে, লোকে তাহার সঙ্গীতের জন্য তাহকে ভালবাসে ; লোকে বৃদ্ধ সৈনিককে ভালবাসে তাহার সংগ্রামের জন্য, আর প্রচারককে ভালবাসে তাহার স্তুত প্রার্থনাবলির জন্য ! কিন্তু রমণী ! তাহার গত সৌন্দর্য্যকে কে কবে ভালবাসে, অথবা, কেনা তাহাকে আরও বেশী করিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখে ? অথবা, যদি কোন স্ত্রীলোক তাহার সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, লোকে তাহাকে কত দিন মনে করিয়া রাখে ? তাহার সৌন্দর্য্য তড়িৎপ্রভাবৎ মাত্র তাহাদেরই নিকট প্রবল যাহারা তাহা অনুভব ও দর্শন করে।"

কিন্তু নিকোলাসের কর্ণে এত কথা পৌঁছিতে পারে নাই। তাহার চক্ষুযুগল স্ত্রীলোকটীর হস্তের উপর বিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এ শুভ্রগৌর হস্ত যেন মর্ম্মর হইতে তাহারই একান্ত যত্নে ক্ষোদিত হইয়াছে বলিয়া মনে ভ্রম জাগিতেছিল।

অতি গভীর সম্ভ্রমে সে জানাইল,—"দেবি ! আপনার হস্ত পানে তাকাইতে আমাকে অনুমতি করিবেন ? কত হস্ত আমি মর্ম্মরগাত্রে ক্ষোদিত করিয়াছি, জীবনে কত হস্ত অধ্যয়ন করিয়াছি, কিন্তু আপনার ন্যায় এত সুন্দর হস্ত

আমি কখনও নয়নগোচর করি নাই। ভগবান্ মাত্র এ হস্ত এত সুন্দর করিতে পারেন।"

সহসা দমকা বাতাস বহিয়া গেল। স্ত্রীলোকটীর মস্তক হইতে উত্তরীয় আবরণ দেহে খসিয়া পড়িল। দৃষ্টি তাহার ভাস্করের চক্ষু'পরি সন্নদ্ধঃ যেন রহস্যের ইন্দ্রজাল সরাইয়া দিয়া কোন পরী-রাজ্যের অপ্সরা সম্মুখে স্তম্ভিত উচ্চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেছেন। এ চাহনিতে নিকোলাসের হৃদয় এক সান্ত্বনাহীন গতি ও আকাঙ্ক্ষার আচম্বিত অনুভূতিতে নিপীড়িত হইয়া পড়িল।

"হায়, দেবি!"—সে নতজানু হইয়া চীৎকার করিল,—"কে বলিল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য অচিরেই বিস্মৃতিগর্ভে সমাধিস্থ হয় ? যতদিন আমার জীবন থাকিবে, এ সৌন্দর্য্য চিরকাল সমানভাবে আমার মানসপটে অঙ্কিত থাকিয়া যাইবে।"

"এইস্থান ও তোমাকে দর্শন করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। শীঘ্রই হয়ত এমন কেহ আসিবে যে ঐ দরিদ্র মাতার মত—"

নিকোলাস সম্পূর্ণ বিভোর হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল,—"আমার শক্তি অতি অল্প। ভগবান্ তাঁহার শিল্পজ্ঞানী বরপুত্র-গণের সে সেমুষী আমাকে দেন নাই। কিন্তু এই বিষাদবহ পবিত্র আদেশেই আমি আপনার স্মৃতিকল্পে এমনই সমাধিস্তম্ভ গঠন করিব যে, যতদিন ইহা বিরাজমান রহিবে সে দেখিবে সে আর ইহাকে কোনমতে ভুলিতে পারিবে না। বর্ষে বর্ষে আপনার স্মৃতি সুন্দরীর উপকথার মতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।"

আত্মহারা নিকোলাসকে সুচীভেদ্য তমিস্রা কখন তাহার বিরাট বক্ষে টানিয়া লইয়াছে। সুন্দরী অন্তর্হিত হইয়াছে। "আপনার স্মৃতি বর্ষে বর্ষে সুন্দরীর উপকথার মতই বৃদ্ধিলাভ করিবে" এই কয়টী কথা যেন ক্ষুদ্র ঘরখানিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তাহার অন্তরের কর্ণে অসীম উৎসাহ-শক্তি বর্ষণ করিয়া ফিরিতেছিল।

তিন।

অপরাহ্ণে কয়েকজন লোক সহরের সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে আসিয়া, একটী সদ্যপ্রোথিত স্মৃতিশিলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া গিয়াছিল।

তাহারা বলাবলি করিতেছিল, "না—না, এত সুন্দর কৃতিত্বকলা আমরা দেখি নাই। কাহার সম্মানে ইহা গঠিত ?"

আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহারা কেবল দেখিল শিলাগাত্রে একটী স্ত্রীলোকের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

তাহারা বিমূঢ় ও নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কে? তাহার কোন স্মৃতিলিপি নাই?"

"অবশ্যই,"—শাদ্বলশায়ী একজন যুবক আগ্রহভরে দর্শকদিগকে লক্ষ্য করিতে করিতে বলিল, "অবশ্যই, অতি যোগ্য স্মৃতিলিপিই আছে।"

"কোথায় তাহা?"

বিজয়োল্লসিতকণ্ঠে সে কহিল, "তিশিলার অন্তঃস্থলে রেখাঙ্কিত রহিয়াছে।"

"স্মৃতিশিলার অন্তঃস্থলে? তাহাহইলে আমাদের দেখা হইল না।"

"ইহা দেখিবার জন্য করা হয় নাই।"

"তুমি জানিলে কিরূপে?"

"আমি এই স্মৃতিশিলা প্রস্তুত করিয়াছি।

"তাহা হইলে ইহাতে কি আছে, শুনি।"

"ইহা বলিবার নহে। কারণ, ইহা অজ্ঞাত বলিয়াই সেখানে রহিয়াছে।"

"দূর হৌক! তুমি জীবিত ও মৃতকে লইয়া তোমার ছেলেখেলা খেলিতেছ।"

কোন ভাবপ্রবণ সমভিব্যাহারী বলিল, "জীবনে আজিকার জন্য তোমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে। তুমি মৃতব্যক্তির স্মৃতি বড় করিয়া ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিয়াছ।"

নিকোলাস কহিল, "কেন, জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির সহিত আমি তো ছেলেখেলা করিতেছি না। এই সমাধিক্ষেত্র দেখিয়া বুঝিবেন, জীবনে আমি কত স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছি। এইটীই আমার শেষ এবং যেহেতু ইহা শেষ, সেহেতু ইহা শ্রেষ্ঠ। কত দুঃখে ও ভালবাসায় আমি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছি তাহা আপনারা বুঝিবেন না। যদি ইহা সুন্দরই হয়, তথাপি ইহা তাহার ক্ষণস্থায়ী মোহময় সৌন্দর্য্যের একখানি অনুপযোগী নিদর্শন; তথাপি ইহা শ্বেতপুষ্পের মত তাহার স্মৃতিবাস বহন করিয়া যুগ-যুগ আমোদিত করিবে।" তাহার অধরৌষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর দুর্ব্বহ আশার ভারে ভগ্ন হইয়া গেল—তবু বলিতে লাগিল, "বলুন, বলুন আমাকে, আপনারা ইহা দেখিয়া ইহার সঙ্গে তাহার স্মৃতি চিরতরে বিজড়িত করিয়া লইয়াছেন কিনা? এই সুন্দর প্রতিকৃতি, ইহার স্বাভাবিক অপরিবর্ত্তনীয় পবিত্রতার সহিত আপনারা তাহার পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত করিয়া লইয়াছেন কি না?"

"নিশ্চয়,"—তাহারা অসহিষ্ণুতার সহিত বলিল,—"কিন্তু স্মৃতিলিপি কোথায়?"

"আঃ!"—সে কোমলস্বরে বলিল, "এই নয়নাভিরাম ললাম স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে যদি পবিত্র কিছু প্রচ্ছন্ন-ই না রহিল, তবে তাহার উপযুক্ত নিদর্শন যে হইল না। শুধু বহিঃসৌন্দর্য্যে নহে, তাহার হৃদয় অতি পূর্ণ ছিল। আমার অনুরোধ কেহ এ স্তম্ভ ভগ্ন করিয়া তাহার স্মৃতিলিপি জানিতে চাইও না। যে এরূপ করিবে তাহার উপর আমার ঘোর অভিষঙ্গ রহিল! কারণ, ইহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমি এত সন্তর্পণে সংযুক্ত করিয়াছি যে ইহার একটীকে স্থানচ্যুত করা মানেই ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা; আর ইহার স্মৃতিলিপি এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে খচিত হইয়াছে যে এই শিলাগাত্র উন্মোচন করা অর্থেই ইহাকে সম্পূর্ণ গুঁড়া করিয়া দেওয়া! সেই পরমকারুর আদর্শানুসারেই আমি ইহার সৃষ্টি করিয়াছি। কোন্ মানবচক্ষু সৃষ্টিসৌন্দর্য্যের অন্তর্রহস্যে উপনীত হইয়া অক্ষয় সজীবতা ও শাশ্বত শক্তির গুপ্তবিকাশ অনুভব করিয়াছে? যদি এই সমাধিলিপি বহির্ভাগে লিখিত হইত, তবে আপনারা ইহাকে পড়িবার অব্যবহিত পরেই স্বাভাবিক বিতৃষ্ণাহেতু ভুলিতে বসিতেন। কিন্তু অজ্ঞাত হইয়া ইহা কত ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া আছে! আপনারা ইহাকে অবশ্যই মনে করিয়া রাখিবেন, ওহো, চিরকাল আপনাদিগকে ইহা মনে করিয়া রাখিতেই হইবে! ইহার বিষয় আপনাদের বন্ধু বান্ধবগণকে জানাইবেন। তাঁহারা আসিবেন। তাহা হইলেই তাহার স্মৃতি নদী জলে লোষ্ট্র ফেলিলে যেরূপ জলরেখা ক্রমবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে সেইরূপ ক্রম-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তাহার নাম মাত্র শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু হৃদয় ইহার অন্তরে নিহিত জানিবেন। ইহা অপেক্ষা পুরুষে স্ত্রীলোকের সমাধিস্তম্ভ আর কত ভাল করিতে পারে; সকলেই স্ত্রীলোকের পূত দেহময় সৌন্দর্য্যই দেখিতে পারে, কিন্তু তাহার সুন্দর অন্তঃকরণের গোপনতা কয়জন বুঝিতে পারে?"

সে দ্রুতপদক্ষেপে কিছুদূরে হাটিয়া গেল, পুনরায় পশ্চাদ্‌ভাগে তাকাইয়া দেখিল আরও কতিপয় দর্শক আসিয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ কথা কহিতেছে, কখনও সমাধিস্তম্ভের উপর কখনও বা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেহবা তাহার শেষকীর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া স্তব্ধকল্পনা হইয়া দাঁড়াইয়া গেছে।"

তাহার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু আসিল। একটা অব্যক্ত আনন্দের দৃষ্টি তাহার মুখ-মণ্ডলে স্পষ্ট ভাসিয়া উঠিল।

সে আনমনে বলিল, "ওগো প্রিয়া! আজ আমি জয়ী। মৃত্যু তোমার দেহ দাবী করিয়াছে, স্বর্গ তোমার আত্মা; কিন্তু এতদুভয়ের পুণ্যস্মৃতিই আজ জগৎ দাবী করিতেছে। আজ হইতে তোমার নামের চতুষ্পার্শ্বে "সুন্দরীর উপকথা" বেষ্টিত হইতে সুরু হইল।"

সূর্য্য কিছুপূর্ব্বে অস্ত গিয়াছে। সন্ধ্যার গোলাপরঞ্জিত আকাশপটে তাহার সমাধিস্তম্ভের একখানি প্রতিচ্ছবি বুঝি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার রূপান্তরিত কল্পনাকুহকে সে দেখিল যেন উহা অভ্রময় স্বর্গের অপরালে গিয়া পৌঁছিয়াছে, আর সন্ধ্যাতারা যেন উহারই শীর্ষে ত্রিদিবের মণিদীপ জ্বালাইয়া দিয়া ঘনায়িত নিশার অন্ধকার ঠেলিয়া তাহার চক্ষুকে উহার পথ দেখাইয়া দিতেছে।

বিদায়কালে।

লেখিকা—শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু।

আমার বিদায়কালে বুকের মাঝে
যে বীণটী বাজ্‌বে সেদিন,
হেথায় আমি রাখ্‌ব কোথায়, আর
ক'র্‌বই বা কোথা বিলীন?

* * *

ওসে বিলিয়ে দেব সে সুর আমার
এই গহনের ফুলে ফুলে।
কিছু বা সে দিয়ে যাব—নীলাকাশের
শুভ্র নিবিড় নীরদ-কুলে।

* * *

কিছু বা মিশিয়ে দেব, দিগন্তরের
শীতল পবন গায়ে গায়ে।
কিছু বা ছড়িয়ে যাবে ভুবনময়—
উঠ্‌বে নিতি পাখীর রা-য়ে।

---

* James Lane Allen,

কবিবর ৺দাশরথির—
অনুপ্রাস মাধুর্য্য।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
কাব্যরত্নাকর।

অনুভব কবি দাশরথি রায় মহাশয় বাঙ্গালা সন ১২১২ সালের মাঘ মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া মাতা পিতার তথা বঙ্গবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। অদ্য একশত ছাব্বিশ বৎসর গত হইতেছে সেই মহাত্মার নাম বঙ্গীয় জনের মানস-ক্ষেত্রে উজ্জ্বলভাবে ক্ষোদিত রহিয়াছে।

শতবৎসর অগ্রে বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য, পাঁচালীগান, তরজা প্রভৃতি যাহা কিছু হইয়াছে তৎ সমুদয় অনুপ্রাসে অলঙ্কারে রূপে রসে গন্ধে বর্ত্তমান যুগের কাব্যাদি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান। গুরু-চণ্ডালী ভাষায় কর্ত্তা-কর্ম্ম-ক্রিয়ার সপিণ্ড-করণ করিয়া কলেজ-পড়ুয়াগণের মস্তিষ্ক হইতে যে সকল কবিতা নির্গত হয়, পূর্ব্বকালের কবিগণের হাত দিয়া সেইরূপ কদাচই বাহির হইত না। যাহার নিকট হইতে অপদার্থ কবিতা নির্গত হইত, বোদ্ধাগণ সেই অর্ব্বাচীনকে কবি-পংক্তিতে উপবেশন করিতে দিতেন না।

এখন লোকের নিকট অপ্রিয় হইবার ভয়ে অথবা কোন কারণে সমালোচনা দেখিতে পাইনা। বঙ্গবাসীর হরিমোহন বাবু ও হিতবাদীর বিদ্যা-বিনোদ ব্যতীত অন্য কোনও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকমহাশয়গণ প্রায়শঃ সমালোচনায় হাতক্ষেপ করেন না। তখনকার কালে বিজ্ঞ সমালোচক, সমজদার রসিক পাঠকই বা কত, সমালোচনাই বা কত?

ভাল জিনিষের আদর চিরদিনই। নিন্দুকের অসার গলাবাজি দুদিনেই রুদ্ধ হইয়া যায়। সুকবি ৺দাশরথি রায় মহাশয় চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার পাঁচালী তাঁহার পঞ্চভূতাত্মক দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-রূপে পৃথিবী-তলে প্রসন্নমূর্ত্তিতে প্রকট-মান হইতেছে!

তিনি বঙ্গাব্দা ১২৬৪ সালে ৫২ বৎসর বয়সে তনুত্যাগ করেন। এক্ষণে সনায় ৭৪ বৎসর হইতেছে—তাঁহার মধুর কণ্ঠধ্বনিসম্ভূত সঙ্গীতালাপ নীরব য়াছে।

৺দাশরথি রায়কে কবি বলিতে আধুনিক শিক্ষিত কবি ও সাহিত্যিকগণ সম্মত নহেন। বঙ্গবাসীর প্রথিতনামা শ্রীল হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালীর তৃতীয় সংস্করণ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন যে সাহিত্যরথী শ্রীল দীনেশ চন্দ্র সেন, ৺ললিতকুমার বিদ্যারত্ন ও শ্রীল অতুল ঘটক প্রমুখ মহাশয়গণ উক্ত দাশরথির কবিত্ব সম্বন্ধে কি প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমিও সেন মহাশয়-প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে উক্ত রায় মহাশয়ের পাঁচালী সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য দেখিয়াছি, কেবল একটি গানের প্রশংসা আছে যথা—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি।
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী॥
মুক্তি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী, স্নেহ হবে মা যশোমতী॥
ধর ধর জনার্দ্দন, (আমার) পাপভার গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংস চরে, ধ্বংশ কর সম্প্রতি।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী, মন-ধেনুকে বশ করি,
তিষ্ঠ হৃদি-গোষ্ঠে, পূরাও ইষ্টে, এই মিনতি॥
(আমার) প্রেমরূপ যমুনা-জলে
আশা-বংশীবট মূলে,
সদয়-ভাবে স্বদাস ভেবে সতত কর বসতি,
হৃদি বল রাখাল প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ ধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে এ দাশরথি॥

বঙ্গে এই গান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠস্থ, ভক্তি-রসের সমুজ্জ্বল কবিত্ব ইহা অপেক্ষা অধিক দেখা যায় না! প্রেমিক-বৈষ্ণব-শিরোমণি দেবর্ষি নারদাদি ভক্তকুল মুখেই উক্ত সঙ্গীত শোভা পায়।

আশ্চর্য্য এই যে, ললিতবাবুর ন্যায় সাহিত্যরথীও দাশরথির গান সম্বন্ধে সম্যক বিজ্ঞ ছিলেন না; আজ তিনি ঊর্দ্ধ-লোকে অবস্থান করিতেছেন, স্বপ্রণীত "বানান সমস্যায়" নিজ ভ্রম সংশোধনের জন্য তিনি জীবিত নাই ইহাই পরিতাপের বিষয়। দাশরথির বিখ্যাত গান "দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥" এই গানটিকে উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "প্রসাদী-সঙ্গীত" অর্থাৎ ৺রাম প্রসাদ সেন কবিরঞ্জনের রচিত বলিয়াছেন।

তৎপরে "গীতি মালিকার" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক মহাশয়ও কবিবর সম্বন্ধে কত ভ্রান্ত দেখুন। তাঁহার (কবিবর দাশরথির) প্রণীত একটি গান যথা—

ননদি গো! বলো নগরে, সবারে।
ডুবেছে রাই রাজ-নন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি বাসে? কাজ কিবা সে
কাজ কেবল সেই পীতবাসে
সে থাকে যার হৃদয়-বাসে
(ওলো!) সেকি বাসে বাস করে?
কাজ কি গো কুল?
কাজ-কি গোকুল?
প্রতিকূল সব হোক গোপ-কুল,
আমি ত সঁপেছি গো কুল—
সেই অকূল কাণ্ডারীর করে॥

এই অপূর্ব্ব অনুপ্রাসবহুল সুন্দর গানটিকে বলিয়াছেন "মধুসূদন কিন্নরের॥" ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় বৈকি।

শ্রীল দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মন্তব্য এই যে, তাঁহার প্রধান দোষ অশ্লীলতা। দাশরথির রচনায় সবই আছে। আদি রস, করুণ রস, হাস্যরস ও প্রসাদ রসের প্রাধান্যে পাঁচালী-গান ভরপুর। তাঁহার পাঁচালী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—(১)পৌরাণিক ও(২) লৌকিক। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি অবলম্বনে যে সকল ছড়া গান ও নাচাড়ী রচিত হইয়াছে—তাহাই পৌরাণিক নামে অভিহিত। আর "শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব," "কর্ত্তাভজা," "বিধবা বিবাহ," "নলিনী ভ্রমর," "প্রেমমনি ও প্রেমচাঁদ" প্রভৃতি লৌকিক উভয় প্রকার গানেই অশ্লীলতা আছে বটে কিন্তু পৌরাণিক আখ্যানমূলক পাচালীতে অশ্লীলতার অংশ অল্পই দৃষ্ট হয়।" কিন্তু লৌকিক পাঁচালীগানে অশ্লীল-অংশের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়।" "নবীনচাঁদ-ও সোনামণির দ্বন্দ্ব" নামক পাঁচালীতে একস্থানে আছে—

"স্নান ক'রে উঠিলে পরে চাঁদবদনী চুল ঝাড়ে
ভিজে কাপড়ে রমণী বড় সাজে।
(অমনি) আড়-চোখে আড় চোখে চায়
বুক দেখে বুক ফেটে যায়
মনে মনে বসেন বুকের মাঝে॥"

এ সকল সেকালের লোকে আগ্রহ পূর্ব্বক শুনিত। ছাপার অক্ষরে ইহা পেক্ষাও অশ্লীল পূর্ব্বতন কবিগণের হাত হইতে বাহির হইয়াছে। "কুচ শম্ভু শির নখ চন্দ্রকলা" প্রভৃতি শুনিতে মিষ্ট হইলেও অশ্লীল বটে, অথচ এগুলির বেলা দীনেশ চন্দ্র বিশেষ কিছু বলেন নাই।

(ক্রমশঃ)

অভিমান ও অহঙ্কার।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আমি যদি বলি সময় বিশেষে অভিমান অহঙ্কার পরিত্যাগ করা উচিত নয়, তাহা হইলে বোধ হয় কেহ কেহ বলিতে পারেন, "বেশ লেখক, এ আবার কি! অভিমান ও অহঙ্কার পরিত্যাগের উপদেশ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ থেকে আরম্ভ করে কত বইএ, কত ধর্ম্ম পুস্তকে পড়ে আসচি "সদা সত্য কথা বলিবে, কলহ করিও না, অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু অসদ্‌গুণের বশবর্ত্তী হওয়া উচিত এরূপ উপদেশ কোথাও দেখি নাই। কথাটা সত্য। ধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠানের উপদেশ সর্ব্বত্রই আছে, অধর্ম্মের অনুষ্ঠানের উপদেশ কাহাকেও দিতে হয় না, কারণ জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাতেই রত হয়; তাহা হইতে নিবৃত্ত করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মদ্য মাংস, মৈথুনে জীবের স্বতঃ প্রবৃত্তি, ঐ সকল হইতে নিবৃত্তিই মহাধর্ম্ম। প্রবৃত্তির উপদেশের প্রয়োজন নাই, নিবৃত্তির উপদেশই প্রয়োজন। ঐ সকল উপদেশ ঋষিগণের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়া কার্য্যকরী হয়। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্য নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিশ্চ মহাফলা।"

মদ্য মাংস ভক্ষণ এবং মৈথুন দোষাবহ নহে কিন্তু মোক্ষার্থীগণের পক্ষে ঐ সকল পরিত্যাগ অতি কর্ত্তব্য। সেইরূপ স্থান বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে সংসারীর পক্ষে অভিমান ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হওয়া দোষাবহ নহে। তবে যাহার অভিমান ও অহঙ্কার কিছুমাত্র নাই সে ব্যক্তি বিকৃত-মস্তিষ্ক কিম্বা তিনি এ পৃথিবীর নহেন স্বর্গরাজ্য তাঁহার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু যিনি এই পৃথিবীর, যাঁহাকে এই কর্ম্মভূমিতে দেবকীর্ত্তি, পিতৃকীর্ত্তি বজায় রাখিয়া, সৎকর্ম্ম-করিয়া যশোলাভ করিতে হইবে, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে তাঁহার একেবরে অভিমান ও অহঙ্কার

ত্যাগ করা চলে না। ভগবান রামকৃষ্ণদেব ক্রোধ পরিত্যাগ স্থলে উপদেশ দিতেন "ফোঁস কর্ব্বে কিন্তু কাঁম্‌ড়াবেনা॥" কথাটী অতি সত্য। এ সংসারে থাকিতে হইলে ফোঁস করা প্রয়োজন নতুবা শান্তির আশা নাই। আত্মবোধ বা অহঙ্কারের জুয়ার না আসিলে উৎসাহ বা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে মহাবীর ব্রাহ্মণ-বেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিতে উঠিলে সভাস্থলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে নিবারণ ও ব্যঙ্গসূচক ধ্বনি উঠিয়াছিল। কিন্তু পার্থের আত্মবলবোধ বা অহঙ্কার জাগরিত থাকাতে তিনি ব্রাহ্মণগণের নিবারণে ও ক্ষত্রিয়দিগের ভ্রূকুটিতে অবজ্ঞা সূচক দৃষ্টিই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া অনেকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন "কেন সবে নিবারণ কর অকারণ। যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥" অযথা অহঙ্কার যেমন ঘৃণার্হ যথার্থ অভিমান ও অহঙ্কার তেমনি সহনীয়। অপিচ অভিমান ও অহঙ্কার দ্বারা অনেক সময় অনেক মঙ্গল কার্য্যের উদ্ভব হয়। যথার্থ অভিমান ও অহঙ্কার মানুষকে নীচগামী হইতে দেয় না। "আমি সৎকুলে জন্মিয়াছি, আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ অনেকেই কৃতবিদ্য ছিলেন, অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন" যাঁহার এরূপ অহঙ্কার আছে তিনি কখনই নীচকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না, পরন্তু নিজ আত্মার উন্নতি ও সদনুষ্ঠানের উপায় চিন্তা করিয়া থাকেন। যথার্থ অভিমান ও অহঙ্কার মানুষের বল-বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সময়ে সময়ে অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার বলবৃদ্ধি করিয়াছেন, কখনও নিন্দা বা অপমান করিয়া তাঁহার তেজোক্ষয় করেন নাই। কুরু পিতামহ ভীষ্মদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে রথী নির্ব্বাচন সময়ে মহাবীর কর্ণকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে কর্ণের অভিমান ও অহঙ্কারে আঘাত লাগিয়াছিল, তিনি ভীষ্ম জীবিত থাকিতে যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার নিন্দা ও অপমান করিয়া তাঁহার অভিমান ও অহঙ্কারে আঘাত করিয়াছিলেন, বলক্ষয় করিয়া ছিলেন ও পরাজয়ের কারণ হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম স্থান ও অবস্থা বিশেষে অভিমান ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হওয়া নিন্দনীয় নহে বরং বিহিত।

বরষা-রাণী।

লেখক—শ্রীযুক্ত জহরলাল বিশ্বাস।

প্রখর রৌদ্র শেষে
কেন গো নবীন বেশে
জাগালে বরষা-রাণী আমার হিয়া,

মরমের দ্বারে এসে
একেবারে ভালবেসে
বুকের গোপন সুধা চেয়ে নিলে প্রিয়া ?
জুঁই ও মালতী ফুলে
মালাটী পরিয়া গলে
প্রণয়ে ভুলাতে রাণী কেন গো এলে ?
থাকিতে তো পারিবে না
যতই হওনা চেনা
আবার লুকাবে সখী পারে যে ঠেলে।

তব যত স্নেহ বারি
ঢালিয়া ধরণী পরি
দেখাও হৃদয় তোমার কতই মহান,
নীরস ভূমিতে সখী
দাও তব যত প্রীতি
রেণুতে রেণুতে দাও প্রেমের চুম্বন।
তব এই পরশনে
কত কি নূতন গানে
কেটে যাবে বিরহীদের বিরহ-রাত্রি,
তাই আজি প্রাণে মম
ধ্বনিয়া উঠিছে শোন
প্রসুপ্ত ছিল যে সব প্রণয়-গীতি।

যে পরশে বরষা প্রিয়া
করিলে উথল হিয়া
ফিরায়ে নিয়োনা যেন তাহা চকিতে।
ক্ষণিক পুলক বশে
আসিলে গো যদি হেসে
স্নেহে তবে মিশে যাক্ সখা সখীতে॥

বঙ্কিমস্মৃতি।

লেখক—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সিংহ কবিভূষণ।

প্রণমি বঙ্কিমচন্দ্র! কোবিদ-প্রবর,
আজিকার দিনে লহ স্মৃতি-উপহার।
তোমারি বিহনে বঙ্গ আঁধার-আগার,
ঊর্ম্মিহীন হায় আজ ভাষার সাগর,
রসের ফেনিল নাহি নীরব নিথর।
শুকাইয়া যায় সিন্ধু-বেলার আকার;
স্বরগে বসিয়া দেব করিও বিচার।
মোরা যেন গাই তব কিরণ নিকর।
মর্য্যাদা রাখিতে যেন পারি চিরদিন।
অমূল্য রতন যাহা করে গেছ দান,
সাহিত্য-সাধন-পথে বিরামবিহীন,
তাহি লয়ে পাব পুনঃ তোমার সন্ধান।
লোক-চক্ষু-দূরে আছ চিরদিন তরে,
হৃদি-রাজ্য জুড়ে তুমি প্রাণের ভিতরে।

বালক ও বালিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কে ও দুটি কর নিরীক্ষণ,
মিলিয়া পরম সুখে করে খেলা হাসি মুখে,
অতি মধুময় মূর্ত্তি মানস-মোহন।
সংসারের সার বুঝি এ দুটী রতন॥

আ-মরি কি নিরমল কায়,
প্রভাত কমল প্রায় দেখ এক শোভা পায়,
হায় যে অপরে হেরি কুমুদিনী প্রায়।
শশীর প্রকাশে যেন শোভে সে সন্ধ্যায়॥

দর্শনীয় উভয়ের হাসি,
কথায় অমৃত ঝরে হৃদয় প্রফুল্ল করে,
কারে দেখি, কারে রাখি, কারে ভালবাসি।
কোথায় পাইল এরা এত রূপরাশি ?

বিকৃত কি আমার নয়ন ?
কভু নহে; কহি স্থির এরা রত্ন এ মহীর,
প্রকৃতির প্রিয় অতি অবনীভূষণ।
বিশেষ কৌশলময় এদের সৃজন॥

আজ এ বালক সুকোমল।
পশিলে সংসারাগার দেখিব প্রভাব তার,
করিবে বিবিধ গুণে ভবন উজ্জ্বল।
পরহিত কর্ম্মে রত হয়ে অবিরল॥

এ বালিকা শক্তি-স্বরূপিনী,
সরলতা ভালবাসা এর হৃদে করে বাসা,
স্নেহ মমতায় হবে নরের সঙ্গিনী
তাই হেরি রূপ এর ভুবন মোহিনী॥

সমালোচনা।

সুদিন-বিচার—শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সঙ্কলিত।

এই পুস্তকে হিন্দুর পুরাণ, তন্ত্র, জ্যোতিষাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং খনার বচনাদি হইতে যাত্রাদি নানাবিধ শুভ কর্ম্মের দিন স্থির করিবার সহজ উপায় সকল লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। আমরা "সুদিন-বিচার" পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, অনেক অজ্ঞাত-বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অধঃপতনের দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। হিন্দুধর্ম্মানুরাগী প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকে আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি, মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ৺ কাশীধাম—মহামণ্ডল প্রেসে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কেশের জন্য মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর মহাসৌরভময় কেশ তৈল।

স্বর্গীয় পরিমল।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পরীক্ষক, সায়েন্স এসোসিএসনের প্রফেসর ডাক্তার আর. সি. দত্ত, (এফ. সি, এস.) মহাশয়ের উপদেশানুযায়ী প্রস্তুত। ব্যবহারে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই কেশের অকালপক্কতা মাথার চুল উঠা, খুস্কি পড়া প্রভৃতি যাবতীয় কেশের পীড়া নিবারিত হয় এবং কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সৌরভে মন মাতাইয়া তোলে, এবং মস্তিষ্ক শীতল করে।

এমন উপকারী তৈল থাকিতে,—কেন বাজে তৈল মাখিয়া অর্থ নষ্ট করেন ? একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন। মূল্য ১নং শিশি ৸৵ চৌদ্দ আনা, ২নং শিশি ॥৵০ দশ আনা ডাকমাশুল ।৵০ ছয় আনা।

স্বর্গীয়-পরিমল সম্বন্ধে কে কি বলেন দেখুন :—

প্রথম পত্র : কলিকাতা কুমারটুলির সুবিখ্যাত কবিরাজ কেশরী স্বর্গীয় নিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়া ছিলেন, "স্বর্গীয়-পরিমল" তৈল ব্যবহার করিয়া দেখিলাম, সৌগন্ধ তীক্ষ্ণ নয়, ব্যবহারে অনুভব করিলাম শীতল গুণ বর্ত্তমান আছে।"

দ্বিতীয় পত্র : —বহুদর্শী প্রবীণ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষাল (এল্ এম্ এস্) মহাশয় লিখিয়াছেন, মস্তিষ্ক শীতল রাখে।

তৃতীয় পত্র :—বিবিধ বৈদ্যগ্রন্থ প্রণেতা ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরলাল সেন গুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন ;—মস্তিষ্কগত রোগ বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও কেশবৃদ্ধির পক্ষে এই তৈল পরম হিতকারী।

চতুর্থ পত্র :—বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ডিস্পেনসারীর সুপ্রসিদ্ধ রেসিডেণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদকুমার দত্ত, (এম, বি.) মহোদয় বলেন : স্বর্গীয় পরিমল ব্যবহার করিয়া দেখিলাম, কি সৌরভে, কি উপকারিতায় ইহা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চম পত্র :—মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্যপরিদর্শক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র (এম্ বি,) মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ব্যবহারে বিমোহিত হইলাম।"

ষষ্ঠ পত্র :—সুপ্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু তারণীচরণ পাল, (এল, এম, এস.) মহাশয় বলেন,—"স্বর্গীয়-পরিমল তৈল অতি উপাদেয় হইয়াছে।"

সপ্তম পত্র : —ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলেন —স্বর্গীয় পরিমল, ইহার গন্ধে ও গুণে আমার ন্যায় অনেকেই মুগ্ধ হইবেন।

অষ্টম পত্র : হুগলী ধনিয়াখালীর সবরেজেষ্ট্রার শ্রীযুক্ত অমুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—বহুক্ষণ স্থায়ী, সুমিষ্ট ও অতি সদ্‌গন্ধযুক্ত এবং কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর।

নবম পত্র : কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট ও ভক্তবালা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :— কল্যাণবর শ্রীমান্ বাবু এন্ দত্ত মহাশয় চিরজীবেষু।

আজ ৪৬ বৎসর স্বর্গচ্যুত সুতরাং সেখানকার "পরিমলাদির" সংবাদ একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছি, এ জন্য আপনার তৈলের নাম যে "স্বর্গীয়-পরিমল" দিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। পৃথিবীর হিসাবে বোধ হয় "পরিমল" অতি সুবিমল। যুবক যুবতী অবাধে—আদরের সহিত ব্যবহার করিবেন, কিন্তু আমার মত বয়সে এত গন্ধ ছড়াইয়া বেড়াইলে লোকে কি ক্ষমা করিবেন ?


স্বাস্থ্যের পথে

অমৃতবল্লী কষায়

কি রোগী কি সুস্থ

সকলের পক্ষেই ইহা সমান উপকারী।

কবিরাজ
নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোংলিঃ
১৮।১,১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনা।

সম্পাদক - শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শ বর্ষ] ১৩৩৮ আষাঢ়, [৩য় সংখ্যা]

১।	শ্রীমদ্ বালানন্দ — শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৫
২।	মানসী — শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ, ...	৭৬
৩।	কবির বিভ্রাট — শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি, এল,	৭৮
৪।	বর্ষাকাল — শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	৮৩
৫।	হাণ্টারের পরিণাম — শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৮৪
৬।	গীত — শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮৮
৭।	পাগল — শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৩
৮।	মনের কথা — শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৯৫

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।
[illegible] বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
[illegible] নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত। 21-9-31

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

একদিনে জ্বরছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৮৩৩

চিরানুগত

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারিং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি, সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

নিবেদন।

গ্রাহক-মহোদয়গণের প্রতি সানুনয় নিবেদন :—

১৩৩৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা "জন্মভূমি" আপনাদের সমীপে প্রেরিত হইল। আশা করি, আষাঢ় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াই অবিলম্বে জন্মভূমির ১৩৩৮ সালের বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা সত্বর-প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।

৬৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

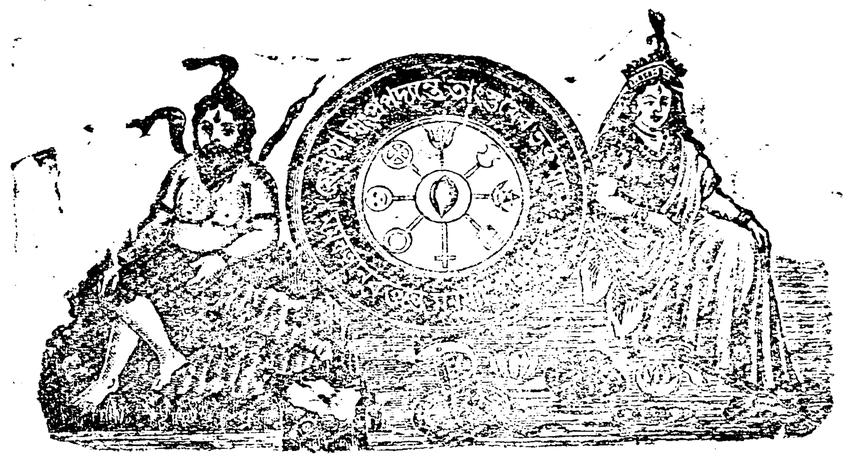

জন্মভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ } ১৩৩৮ সাল আষাঢ়, { ৩য় সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পর্য্যটনকালীন আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ও উপাখ্যান।

আসাম প্রদেশ।

কামিখ্যাপর্য্যটন উপলক্ষে গুরুদেব একটী হাস্যজনক ঘটনা শুনাইয়াছিলেন। বাস্তবিক এ ভারতবর্ষে কত প্রকার ব্যাপার যে আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ গল্পটী হইতেছে একটী বানর রাজার বিষয়।

ধুবড়ী হইতে যখন গুরুদেব কামিখ্যা যাত্রা করেন, সে সময়ে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইবার পর গৌরীপুর বলিয়া একটী গ্রাম পাওয়া যায়। সেখান হইতে কয়েকটী পল্লী উত্তীর্ণ হইয়া গেলে এই বানর রাজার গ্রাম মিলিয়াছিল। সেখানে বৈদ্যনাথের তপোবন পাহাড় হইতে উচ্চ একটী পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ের উপর তপেশ্বরী দেবী বলিয়া এক দেবী-মূর্ত্তি আছেন। এ পাহাড়ের নিম্নে একটী

ইঁদারা আছে ও উহার সন্নিকটে যাত্রীদিগের অবস্থানের জন্য একখানি ছোট রকমের ঘর আছে। পূজার্থী যাত্রীরা সেই ঘরে যাইয়া অপেক্ষা করে। প্রতি দিন সকালে একটু বেলা হইলে উক্ত দেবীর পাণ্ডারা পূজার সমুদয় আয়োজন সঙ্গে লইয়া এই ঘরটীতে আইসে ও সেখানে অবস্থিত যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ের উপর পূজা দিতে যায়। সে পূজার সময় বানররাজা তাঁহার সঙ্গীগণ সহ সেখানে উপস্থিত থাকেন। দেবীর এ পূজা বানররাজার তরফ হইতে হয় ও এজন্য ৮ খানি গ্রাম পূর্ব্বে বানররাজ্য ছিল, এক্ষণে উহা ১২ খানি হইয়াছে। এই বানর রাজাই নাকি এ সকলের মালিক, তবে পাণ্ডারা এই রাজার তরফ হইতে খাজনা আদায় উসুল করে, এবং এই আয় হইতে দেবীর পূজা ও সদাব্রতাদি নিষ্পন্ন করে। প্রতিদিন রূপার গেলাসে ও বাটীতে দেবীর জন্য ভোগ লইয়া আইসে। পূজা সমাপ্ত হইলে এই দেবীর প্রসাদ প্রথমেই বানররাজাকে দেওয়া হয়. ও ইহার পর তাঁহার সঙ্গী অন্যান্য বানরেরা পাইয়া থাকে।

পাহাড়ের নিম্নে যে ঘরখানির উল্লেখ করা হইল, তাহা অতি দুর্গমস্থানে অবস্থিত। ইহা চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল দ্বারা পরিবেষ্টিত। বহুবিস্তৃত এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া যে একটী রাস্তা আছে তাহা দিয়াই এখানে উপস্থিত হইতে হয়। এ জঙ্গলে ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বন্য হস্তীও দেখা গিয়া থাকে। এই যাত্রীকুটির হইতে পাণ্ডাদের গ্রাম বহুদূরে অবস্থিত,লোকমুখে এ দেবীর বিষয় অবগত হইয়া গুরুদেব কয়েকটী যাত্রীর সহিত পূজা করিবার মানসে এ স্থানে উপস্থিত হন। কিন্তু এ স্থান যে এরূপ ভয়ানক ও সকালে পাণ্ডাদিগের সহিত ভিন্ন পূজা দেওয়া যায় না, তাহা জানিতে পারেন নাই। জঙ্গলের ভিতরস্থ রাস্তা দিয়া চলিতেচলিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা সেই ঘরে যাইয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের সঙ্গে আহারীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না ও সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় পাণ্ডাদের গ্রামেও যাইবার উপায় ছিল না, এজন্য অভুক্তাবস্থায় সেই ঘরেই রাত্রি যাপনপূর্ব্বক পরদিন সকালে পূজা দিবেন স্থির করিয়া সকলে সেখানেই অবস্থান করিলেন। বন্যহস্তীরা নিকটস্থ বনে আসিয়া নানারূপ শব্দ করিতে লাগিল। কি করিয়া ইহাদিগকে দূর করিবেন ভাবিতে ভাবিতেগুরুদেবের সঙ্গে বারুদে ভিজান একখণ্ড কাপড় ছিল,তাহা হইতে এক টুকরা লইয়া আগুন ধরাইলেন। গাঁজাদি সেবনের পক্ষে সুবিধা হয় বলিয়া অনেক সাধুই এরূপ কাপড় সঙ্গে রাখিয়া থাকেন। যাহা হউক এই বারুদগন্ধযুক্ত কাপড়ের আগুন দেখিয়া হস্তীগণ এরূপ ভয় পাইল যে বিকট এক চীৎকার করতঃ তাহারা দূরে পলায়ন করিল ও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্যাঘ্রের ভয়

অত্যন্ত অধিক ছিল, যদিচ তাঁহাদের নিকট ইহারা উপস্থিত হয় নাই ; কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে সেখান হইতে কিছুদূরে এক জলাশয়ের নিকট বিশ্রামস্থানে (শৌচে) যাইয়া দেখিলেন যে, একস্থানে একটী লোটায় আটা প্রভৃতি পড়িয়া আছে ও তাহার নিকটে বহুস্থানে রক্তচিহ্ন রহিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বুঝিলেন যে, কামিখ্যা-যাত্রী কোন সাধুকে একাকী পাইয়া ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করিয়াছে।

যাহা হউক,ক্রমে একটু বেলা হইলে পাণ্ডারা দেবীর পূজোপকরণ সহ উপস্থিত হইল। যাত্রীদিগের নিকট বিক্রয় করিবে বলিয়া কতিপয় দোকানদারও ছোলা মটর সহ আসিল। দেবীর পূজায় দিবেন বলিয়া মহারাজ এ সব উপকরণ কিছু কিছু কিনিলেন ও পাণ্ডাদের সহিত পাহাড়ে উঠিলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে, বহুসংখ্যক বানর পূর্ব্বেই আসিয়া হাজির আছে। তাহাদের মধ্যে কে রাজা পাণ্ডারা দেখাইয়া দিল। পাণ্ডাদের পূজা হইবার পর, অন্যান্য যাত্রীরা পূজা করিলেন। গুরুদেব সকলের সহিত বাহিরে আসিয়া রাজাকে সম্মান দেখাইবার জন্য দেবীর প্রসাদী এক ছড়া পুষ্পমালা যেমন তাহার মস্তকে দিয়াছেন, অমনি সেই বানররাজা সজোরে তাঁহার হস্ত চাপিয়া ধরিল ও ইহা করিবামাত্র তাহার অন্যান্য সঙ্গীরা মহারাজকে বেষ্টন পূর্ব্বক আক্রমন করিতে উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি ত অবাক হইয়া গেলেন। ইত্যবসরে পাণ্ডারা উপস্থিত হইয়া করজোড়ে রাজাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে ইনি (মহারাজ) একজন ব্রহ্মচারী সাধু। ইনি রাজাকে অবমাননা জন্য মালা পরাইয়া দেন নাই। তাহার সম্মান জন্য প্রসাদী মালা সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই দিয়াছেন। এরূপ বুঝাইবার পর বানররাজ হাত ছাড়িয়া দিল ও তখন অন্যান্য বানরেরা শান্ত হইল। ইহার পর পাণ্ডারা দেবীর প্রসাদ অগ্রে রাজাকে দিয়া পরে অন্যান্যকে দিল ও মহারাজও চেনা, মটর প্রভৃতি যাহা কিনিয়াছিলেন তাহা দিলেন। মহারাজ এ সময়ে একটু উচ্চৈঃস্বরে পাণ্ডাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, "রাজা ত বটে, কিন্তু "বানুরে" বুদ্ধি তাহা পূর্ব্ববৎই আছে।" ইহা বলিতেই পাণ্ডারা হাঁ হাঁ করিয়া এরূপ বলিতে নিষেধ করিল ও বলিল যে "ইনি সমুদয় কথা বুঝিতে পারেন ও ইহা শুনিলে এখনিই নূতন উৎপাত আরম্ভ করিবেন"। ইহার পর এই বানররাজা সম্বন্ধে একটী গল্প বলিল। তাহারা বলিল যে এই বানররাজার মৌজাগুলি সব লাখরাজ।এক সময়ে এ প্রদেশের এক কমিশনার সম্ভবতঃ Settlement officer. মনে করেন যে পাণ্ডারা এই রাজার ও দেবী পূজার দোহাই দিয়া মৌজাগুলি ফাঁকী দিয়া ভোগ করিতেছে। এজন্য গ্রামগুলি

সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন। এরূপ করিলে পর দেবীর ভোগ ও রাজাকে প্রসাদ বিতরণ কয়েকদিন বন্ধ হইয়া যায় ও তাহারা সকলে মিলিয়া রাজাকে যাইয়া ইহা নিবেদন করে। ইহা করিবার পরই নানাস্থান হইতে দলে দলে বানর আসিয়া উপস্থিত হয় ও ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ করে। সাহেবের তাঁবু পুড়িয়া যায় ও সাহেবের কর্ম্মচারীগণকে বিষম উৎপীড়িত করিতে থাকে। তখন সাহেব বুঝেন যে, এই বানররাজার এক আধিপত্য আছে। এজন্য সন্তুষ্ট হইয়া পরে ৮ খানির স্থানে ১২ খানি মৌজা এ দেবীপূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

এ সমস্ত শুনিয়া হয়ত কেহ কেহ পরিহাস করিবেন। কিন্তু ভক্তমাল-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ রামভক্ত তুলসীদাস সম্বন্ধে এরূপ একটী গল্প আছে। তুলসীদাসের বিষয় অবগত হইয়া দিল্লীশ্বর মনে করেন যে, তিনি বুজরুকী দেখাইয়া লোকদিগকে ভুলাইয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখেন। কথিত আছে যে, তুলসীদাস এই কারাবাসকালে একমনে হনুমানজীকে স্মরণ করিতে থাকেন। ইহার পর বহু সংখ্যক বানর দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দিল্লীশ্বর ও সহরের অধিবাসীগণের উপর বিষম অত্যাচার ও উপদ্রব আরম্ভ করে। তখন মন্ত্রীদিগের প্রামর্শে তুলসীদাসের অদ্ভুত রামভক্তির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে কারামুক্তি দেন ও তাঁহাকে বহু সম্মান প্রদর্শন করেন।

এ দিন এ পূজা হইবার পর পাণ্ডারা গুরুদেব ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে তাহাদের গ্রামে আহ্বান করে, ও বলে যে বানররাজার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে আজ সদাব্রত দেওয়া হইবে। বাস্তবিক পাণ্ডাদের গ্রামে যাইবার পর তাহারা যথোচিত সদাব্রত দান করিয়াছিল।

মহারাজের ভ্রমণব্যাপার বহুদিন পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু আজও এ তপেশ্বরী পূজা প্রতিষ্ঠিত আছে। কারণ তাঁহার মুখে এ বিষয় জানিয়া আমাদের গুরুভ্রাতা পরমানন্দজী যখন ১৩৩৪ সালে এ অঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন তখন তিনি এ পূজা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তবে তাঁহার মুখে আরও একটী অতিরিক্ত বিষয় শুনা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, দেবীর পূজায় যে ছাগবলি হইয়াছিল তাহার মুণ্ডটীও প্রথমে রাজাকে দিলে রাজা সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ ইহা আনন্দে ভক্ষণ করিয়াছিল। মহারাজ কোনরূপ পশুবলি এ স্থানে দেখেন নাই। বানরগণ শাকসব্জী ভোজী বলিয়াই সকলে জানে, কিন্তু এ ছাগমাংসভক্ষণ বিচিত্র ব্যাপার বলিতে হইবে। তাহা হইলে দেবীর প্রসাদ বলিয়া ইহা তাহাদের উপেক্ষনীয় নহে ইহা অবশ্যই তাহাদের বোধ আছে।

চিমটাঘাতে পাগলের সুস্থতালাভ —খাগড়ায়।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথমবার কামিখ্যাদর্শনে বাহির হইয়া গুরুদেব ধুবড়ী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। এই ফিরিবার কালে তিনি মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত খাগড়া নামক স্থানে আসেন। এখানে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটী মন্দিরের সম্মুখে এক বৃক্ষমূলে আসন নির্দ্দিষ্ট করেন। ইহার সন্নিকটে এক নাগা সন্ন্যাসী থাকিতেন। সে দিন এ স্থানে উপস্থিত হন, সে দিন পূর্ণিমাতিথি। এজন্য গুরুদেব ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, সেই গঙ্গাতীরে এ দিন হোম করিবেন। এজন্য আসনের সম্মুখের স্থানটী গোময়-দ্বারা লিপ্ত করিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া লইলেন ও তথায় ধুনী প্রজ্বলিত করিলেন। এ সকল করিবার পর হস্ত পদ ধৌত ও গঙ্গাস্নান শেষ করিয়া যখন ফিরিতেছেন, তখন দেখিলেন যে, এক ব্যক্তি সেই স্থানে যাইয়া বসিল ও ধুনী হইতে অগ্নি লইতে লাগিল। এ ব্যক্তি যে, পাগল তাহা মহারাজ জানিতে পারেন নাই। পবিত্র ভাবে প্রজ্বলিত ধুনীটী স্পর্শ পূর্ব্বক অপবিত্র করিলেইহা দেখিয়া সহসা তাঁহার সামান্য ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং সেই জন্য হস্ত-স্থিত চিমটা দ্বারা তাহাকে ২।৩ বার আঘাত করিলেন। এ পাগলটী এরূপে চিমটাঘাত খাইয়া কিছুই বলিল না। আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। এ ব্যক্তির সাংসারিক অবস্থা ভালই ছিল। ইহার ঘরে স্ত্রীপুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি পরিজন ছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি বহুদিন হইতে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার পাগলামীর অত্যাচারে বাটীর সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। বহুপ্রকারে তাহার চিকিৎসা করা হইয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সে যে কখনও সুস্থ হইবে এরূপ আশা কাহারও আর ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে সে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকার চিমটাঘাত খাইয়া যখন বাড়ী গিয়াছিল তখন সকলে দেখিল যে তাহার উন্মাদের লক্ষণ আর কিছুমাত্র নাই। সে বেশ সহজাবস্থায় সকলের সহিত বার্ত্তালাপ করিতেছে। তাহার হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়ায় সকলেই বহু আশ্চর্য্য হইয়া গেল ও ইহার কারণ কি জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় ও অপর ব্যক্তিদিগের নিকট অনুসন্ধান লইবার পর জানিতে পারিল যে, এক সাধুর চিমটাঘাত খাইয়াছে। ইহা শুনিয়া সকলে মহারাজের নিকট সেই গঙ্গাতীরে আসিল ও সকলে মিলিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গপূর্ব্বক প্রণাম করিল ও সেই পাগলের বিষয় নিবেদন করিল। মহারাজ ইহা শুনিয়া বড়ই প্রফুল্ল হইলেন ও বলিলেন যে, ইহা পরমাত্মাদেবেরই কৃপা। তাহাদিগকে বলিলেন যে, তাহাকে পাগল বলিয়াও তিনি জানিতেন না ও কোন রকম সঙ্কল্প করিয়াও কিছু করেন নাই। যাহাহউক

এই ব্যাপারে উক্ত ব্যক্তির পরিজনেরা এবং অপরে যাহারা এ ঘটনা জানিতে পারিল সকলেই মহারাজের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইল। এ ব্যক্তির এবং অন্যান্যের গৃহ হইতে প্রচুর পরিমাণে সিধা আসিতে লাগিল। মহারাজ ছিলেন একাকী ও একাহারী, সুতরাং এত প্রসাদ লইয়া কি করিবেন? ইহা হইতে সামান্য দ্রব্য নিজ ব্যবহারোপযোগী রাখিয়া বাকী সমস্ত পূর্ব্বোক্ত নাগা সন্ন্যাসীকে দিতে লাগিলেন। এজন্য ইনিও মহারাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে সেখানে কিছুদিন থাকেন তজ্জন্য যত্নশীল হইলেন। কিন্তু মহারাজ দেখিলেন যে ইহাতে একটা প্রতিষ্ঠা হইবার মত হইতেছে, এজন্য কয়েকদিন পরেই এ স্থান-ত্যাগ করিলেন।

এ বিষয়টী অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিবেন যে, সাধুগণের সংস্পর্শও সময়ে সময়ে মহাফলের সৃষ্টি করে। এজন্যই মহাত্মাগণের পদস্পর্শ করিবার জন্য সকলে ব্যগ্র হয়। মহাত্মাদের হৃদয় সর্ব্বদাই সত্বভাবে পরিপূর্ণ থাকে। এ জন্য সময়ে সময়ে বাহ্যিক রুক্ষভাব দেখাইলেও তাঁহাদের ক্রোধও সুফল প্রদান করে। চণ্ডীতে দেবীর রূপ বর্ণনায় আছে—"চিত্তে কৃপাসময় নিষ্ঠুরতা দৃষ্টা"—"সর্ব্বাসুরারিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রং। লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা। সুতরাং এ প্রকার মহাত্মাগণের বা দেবতাদের রোষে পড়িলেও ইহা হইতে পরিণামে শুভই প্রাপ্তি হয়।

অদ্ভুত দর্শন—জলেশ্বরে ঃ

তারকেশ্বরে আসিবার সময় মহারাজ একবার হুগলি প্রদেশস্থ জলেশ্বর নামক স্থানে হইয়া আসিবার কালে সেখানে একটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। মেমারি হইয়া এই জলেশ্বরে আসিয়াছিলেন; লোক মুখে শুনিয়াছিলেন যে, এখানকার নিবিড় বনমধ্যে "জলেশ্বর" নামক এক জাগ্রত শিবলিঙ্গ আছেন। ইহা গ্রামের বসতি হইতে কিছু দূরে অবস্থিত, ইহা দর্শন করিতে মহারাজের ইচ্ছা হয়। এ জন্য জঙ্গলের রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যার প্রাক্কালে এখানে উপস্থিত হন। মন্দিরটী জঙ্গলে বেষ্টিত ও এ সময়ে অপর লোকজন কেহ তথায় ছিল না। মন্দিরটী ছোট হইলেও ইহা বহু প্রাচীন বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। ইহার দেওয়ালের প্রশস্ততা প্রায় ৩।৪ হাত পরিমাণ ও ভিত্তিও খুব দৃঢ়ভাবে গঠিত। এখানে যাইয়া দেখিলেন যে, একটী পঞ্চমুণ্ডী আসন উপরদিকে আছে ও তাহার নিম্নে উক্ত জলেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। এ লিঙ্গটী উচ্চে প্রায় অর্দ্ধ হস্ত হইবে ও ইহা বাঁকাভাবে গৌরী-পট্টের উপর অবস্থিত। নিম্নে যেখানে এ লিঙ্গ আছেন

তাহার সম্মুখে মাত্র একজন আসন গ্রহণ করিতে পারে এতটুকু স্থান আছে। উপরের পঞ্চমুণ্ডীর আসনে দুইজনের মত স্থান ছিল। স্থানটী বেশ নির্জ্জন দেখিয়া সেখানেই রাত্রিবাস করিবেন এরূপ স্থির করিলেন। একটী কূপও ছিল, সুতরাং জলাভাবও ছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেই মহারাজ লিঙ্গসম্মুখস্থ স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন ও একান্তভাবে গোমুখী সহিত মালা লইয়া জপে বসিলেন। খানিকক্ষণ এরূপ জপে নিবিষ্ট থাকিবার পরই তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে মন্দিরের দুইপার্শ্বের দেওয়াল যেন তাঁহার উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। একটু পরেই চারিদিক হইতে হা-হা-হা শব্দ উত্থিত হইল। এরূপ অনুভবের পরই স্বপ্নের পর হঠাৎ যেরূপ জাগরণ হয় ঠিক সেইরূপ ভাবই আসিল ও ভাবিতে লাগিলেন যে, এ সমুদয় অদ্ভুত ব্যাপার কি? এক্ষণে কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কে যেন আদেশ করিলযে "লিঙ্গের উপরস্থ পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসিয়া অঘোরমন্ত্র জপকর"। এ আদেশ পাইয়া মহারাজ যেন আনন্দিত হইলেন। ইত্যবসরে দেখিলেন যে, তাঁহার হস্তস্থিত গোমুখী সহিত মালা ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে। তখন ইহা উঠাইয়া লইয়া পঞ্চমুণ্ডীর সম্মুখস্থ একটী আসনে উপবিষ্ট হইয়া অঘোর-মন্ত্রের জপে নিবিষ্ট হইলেন। আর কিছুই হইল না। পরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল ও মহারাজ শৌচাদি শেষ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একটু বেলা হইলেই নিকটস্থ গ্রামের ২।১ ব্যক্তি সেখানে আসিল। মহারাজকে সেখানে দেখিয়া ও তথায় "তিনি রাত্রিযাপন করিয়াছেন শুনিয়া ইহারা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা বলিল, যে, "এ স্থানে কেহ রাত্রিবাস করিতে পারে না, ইহা বহুদিন হইতে লোকে বলাবলি করে।" মহারাজ তাহাদিগকে রাত্রির ঘটনাগুলিও বলিলেন ও ইহা শুনিয়া তাহারা বুঝিল যে, মহারাজ এক পরম সাধু। তাহারা উদ্যোগী হইয়া গ্রাম হইতে সদাব্রত আনিয়া দিল। মহারাজ ভোজনান্তে ঐ স্থান ত্যাগ করিলেন।

এ গল্পটী অতি ছোট হইলেও পাঠকগণ বুঝিবেন যে, মহারাজ তাঁহার পর্য্যটন ব্রত কিরূপ নির্ভীক ভাবে ও নিঃশঙ্কচিত্তে সমাপন করিয়াছেন। দেবতার আদেশ হয়, ইহা আধুনিক শিক্ষিতদের অনেকেই হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু মহারাজের জীবনে ইহা বহুবার হইয়াছে। কামিখ্যা হইতে প্রথমবারের প্রত্যাবর্ত্তন কালে, কলেরায় মৃতপ্রায় হইলে যে এরূপ আদেশ হইয়াছিল তাহা বোধ হয় স্মরণ আছে। তবে মহানুভবেরাই এরূপ দৈব আদেশ প্রাপ্ত হন, কারণ পরমাত্মাদেব সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন।

তারকেশ্বরে অবস্থান ও সর্পদংশন।

প্রথমবার কামিখ্যাদর্শনে বাহির হইয়া যে,কারণে মহারাজ প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এ প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি খাগড়া হইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে আসন সংস্থাপন করেন।এ স্থানে সে সময়ে ভূতানন্দ স্বামীও অবস্থান করিতেছিলেন। এ স্বামীজীর অসাধারণ যোগবিভূতি আছে, ইহা সে সময়ে প্রচার হইয়া পড়ে। ভূরিভোজন করা তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, ইহা গুরুদেব স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা পূর্ণানন্দজীও ইহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহাদের কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া তিনি নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে পড়িতেন! এ ছাত্র অবস্থা হইতেই পূর্ণানন্দজীর ভবিষ্যৎ সাধুজীবনের সংস্কার কিছু কিছু দেখা দিয়াছিল। তাঁহার কতিপয় সঙ্গীর সহিত এ ভূতানন্দ স্বামীর নিকট তিনি প্রায়ই যাইতেন, তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া একটু আধটু সিদ্ধি গাঁজা প্রসাদ লইতেন ও তাঁহার নিকট হঠযোগের ক্রিয়াও কিছু কিছু শিক্ষা করিতেন। এ ভূতানন্দ আমাদের পরমগুরুদেব ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সহিত পরিচিত ছিলেন। এজন্য গুরুদেব তাঁহার শিষ্য এ পরিচয় পাইয়া তিনি গুরুদেবকে সৌহার্দ্দচক্ষে দেখিতে লাগিলেন ও এজন্য কয়েকদিন তাঁহার সহিত গঙ্গাতটে বাস করিলেন। নিকটে কালীঘাট ভিন্ন আর কোন তীর্থস্থান আছে কি না জিজ্ঞাসা করায়, ভূতানন্দ তারকেশ্বরের নাম বলিয়া দিলেন ও এজন্য মহারাজ সেখানে গমন করিলেন। যে সময় তিনি তারকেশ্বরে গমন করেন তাহার ৭।৮ দিন পূর্ব্বে মোহান্ত মাধবগিরি তাঁহার গদি দখল করেন। অনেকেই বিদিত আছেন যে, নবীন-এলোকেশী মামলায় জড়িত হইয়া এই মোহান্তের তিন বৎসর জেল হয়। ১৮৭৩ খ্রীঃ অঃ সেপ্টেম্বরে "মোহান্তের একি কায়" বলিয়া একখানি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। এ বৎসরেই মোহান্তের কারাবাস হয়, সুতরাং তাঁহার জেলমুক্তি সম্ভবতঃ ১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ হইয়াছিল। মাধবগিরির জেলে অবস্থান কালে অন্য এক সন্ন্যাসী মোহান্ত হন এবং জেল হইতে বাহির হইয়া মাধবগিরি যাহাতে মোহান্তের গদি অধিকার করিতে না পারেন, তজ্জন্য ইনি বিশেষরূপ সচেষ্ট ছিলেন। কারামুক্ত হইয়া মাধবগিরি ইহা জানিতে পারেন ও এজন্য কলিকাতার পালোয়ানদের সর্দ্দার বিশ্বেশ্বর ঘাটুরিয়ার সাহার্য্য প্রার্থী হন। এ বিশ্বেশ্বর কলিকাতা হইতে বরাবর বহু ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁহার দলস্থ বহুব্যক্তির সহিত অতর্কিতভাবে ও ভিন্নপথে তারকেশ্বরেউপনীত হয় ও তথা

নীন্তন মোহান্তের লোকজনকে পরাস্ত করিয়া মাধবগিরিকে গদিতে প্রতিষ্ঠিত করে ও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকে। গুরুদেবের তারকেশ্বরে আসিবার ৭।৮দিন পূর্ব্বে এ সব ঘটনা হয়; এজন্য তিনি আসিয়া মাধবগিরিকেই মোহান্ত পদে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখেন। ইহাঁর সহিত মোহান্ত মহারাজের সাক্ষাৎ হইবার পর মোহান্তজী তাঁহাকে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক সেখানে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। এ উপলক্ষে মহারাজ প্রায় এক বৎসরকাল এই তারকেশ্বরে বাস করেন। বাবা তারকেশ্বরের যাহাতে পূজাদি নিয়মিতভাবে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য গুরুদেবের উপর ভারার্পণ করেন। মোহান্তজী গুরুদেবের উপর এরূপ আকৃষ্ট হন যে তিনি স্পষ্টতঃ প্রকাশ করেন যে গুরুদেব সন্ন্যাস লইলে তাঁহাকে মোহান্ত পদে স্থাপন করিবেন। গুরুদেব কিন্তু এ ঐশ্বর্য্যে কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নাই। তিনি স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন যে, নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইবেন না ও বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইবেন না; অপিচ বিচরণ করিয়াই তিনি সাধুজীবন অতিবাহিত করিবেন। মাধবগিরির পরবর্ত্তী মোহান্ত সতীশ গিরিকে গুরুদেব জানিতেন, তবে ইহার শিষ্য প্রভাতগিরিকে জানিতেন না।

কাশীর ধ্রুবেশ্বর মঠের মণ্ডলেশ্বর রামগিরি স্বামীর সহিত মহারাজ এখানেই পরিচিত হন। এ স্বামীজীর বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মাকালপুরের এ সময়কার জমিদার এ স্বামীর শিষ্য ছিলেন, এ জন্য গুরুদেবও একবার মাকালপুরে স্বামীজীর সহিত গিয়াছিলেন। এ জমিদারের দুইপুত্র পরে মহারাজের শিষ্য হইয়াছেন। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ঋতজগিরি স্বামী কিছুদিন এই জমিদার পুত্রদের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

উক্ত রামগিরি স্বামীর সহিত অবস্থান কালে তারকেশ্বরে মহারাজকে এক সর্প দংশন করে। ইহার বিবরণ এইরূপ। তারকেশ্বর হইতে কিছু দূরে "লালদীঘি" বলিয়া একটী পুষ্করিণী আছে। ইহা সহর হইতে দূরে অবস্থিত ও উহার জল পরিষ্কার বলিয়া গুরুদেব এখানেই অতি প্রত্যূষে যাইয়া স্নানাদি করিতেন। একদিন স্নান করিয়া ফিরিবার সময় এই জলাশয়ের সন্নিকটে চমৎকার একটী সর্প দেখিতে পাইলেন। ইহা দীর্ঘ এক হস্ত পরিমাণ হইবে, কিন্তু ইহার রঙটী উজ্জ্বল সুবর্ণের মত, ইহার ফণাটী ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই সুন্দর। এটীকে দেখিয়াই গুরুদেবের এটীকে ধরিতে ইচ্ছা হইল। এজন্য লোটার জল ফেলিয়া দিয়া ইহাকে ধরিলেন ও লোটায় রাখিয়া তাহার মুখ বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া আসিলেন। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি ও এক্ষণে পুনরায় বলিতেছি যে,এই সর্প ধরা শুনিয়া কেহ

যেন চমকিত না হন। বিষধর গোখুরা সর্প ধরা, ও তাহাদিগকে লইয়া খেলা করা, পেঁপের ডালের ভিতর দিয়া উহাকে দুধ খাওয়ান ও পরে কয়েকদিন ইহাকে-রাখিবার পর জঙ্গলপ্রদেশে মোচন,—ইহা আমরা ও বৈদ্যনাথবাসী বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক কেরাণীবাদের আশ্রমে দেখিয়াছে। অতি তেজস্বী গোখুরা সর্প যেরূপ কৌশলের সহিত তাঁহাকে আমরা ধরিতে দেখিয়াছি, তাহাতে উপরোক্ত সর্প ধরাটী আমাদের নিকট বিস্ময়কর নহে। সদ্যঃধৃত সর্প লইয়া তিনি যখন খেলা করেন ও সর্পটী যখন মন্ত্রমুগ্ধভাবে তাঁহার প্রতি তাকাইয়া থাকে, তখন নিশ্চয়ই মনে হয় যে সর্প বশীভূত করিবার তাঁহার এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে।

এ সর্পটি লোটার মধ্যে লইয়া যখন তারকেশ্বরে আসিলেন,তখন ইহা দেখিতে মাধবগিরি, রামগিরি যাত্রী ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন ও ইহা সকলকে দেখান হইল। ইহা দেখিয়াই অনেকেই বলিলেন যে, ইহা অতিশয় বিষধর সর্প, কেহ কেহ বলিলেন যে, এটি গোক্ষুর সাপের বিষ যেরূপ তীব্র ইহার একটির বিষ সেরূপ। এজন্য সকলেই ইহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। গুরুদেব বলিলেন, যে যখন উহাকে ধরিয়া আনিয়াছেন, তখন ৫।৭ দিন রাখিবার পর ও দুধ খাওয়াইয়া তবে ছাড়িয়া দিবেন। ইহাকে হাঁড়ীতে রাখা হইল ও প্রতি দিন ইহাকে লইয়া খেলা ও দুধ খাওয়ান চলিতে লাগিল। একদিন পূর্ব্বোক্ত বিশ্বেশ্বর ঘাটোয়ারির নিকট হইতে খানিকটা দুধ লইয়া উহাকে খাওয়াইবার জন্য বাহিরে আনিলেন ও যেমন দুধ খাওয়াইতে যাইবেন অমনি এ সাপটি গুরুদেবের অঙ্গুলীতে দংশন করিল। এরূপ করিতেই ইহাকে তাড়াতাড়ি হাঁড়ীতে পুরিয়া ফেলিলেন ও তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষতস্থানে নিজের মন্ত্রসিদ্ধ বিভূতি লাগাইয়া দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মোহান্ত ও রামগিরি চলিয়া আসিলেন ও দংশন দেখিয়া বড়ই ভীত হইলেন। মাধবগিরি ওঝা ডাকিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু মহারাজ বলিলেন যে, কোন চিন্তা নাই। যে বিভূতি লাগাইয়াছেন তাহাতে কিছুই হইবে না। কিছুক্ষণ পরে অঙ্গুলির খানিকটা নীলবর্ণ হইল ও অধিক পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে শরীরে যে ভাব হয় সেইমত হইল। কিন্তু আর কিছুই হইল না। ২।৩ দিন পরে এ নীলবর্ণটা ক্রমে মিলাইয়া গেল।

এ অমোঘ বিভূতির কি দৈবশক্তি তাহা আমরা জানি না। তবে পূর্ব্বে গৌরী শঙ্কর মহারাজের জীবনীতে ইহার যে আশ্চর্য্য ব্যাধি মোচন করিবার শক্তি আছে তাহা বলিয়াছি।

এই তারকেশ্বরে অবস্থান সময়ের আর এ কটী গল্প শুনাইব। ইহা আর এক

বারের ঘটনা। প্রায় ১ বৎসর হইতে মহারাজের "চৌঠা" ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছিল। চৌঠা বলিবার এই কারণ যে, একদিন জ্বর হইবার পর মধ্যে দুই দিন ভাল থাকিয়া পুনরায় চতুর্থদিনে কম্প দিয়া জ্বর আসিত। ইহা নানারূপ ঔষধি খাইয়াও বন্ধ হয় নাই, এবং এ অবস্থায় পর্য্যটনও বন্ধ রাখেন নাই। তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে,যে দিন জ্বর আসিবার পালা পড়িত সে দিন সকাল সকাল ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া জ্বরের প্রতীক্ষা করিতেন। যেমনি কম্প দিয়া জ্বর আসিত, অমনি আসন স্কন্ধে লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। জ্বরের বেগের সহিত চলনের বেগ সংযুক্ত করিতেন; পরিশেষে যখন জ্বর একেবারে তাঁহাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিত, তখন পথিপার্শ্বে খানিকটা পড়িয়া থাকিতেন। পরে বেশ উপশম হইলে, পুনরায় চলিতেন। এরূপ অবস্থায় তারকেশ্বরে পৌঁছিয়া রামগিরি স্বামীর সহিত মিলিত হন। এ স্বামীজীর একটী বালক সেবক ছিল। তাহার সহিত মহারাজের প্রায়ই রঙ্গরসের সহিত বার্ত্তালাপ হইত। এ ছেলেটি কয়েকদিন হইতে পেটের অসুখে বড়ই ভুগিতেছিল; কিছুতেই আরাম হইতেছিল না। মহারাজের যে দিন জ্বর আসিবার পালা সে দিন উভয়ে পুষ্করিণীতে মিলিত হন ও রঙ্গরস চলিতে থাকে। বালকটি ঠাট্টা করিয়া বলিল যে, তাহার যাহা হইয়াছে (অর্থাৎ পেটের অসুখ) তাহা আজ ব্রহ্মচারীকে দিয়া দিতেছে। মহারাজও ঠাট্টা করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, তাঁহার আজ যাহা হইবার পালা (অর্থাৎ চৌঠা জ্বর) তাহা তাহাকে দিয়া দিলেন। এই বলিবার পর মহারাজ জলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক পুকুরে পড়িয়া স্নান করিলেন ও পরে উভয়ে বাসায় ফিরিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ দিন মহারাজের আর জ্বর হইল না, কিন্তু ঐ বালকটির জ্বর আসিল। সে ত স্বামীজীর নিকট অনুযোগ করিল যে,ব্রহ্মচারীজী তাহার উপর জ্বর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। বালকটির পেটের অসুখ অবশ্যই ছাড়িল ও মহারাজের কিছুই হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বালকটির চৌঠা জ্বরই দেখা দিল। কয়েকবার ভুগিবার পর গুরুদেবই ঔষধ দিয়া তাহাকে আরাম করিলেন।

এ গল্পটি সামান্য, তবে ইহা হইতে বুঝিবেন যে,জ্বরে ভুগিয়াও গুরুদেব পর্য্যটন হইতে বিরত হন নাই। জ্বরের যে একটী ভোগ আছে, তাহা ঔষধেও নিবারণ করিতে পারে না। যে ঔষধ প্রয়োগে নিজের কিছু হয় নাই, তাহাতে বালকটি সুস্থ হইয়াছিল। এ ভোগ জানা নাই বলিয়াই ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিতে নাই, সময়ে সময়ে মহাজনদিগের বাক্যই প্রবল ভাবে কার্য্য করে ও ব্যাধি একশরীর হইতে অন্য শরীরে চালিত হয়।

মানসী।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

ওরে মোর মানসীসুন্দরী! হৃদয়ের নবীন প্রেমিকা!
জীবনের এ রঙ্গমঞ্চে হ'য়ে মোর প্রথম নায়িকা—
কতগীত শোনাতে আমায়। আজি এই বিরহ-সন্ধ্যায়
ক্ষীণধ্বনি তার এখনও বাজিতেছে জীবনের তৃষিত নিশায়।
নাহি পড়ে মনে কোন দিন প্রাতে কিম্বা সাঁঝে,
এসেছিলে তুমি মোর এ তপ্ত হৃদয়ের মাঝে—
লজ্জানত নববধূ বেশে। সেই হ'তে দীর্ঘদিন ধরে,
ভাসিয়াছি শুধু মোরা অন্তহীন প্রেমের সাগরে।
ডুবে যথা রবি—লয়ে তার পরিশ্রান্ত আরক্ত কপোল,
ভেসে উঠে আকাশের বুকে তারকার কটাক্ষ বিভোল,
নামে যথা ধরণীর পরে তমসার ঘন অন্ধকার,
বায়ুভরে এলাইয়া কুঞ্চিত তার কৃষ্ণ কেশভার—
সেইমত নিভে গেল জীবনের দীপ অকস্মাৎ—
সহিতে নারিলে বুঝি কৃতান্তের নির্ম্মম আঘাত।
একান্ত পরের মত চলে গেলে দূর-দূরান্তরে
কিন্তু জেন, মিলনের নাহি হয় শেষ ধরণীর পরে—
মৃত্যু-ব্যবধানে। সঙ্গীহীনা কাতরা চকোরী,
যেইমত নিশিদিন উচ্চৈঃস্বরে অশ্রান্ত ফুকারী
চেয়ে থাকে ঐ নীলনভে—মিলনের তরে,
সেইরূপ আমি, তোমারে লভিব ব'লে মরণের পরে
বসে আছি দূর শূন্যে চেয়ে। কে বলে সুখের সংসার?
তোমা বিনা হেরি, চতুর্দ্দিক হ'তে উঠে তীব্র হাহাকার,
ভেদিয়া মোর হৃদয়ের দ্বার। শুধু পড়ে মনে,
কত সন্ধ্যা কাটায়েছি নদীতীরে বসে দুইজনে।
তীব্র বেগে ছুটে নদী কাঁপায়ে তীর আপনার গানে
দেখি তার নাহি সয়—শুধু ধায় অসীমের পানে।

মুকুলিত বকুলের ডালে প্রেমভাষে রত দুই কপোত কপোতী,
পূর্ণকলা চন্দ্রে হেরি উঠেছিল আবেগেতে মাতি।
হে সুন্দরি! কতদিন আধ-অন্ধকারে বসি বাতায়নপরে,
শুনেছিনু বিরহীর মিলন-সঙ্গীত সান্ধ্যবায়ু ভরে।
প্রত্যহ নিশার, কখন বা অভিমানে যেতে তুমি বহুদূর স'রে,
কখন কহিতে তুমি আদরেতে কণ্ঠমোর ধরে—
অগণিত প্রেমের প্রলাপ। পড়ে নাকি মনে!
সে দিনের কথা?—যে দিন চাঁদিমা রাতে বসিরা উদ্যানে
"প্রাণের দেবতা" বলি দিলে মালা গলেতে আমার
সাদরে লইনু আমি প্রাণসমা প্রেয়সীর প্রীতি-উপহার।
আজিও সেই প্রণয়ের মালা স্বপ্নঘোরে বক্ষে ধরি চেপে
নিশীথরাতে পদধ্বনি শুনে বুকটা যেন আশায় ওঠে কেঁপে।
ওই দূরে আকাশের সঙ্কীর্ণ দুয়ার ঘন নীলাম্বরে ঢাকা
বারেকের তরে নাহি চাও ফিরে—একটুও কি নাহি আছে ফাঁকা?
চঞ্চলা চপলার চকিত চাহনি—যবে করে ছিন্ন আবরণ
তখনও কি পড়ে নাকো মনে—এতই কি হয় বিস্মরণ?
চিরপ্রিয়া দয়িতার লাগি কত যাত্রী গেল কত পথে
দুস্তর সাগর পারে—অভ্রভেদী দুর্গম পর্ব্বতে।
নাহি জানি সে কোন্ সুদূরের অজানা প্রবাসে
যাপিতেছ দিবস শর্ব্বরী অনাদৃতা বিরহিণী বেশে।
প্রণয়ের প্রদীপের শিখা বুঝি এবে নির্ব্বাপিত প্রায়?
বিবাহের বেদ মন্ত্র আর বুঝি নাহি শোনা যায়?
স্নেহ নাই, মায়া নাই—নাই কি তব স্বামী-পরিবার?
স্বর্গের মাঝে—নাই বুঝি বন্ধনের কোন কারাগার?
ধরা-মরুর কোন্ এক নিভৃত প্রান্তরে করিতেছি বাস
তাই ব'লে তুমি যেন করিওনা ক্রূর পরিহাস।
না—না, ভ্রম ইহা মম। তুমি যে গো মানসী আমার
চিতা-ভস্ম সনে মিলনের প্রথম রাগিণী বাজিবে আবার।
বাসরের নহে মৃদু দীপ শ্মশানের শিখা জ্বলে আজ—
তব বক্ষ-লগ্ন হ'য়ে ঘুচাইব যত মোর বন্ধনের লাজ।
এতদিনে ধরার মাঝারে ফুরায়েছে সংসারের কাজ।
মানসী আমার, এসো—এসো—খুলে ফেল বিরহিণী-সাজ॥

কবির বিভ্রাট ।

(প্রহসন)

লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল দাস বি, এল।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রস্তাবনা ।

সূত্রধারীগণ ।

গীত ।

আজ তুলব ধ'রে চোখের পরে নূতনতর দৃশ্য ।
অভ্যাগত আপনারা সব, দোহাই থামান গল্পগুজব,
শীতকরে ত' চা খান, সরবতে যাবে গ্রীষ্ম ।
আর আছেই আছেন কতকগুলি ছোট বড় অন্ততঃ মামুলি,
আপনাদের মধ্যে কবি, যাঁদের ছন্দে ফোটে বুলি ;
কারণ বাঙ্গলার এই মাটি ধুলি হোক্‌না যতই নিঃস্ব,
ফলিয়ে দেদার কাব্য-শস্য নিচ্ছে জিতে বিশ্ব ।
কিন্তু কবিদের মধ্যে সকলে কি খাঁটী ?—তা নয়, অনেক মেকী,
কেউ বা পাগল, কেউ বা ছাগল, বল্‌ব না আর কেউ যে কি,
তবে, দেখ্‌তে পাবেন ব্যাপার খানা, এই বাঙ্গালা-দেশেই দেখা শোনা
যেথা ইয়ং বঙ্গ সভ্য ভব্য নব্য-তন্ত্র-শিষ্য ।

প্রথম দৃশ্য ।

নৃপেন্দ্রনাথের কক্ষ ।

নৃপেন্দ্র । (কবিত্বঘোরে মুগ্ধ এইরূপ ভাব প্রদর্শন) না, কিছুতেই আর বাগাতে পাচ্ছিনে। Inspiration এর মুখে যতটুকু লেখা যায়, তারপরে আর warmth থাকে না।

(শশিভূষণের প্রবেশ)

শশি। কি গো কবি, কাব্য-লক্ষ্মীর সন্ধান পেলে ? বাণীর বরপুত্র তোমারা ভাই ! আমরা নেহাৎ অপদার্থ ! আমি যদি তোমার একটুকু ক্ষমতা পেতুম !—

নৃপেন্দ্র। (গর্ব্বোল্লাসে) তা হ'লে কি করতে, শশি ? আর আমরাই বা কি খুব সুখে আছি হে ? তা নয়—আমরা Inspiration এর দাস। এই দেখ না—এই কয়েক ছত্র বেরিয়ে আর বেরুচ্ছে না—

রবির করে তাপিত ধরা, নিঁদের সুরা আঁখিতে ঝরা,
অলস হয়ে তন্দ্রামাঝে আপনি ডুবে যাই।
ছায়ালু ঘন নীপের শাখে কিসের লাগি পাপিয়া ডাকে ?
চিত্তাকাশে গানের যেন রেশের রেখা পাই।
বেড়ায় ভেসে গানের সুর, ব্যাকুল করে কোন সুদূর,
শেফালি-বাসে মূরছি' ধরা আবেশে যেন তন্দ্রাতুর,

* * * * * * *

এখনও শেষ করতে পারিনি।

শশি। বা—সুন্দর হয়েছে ! তোমার word painting কি চমৎকার ভাই ! সত্য সত্যই আমার যেন তন্দ্রা এসেছিল। আমি বলতে পারি, কালে তুমি দেশের সব চেয়ে বড় কবি হবে। কবির ভাই বলে আমি গর্ব্ব করতে পারি।

নৃপেন্দ্র। নাও, নাও, শশি—এখনও গর্ব্ব করবার সময় হয়নি। আমার "দীপালি" ছাপাবার কি উপায় এখন করি বল, ভাই !

শশি। আরও কিছুদিন বাদে ছাপিও, ভাই। এখন কাগজের যে দর চড়ে গেছে ! তুমি ত আর সংসারের কিছুই ধার ধার না। সব বোঝা আমাকেই বইতে হয়। তা তুমি কবি মানুষ, তোমার সাত খুন মাপ। দেশ থেকে খাজনা পত্তর যা আসে তাতে কোন উপায়ে সংসার চলে যায়। মাত্র তিনটি প্রাণী বলেই এতদিন পর্য্যন্ত টিকে আছি দাদা !

নৃপেন্দ্র। দেখত' শশি, এর উপর মাসিমা আমাকে আবার বিয়ে করতে বলেন। বিয়ে কর্‌লে পুষ্যি পাল্‌ব কি করে ? তার উপর শূয়োরের বাচ্চার মত বছর বছর ছানা বিয়োতে আরম্ভ করলে ত' গেছি ! Rubbish !—আমার কল্পনা-কুঞ্জে আগুন লাগাতে বল নাকি ?

বিয়ে একটা Formalism—শুধু কতকগুলো বন্ধনের মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলে সমাজের চাবুক সহ্য করা। আমার কল্পনাময়ীকে ছেড়ে বিয়ে ?—

শশি। তোমার কল্পনাময়ীকে ছেড়ে বিয়ে কর্‌তে বলিনি, নেপু। বিয়ে কর্‌লে তোমারই মঙ্গল হবে। শেখরবাবুর ঐ একটি মেয়ে! বিষয় আশয় সবই পাবে। মাসি মা বল্‌লেন, ললিতা পরমা সুন্দরী। ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে। শেখরবাবুও রাজি আছেন।

নৃপেন্দ্র। শশি, শেষকালে তুমিও আমায় জ্বালাতে সুরু করলে! মাসিমা অষ্ট প্রহর জ্বালাচ্ছেন। শুধু এক ধুয়ো ধরেছেন, ললিতাকে বিয়ে কর্। আমি সব ছেড়ে কেবল কবিতা নিয়ে পড়ে আছি! এও তোমাদের সহ্য হয় না? এমন কর্‌লে আমি বনে-জঙ্গলে চলে যাব—সেখানে শুধু চাঁদের আলো, পাখীর গান, ভোরের হাওয়া, ফুলের গন্ধ! তোমাদের অত্যাচার সহ্য কর্‌তে হবে না।

শশি। ছি, তুমি বনে যাবে কেন? তুমি কবিতা লিখে বঙ্গসাহিতের মহারথী হও! তোমার ভাই বলে আমি গর্ব্ব কর্‌তে পার্‌ব। কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে তোমার প্রতিভা নষ্ট হতে দেব না। জানই ত'—দারিদ্র্যে কত প্রতিভা অকালে নষ্ট হয়ে গেছে। Chatterton এর মত বাঙ্গালা দেশেও অনেকে শুকিয়ে মরে।

নৃপেন্দ্র। তাই বলে কি সকলে যা করে তাই কর্‌তে হবে? বড়লোকের পায়ে নিজেকে বিক্রি করে কেনা গোলাম হয়ে থাক্‌তে হবে। Poets are above the common herd, শেলি, কিটস্ এর মত আমিও Privilege Claim করি। বিয়ে আমি কিছুতেই কর্‌ব না। আমার কল্পনার মোহিনী মূর্ত্তিকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে কিছুতেই ভাঙ্গ্‌তে পারিনে। তুমি পাগল হয়েছ শশি!—না, কিছুতেই না!

(রাইচরণের প্রবেশ)

রাইচরণ। (তোতলা) বাবু, কমলকন্তবাবু আইচেন।

নৃপেন্দ্র। দূর ব্যাটা, তোর তোত্‌লামি আর সহ্য হয় না। যা, দূর হয়ে যা। (বিরক্তভাব) হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেলে! দু-দণ্ড যে অনাবিল শান্তিতে বাণীর আরাধনা কর্‌ব, তারও যো নেই। Inspiration আস্‌বে কোত্থেকে?

"আমরা কিছু জানি না বলিয়াই কিছুই বলি নাই।"

"তবে কি সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল?"

"স্মৃতিলিপিতে রহিয়াছে—"সে একজন কবি ছিল। আপনারা তাহার কবিতাসম্বন্ধে কিছুই জানেন না?"

"তাহার কবিতাসম্বন্ধে কখনও কিছু শুনিয়াছি বলিয়াও তো আমাদের মনে হয় না।"

"আমার দৃষ্টি অস্পষ্ট; তাহার নামের নীচে কিছু কি ক্ষোদিত নাই?"

একজন পার্শ্বচর ভিত্তি-ভূমি-তলে নত-জানু হইয়া অতি কষ্টেবলিল,—"এখানে পূর্ব্বে কিছু ছিল, কিন্তু কালক্রমে তাহা মুছিয়া গেছে—আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন!" এই বলিয়া সে ক্ষুদ্র শিশুর মত আপনার অঙ্গুলি-সঞ্চারে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে লাগিল :

সে—সুধু—চেয়েছে—"সু-উচ্চ—নিয়তি"

সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল, "ইহাই শেষ। ওঃ কি ধুলাই আমার জানু তলে সঞ্চিত হইয়াছে!"

বৃদ্ধ কহিল, "সে অবশ্যই অতি মধুর গাহিয়াছে।"

তাহারা তাচ্ছল্যভরে বলিল, "তা হইলেও হইতে পারে!"

বৃদ্ধ ঈষৎ বিষাদহাসি হাসিয়া বলিল, "কিন্তু, মহাশয়গণ, আপনারাই বোধ হয় সেই বংশপরম্পরা যাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া সে তাহার খ্যাতির দাবী করিয়াছিল। তাহার আপনার যুগ কাব্য-কলার আদর করে নাই, কিন্তু আপনারা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিবেন বলিয়াই সে বিশ্বাসভরে চিরনিদ্রা গিয়াছে।"

তাহারা উচ্চহাস্যে প্রত্যুত্তর করিল, "যদি তাহাই হয়, তবে সে-বিশ্বাস নাই। মৃত্যু ত' অতি নির্দ্দয়ক। সে জানতেও পারিবে না, আমরা তাহাকে প্রাপ্য দিয়াছি কি না, অতি অল্প কবিই মৃত্যুর পরে খ্যাতি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে ভালরূপেই জানি।" এই বলিয়া তাহারা অগ্রসর হইল।

কিছুদূরে থামিলে বৃদ্ধ কহিল, "ইহা কোন সাধু সৈনিকের স্মৃতিস্তূপ বলিয়া বোধ হয়। আপনারা সে কোন্ কোন্ যুদ্ধে বিজয়লাভের সহায়তা করিয়াছিল, কিছু অবগত আছেন?"

"সে কোন জয়লাভে সহায়তা না করিয়াও থাকিতে পারে। হয়ত সে ভীরু কাপুরুষ ছিল। আমরা জানিব কিরূপে? স্মৃতিসিপি প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে! সমাধিক্ষেত্রের এই ধূলা তো সৈনিকে সৈনিকে ভরা দেখিতেছি।"

পুনরায় তাহারা অগ্রসর হইল।

তৃতীয় স্তম্ভসম্মুখে থামিয়া গেলে, বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহার ধর্ম্মবাণী এখন আর কেহ পড়িয়া থাকে, আপনারা জানেন ?"

তাহারা উগ্রকণ্ঠে কহিল, "তাহার ধর্ম্মবাণী পড়িয়া থাকে! আপনি যে দেশ হইতে আসিতেছেন, সে খানে কয়টা ধর্ম্মবাণী অধীত হয় ? দেখুন, আজ কতকাল হইল সে মরিয়াছে। জগৎ তাহার পর্য্যুষিত ধর্ম্মোপদেশ পড়িয়া ভাবিয়া কি এমন উপকৃত হইবে ?"

বৃদ্ধ মিনতিস্বরে কহিল, "সে যে সৎপুরুষ ছিল, তাহা পড়িয়া অন্ততঃ এ আনন্দটুকুও পাওয়া যায় না ?"

"উত্তম; কিন্তু সে যে সৎ ছিল, তাহার সত্তাই তাহায় আত্মপুরস্কার নহে কি ?"

"ইহার জন্য হয় ত সে বিস্মৃতি হইতে নিষ্কৃতিলাভের আকাঙ্ক্ষাও করিয়া থাকিতে পারে।"

"স্বাভাবিক; কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া কিছু শোনা যায় নাই।"

"আমাদের সাধারণ মানব-জীবনে তাহার সৌন্দর্য্য-সাধুতা ও সৎপ্রকৃতির স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, এ কথা ভাবিতেও কি দুঃখ বোধ হয় না ? যদি একাধারে একই অবয়ব ও চরিত্রে—সৌন্দর্য্য-সাধুতা-সত্তার সংযোগ হয়, তাহাহইলে আপনারা বলুন দেখি সেই দুর্ল্লভ মহাপুরুষকে সাধারণ ভাগ্য হইতে দূরে রাখিয়া শাশ্বত করা উচিত কি না ?"

"নিঃসন্দেহে।"

বৃদ্ধ দীপ্ত কটাক্ষে তাহাদের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া [illegible]তে লাগিল—"মহাশয়গণ, এই প্রকাণ্ড সমাধিপ্রান্তরে এমন একটি সমাধিস্তম্ভও নাই কি ? যাহার স্মৃতি আজ পর্য্যন্তও বেশ জীবন্ত আছে ?"

"তবে এ দিকে আসুন!" এই বলিয়া তাহারা শশব্যস্তে অগ্রসর হইয়া বলিল, "সমাধিক্ষেত্রে সহস্র সমাধিস্তম্ভ প্রভৃতি হইতে ইহাই উৎকৃষ্ট! ইহাকে যে একবার দেখিবে সে আর ভুলিতে পারে না।"

"হাঁ, হাঁ।" বৃদ্ধ এদিক্ ওদিক্ করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে একটা জীর্ণজরার পুলকস্পন্দন বহিয়া গেল।

"মহাশয়গণ, যাহার উদ্দেশ্যে এ স্মৃতিশিলা গঠিত হইয়াছে—আপনারা বলিলেন

না তাহার স্মৃতি ইহাতে বিজড়িত আছে ?"

"উভয়ই খ্যাত। স্ত্রীলোকটীর কাহিনী ও তাহার সমাধিশিলা কোনদিন ভুলিবার নহে। ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব।"

বৃদ্ধ কয়েকবার উকিঝুঁকি দিয়া তাঁহার হস্তস্থিত দণ্ড ভূমিতলে রাখিয়া বসিয়া পড়িল—"মহাশয়গণ, এই সমাধিস্তম্ভের সঙ্গে কোন্ কাহিনী ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, ইহা এত বিখ্যাত হইবে কিছুই জানিলাম না তো।"

"বিচার করিয়া দেখুন!" একটি দল, বিষাদবিস্ফারিত কণ্ঠে নিগূঢ় রোমাঞ্চকর দৃষ্টিতে, বাধা দিয়া বলিল, "জনশ্রুতি, কোনব্যক্তি এই স্ত্রীলোকটিকে ভালবাসিত বলিয়া তাহার স্মৃতিকল্পে ইহা নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছে। সে পরমসুন্দরী ছিল, কাজেই তাহার সমাধিশিলাও অতি সুন্দর করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার হৃদয় এত বীভৎস ছিল যে, ইহার নির্ম্মাতা তাহার অসৎস্মৃতির উদ্দেশ্যে একখানি অভিসম্পাত লিখিয়া ইহার অন্তর্ভাগে লোকচক্ষের অন্তরালে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকে, হৃদয় তাহার অবর্ণনীয় মিথ্যায় পরিপূর্ণ ছিল, আর রূপে স্ত্রীজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিতা ছিল। অতএব ইহার অন্তর্নিহিত অভিশাপ তাহার প্রকৃতির পরিচয় দিতেছে, আর এই সুন্দর বহির্দ্দেশ তাহার কুরূপ নহে, তাহার প্রকৃতিকেও বিদ্রূপ করিতেছে। ইহাই সত্য কাহিনী, যেহেতু হাজার হাজার লোক আজ ইহাই বলিতেছে, আর এইজন্যই এই সমাধিশিলা যতদিন থাকিবে ততদিন কেহ স্ত্রীলোকটীকে ভুলিবে না, ওহোআরো, বহুযুগ ভুলিবে না—সুধু তাহার বীভৎসতার জন্য নহে—

বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিল। তাহার দেহভার ধূলিতলে এলাইয়া পড়িল। বহুক্ষণ পরে শ্বাস টানিয়া সে বলিল,—"ভগবন্!" আরও উত্তেজনা লইয়া বলিল—"মহাশয়গণ! বলুন, বলুন, কে আপনারা এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিরূপে—কখন—কোথায়—ইহার সূত্রপাত হইল—বলুন—বলুন আমাকে।"

"আমরা পারি না। আমরা শুনিয়াছি ইহা অনেকে বলিয়া থাকে; অনেকে অনেক রূপ বলে।"

"আপনারা বিশ্বাস করেন—বিশ্বাস করেন—ইহা সত্য বলিয়া ?"

"আমরা সকলেই জানি ইহা সত্য; আপনি ইহা বিশ্বাস করেন না কি ?"

"আমি ইহা ভুলিতে পারি না!"—বৃদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে বলিল,—"তবে চলুন—এ করুণস্থলে আর নহে—চলুন।"

রাত্রি ঘনাইয়া আসিতেছিল। সকলে ফিরিয়া গেলে সে একাকী অজ্ঞাতে আসিয়া প্রত্যাগত তীর্থযাত্রীরূপে সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে গিয়া বসিল। অস্ফুট ক্লান্ত স্বরে সে বলিল,—"সকল লোকে সেই এক কথাই আমাকে বলে। অন্তর্নিহিত স্মৃতি-লিপিই যত বিভ্রাট ঘটাইল। নহিলে, তাহার স্মৃতিসূর্য্যের পূর্ণবিকাশ এত দিনে দেখা যাইত। আমার দুঃসাহসী মুর্খতা যে, লোকে আমার শ্রেষ্ঠ কৃতি বুঝিতে পারিবে যখন তাহারা সেই পরমকারুর সুন্দর কলাকৌশলের অন্তর্গূঢ় অংশ এত ভুল বুঝে ও অননুভূত সৎ ও সত্যকে মন্দ অভিশাপে পরিণত করিয়া থাকে।

রাত্রি হইয়াছে। সে ইহারই প্রতীক্ষায় ছিল। ক্রমশঃ অন্ধকারগর্ভে

ঘোর ঝটিকা অলোড়িত হইতে লাগিল; মৃত ব্যক্তিগণের শান্ত শ্বেত বক্ষেও ঝড়ের দোলা লাগিতেছিল। তরঙ্গায়িত সমাধিশ্রেণীর উপর বাতাস সহস্র দুরন্ত পদক্ষেপে অক্রুরন্ত নৃত্য করিয়া ফিরিতেছিল। শূন্যে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা প্রকম্পিত নক্ষত্রগণের উপর দিয়া পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া ভাসিতেছিল।

পার্থিব সকল স্থলমধ্যে, সমাধিক্ষেত্রের মত পঞ্চভূতের এরূপ ভয়াবহ অনৈক্যের অবসান আর কোথা আছে? বহ তবে, প্রভঞ্জন! বৃক্ষবিটপী উন্মূলিত কর! বহ বন্যা! ধরাশায়ী মৃতগণের পাণ্ডুরমুখ তোমার সলিলে সিক্ত কর! ওগো মেঘ! বিদ্যুৎকলা লইয়া ভাঙ্গিয়া পড় তোমরা, এ বিশ্ব প্রকম্পিত প্রজ্জ্বলিত কর! কিন্তু কুন্তলের একগাছি কেশও কাঁপিল না বা আলুথালু হইল না। কোন মৃতব্যক্তিই বাহু বাড়াইয়া আর্দ্র হইবার ভয়ে তাহার উত্তরীয়খণ্ড টানিয়া মুখে ঢাকা দিল না। কোন কর্ণই আকাশকাটা বজ্রঘোষ শুনিতে পাইল না, বিদ্যুৎ কলার চকমকিতে একটি পক্ষ্মও কাঁপিল না।

কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি কেহ সেই নিশীথ-দৃশ্যে উপস্থিত থাকিত তবে হয়ত কোন বিদ্যুৎঝলক ঐ বৃদ্ধলোকটীকে নিমেষের জন্য ব্যক্ত করিয়া দুর্দ্দম-দুঃপূর্ণ প্রচণ্ডতাময় সহানুভূতিশীল একখানি ভয়াল মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া যাইত তাহার সুদীর্ঘ পলিতকেশ ও দীর্ঘতর শুভ্রশ্মশ্রু বাহিরের গর্জ্জিত ঝঞ্ঝায় প্রবাহিত হইতেছিল। তাহার বাহুদ্বয় উলঙ্গ বক্ষপার্শ্বে একটী গুরু মার্ত্তুলোপরি আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার পাণ্ডু মুখমণ্ডলে হতাশার দারুণ স্পর্শকালিমা পড়িয়াছে। ক্ষণপরে, বজ্রনাদে তাহার মার্ত্তুল সমাধিস্তম্ভের উপর ঠিক্‌রিয়া পড়িয়া গেল। বজ্রের উপর বজ্র, ঝঞ্ঝার উপর ঝঞ্ঝা। নতজানু হইয়া সে সেই ধ্বংসস্তূপের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় সমাধিস্তম্ভের অন্তঃস্থলে কিছু খুঁজিতেছিল

যেন আর একটী বিদ্যুৎকলা হইলেই তাহাকে বলিয়া দিত তাহার অলঙ্ঘনীয় স্মৃতি-লিপি ধ্বংসোচ্ছেদে পরিণত হইয়াছে।*

পাগল।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রাবণ মাস। প্রকৃতি-মণ্ডলী নব-বারিধারা সংযোগে সরসে, সৌরভে, গৌরবে নয়ন আকর্ষণ করিতেছে। দুই একদিন বৃষ্টিপাত হয় নাই। মেঘমালা বায়ু সংযোগে প্রক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণ হইতে উত্তরে সঞ্চালিত হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন তাহারা পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য দ্রুতপদে গমন করিতেছে, নগাধিরাজের অনুমতি লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বঙ্গ জননীর অঙ্গে জল সেচন করিয়া তাঁহাকে সুজলা সুফলা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে। প্রাতঃকাল, সূর্য্যদেব মেঘের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে দেখা দিতেছেন। সমীরণ উচ্ছৃঙ্খল হইলেও সুখস্পর্শ। আমরা দুই বন্ধুতে গ্রামের প্রান্তভাগে অবস্থিত প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী এক বটবৃক্ষতলে সমীর উপভোগ করিতেছি। আমাদের সম্মুখে প্রশস্ত ধান্যক্ষেত্র। তাহার পরই রেলপথ। রেলগাড়ী সকল হুস্ হুস্ শব্দে সগর্ব্বে যাতায়াত করিতেছে। আমরা দেখিলাম অদূরে একটী লোক আসিতেছে। তাহার পরিধান ছিন্ন গেরুয়া বসন, কপালে সিন্দূর, কর্ণে দুই বড় বড় ধুতুরা ফুল, মস্তকে পক্ক ফেশ মধ্যে কয়েকটী লাল করবীফুল। লোকটী আমাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমার সঙ্গী তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজ বেশ সেজেছ, যাবে কোথায়?" লোকটী উত্তর করিল, "একটা কথার উত্তর দেওয়া যায় মা, তাতে দুটো প্রশ্ন।" আমি লোকটীর মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম, বেশ ভূষা পাগলের ন্যায়, কিন্তু নয়ন প্রসন্ন ও জোতির্ম্ময়, সহাস্যবদন, দন্ত সকলে ও ভাব ভঙ্গিতে বিকৃত-মস্তিষ্কের লক্ষণ কিছুমাত্র দেখা যায় না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবাজী কোথা থেকে আস্‌ছেন, যাবেন কোথা?" আগন্তুক উচ্চ হাস্যে উত্তর

* James Lane Allen,

করিলেন, "বাবা, ঐ দুটীই জানিনা।" আমার বন্ধুটী বলিলেন, "লোকটার মাথা খারাপ, এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে, বনের মাঝে, একটী শিব-মন্দির আছে, লোকটা রাত্রিকালে সেই খানে পড়ে থাকে, দিনের বেলায় এখান সেখান করে বেড়ায়, পাগল।" আগন্তুক কেবল একটু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হুঁ" আমার সঙ্গীটী কহিলেন, "লোকটীর একটী গুণ আছে, বেশ গান কর্ত্তে পারে, কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট।" আমি বলিলাম, "বাবাজী! একটী গান করুন।" লোকটি বলিলেন, "আবার গান!" আমি বলিলাম, "দেখুন বাবা সংসারে কেবল দুঃখ সার করে বসে থাকলে কেবল দুঃখই আসে, আনন্দের চেষ্টা কর্ত্তে হয়, আনন্দ করুন।" লোকটী আমাকে কিছু না বলিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাউলের সুরে গাহিলেন,—

তোমরা কেউ নিশনারে ভাই,
(মরি ওরে পাগলের সনে)
উড়িষ্যাতে একটা পাগল জগন্নাথ গোঁসাই,
তথায় চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়!
(হরি বলে ব্রাহ্মণেতে খায়)
কৈলাসেতে আর এক পাগল পঞ্চানন গোঁসাই,
সে যে ষাড়ের উপর চড়ে বেড়ায় গায়ে মেখে ছাই।
(হরি বলে গায়ে মেখে ছাই)
বৃন্দাবনে আর এক পাগল নন্দের কানাই,
সে যে কোটাল সেজে বসে আছে রাজা করে রাই॥

গান শুনিয়া আমি বলিলাম, বেশ গান, আর একটি গান করুন। আপনার স্বরটী অতি মিষ্ট। আগন্তুক কহিলেন, "আবার গান! অনেক গান শুন্‌তে নাই, অনেক কথা কইতে নাই, অনেক ভাবনা ভাব্‌তে নাই। আর আমার এখানে থাকা হলনা।" এই বলিয়া লোকটী দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন, অনেক অনুনয় করিলাম, তথাপি আমাদের দিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। আমি বন্ধুকে বলিলাম, "দেখ, লোকটী পাগল নয়, পাগলের বেশে থাকে। অনেক সাধু এই রূপ গুপ্তভাবে অবস্থান করেন। লোকটী যে সব কথা বল্‌লেন তারএকটীও অসার নয়।" ইহার পর আমরা গৃহে প্রত্যাগত হইলাম। লোকটীর একটী কথা

"অনেক ভাবনা ভাব্‌তে নাই" আমার বড় মনে লাগিল। ভাবিলাম বাস্তবিক অনেক চিন্তাই দুঃখের কারণ। সংসারীকে বহুবিধ চিন্তায় জড়ীভূত হইতে হয় বলিয়া তাহার ভাগ্যে যথার্থ সুখ জুটে না। এক বিষয়ে চিত্তের দৃঢ় সন্নিবেশকে যোগ বলে। ভগবান্ পতঞ্জলি মুনি পাতঞ্জল-দর্শনে বলিয়াছেন, "যোগঃ চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ"। চিত্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ। চিত্তের অবস্থা বিশেষকে চিত্তবৃত্তি বলে। চিত্তের অবস্থা বিবিধ প্রকার। যোগশাস্ত্রে এই বিবিধ অবস্থা পাঁচ অংশে বিভক্ত, যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা আর স্মৃতি। সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের বশবর্ত্তী সমুদয় জগৎ। চিত্তবৃত্তিসকল এই ত্রিবিধ গুণের বশবর্ত্তী। রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি এক চিন্তায় অভিভূত হইলে বিঘ্ন ও উন্মাদাদি ব্যাধির সম্ভাবনা। এই জন্য পতঞ্জলি মুনি প্রথমে প্রায়শ্চিত্ত, যজ্ঞ, পূজা, হোম প্রভৃতি দ্বারা চিত্তকে সত্ত্বগুণাবলম্বী করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিবার উপদেশ দিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধি হইলে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ করিয়া দেহমধ্যে ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব-ময় আত্মারূপী পরমেশ্বরের চিন্তায় যোগাবলম্বন করিবার বিধান আছে। যোগ-দ্বারাই জগতের স্বরূপত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় ও সচ্চিদানন্দ ভাব আইসে। এইগুলি কথায় বলা অতি সহজ, কিন্তু কাজে করা অতি শক্ত। আমাদের মত কর্ম্মহীন লোকের ইহা কল্পনা মাত্র, তাই সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন "ঘুড়ী লক্ষে দুটো একটা কাটে, হেসে দেন মা হাত চাপড়ী।" যাহা হউক, সংসার বন্ধন মুক্তির বাসনা বুদ্ধিমান মানব মাত্রেরই হইয়া থাকে। দুঃখ কেহ চাহেনা, সুখই সকলে চাহে। যে সুখের পরিণাম দুঃখ তাহাকে সুখ বলা যায় না। পরমার্থ চিন্তাই পরম সুখ। সেই সুখের অধিকারী হইতে হইলে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে চিন্তাকে একমুখী করিতে হয়। তাই বোধ হয় পাগল বেশী সাধুটীর উক্তি "অনেক ভাবনা ভাব্‌তে নাই।" এই কথার মূল্য অনেক।

মনের কথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ।

মনের কথা অনেক সময় বলিব, বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই। কারণ লোকে যাহা পছন্দ করে না, যাহা ভাল বাসে না, যাহা শুনিতে চায় না তাহা না বলাই ভাল বলিয়া অনেক সময় নীরবে কাটাইয়াছি। কিন্তু মধ্যে মধ্যে

অনেক সময় মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, কথাগুলি বলাই ভাল, কারণ এ জগতে সকল কথা সকলের প্রিয় না হইতে পারে, তাই বলিয়া উচিত কথা বলিতে বিরত থাকিব কেন? বলিলে হয়ত অনেকের অনেক উপকার হইতে পারে। যদি কাহারও কোন উপকারে না আইসে, তাহা হইলে আমার মনের ভিতর দিবারাত্র ঘোরতর কোলাহল হইতে আমি ত পরিত্রাণ পাইব। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিব।

মনের কথা বলিতে গেলে উপর্য্যুপরি অনেক কথা এক সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কোন্‌টী আগে বলিব, কোন্‌টী পরে বলিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। ইহা এক বিষম গোল, সেইজন্য আমার মনের কথা অপরের ভাল না লাগিবারই কথা। ভাল না লাগে,কেহ মনে কিছু না করেন, ইহাই আমার সরল উক্তি বিনীত নিবেদন ও মনের কৈফিয়ৎ। পাঠক মাত্রে আমার যাবতীয় ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন আমি কবুল জবাব দিলাম।

একদিন গভীর রাত্রে ভাল নিদ্রা না হওয়ায় মনটা হঠাৎ খারাপ হইয়া গেল। কত রকম চিন্তাস্রোত আসিয়া মনকে আলোড়িত করিল। একটার পর একটা, তার পর একটা, তার পর আর একটা, এমনি চিন্তার পর চিন্তা আসিয়া মনকে আরও অধীর করিল। কিছুতেই চিন্তার হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম। তার পর বাহিরে আসিয়া অনন্ত অসীম আকাশের দিকে স্থির নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া এক ধ্যানে বলিলাম,ভগবান "অন্তর্যামি! আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানব, আমার মনে এত গুরুতর চিন্তার স্রোত ঢালিয়া দিয়া কেন আমাকে অকূল পাথারে ভাসাইতেছে প্রভো! আমি এত চিন্তার বোঝা বহিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অক্ষম। যাহাতে এই নিদারুণ চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ ও শান্তিলাভ করিতে পারি, দীনবন্ধো! তাহার উপায় বিধান করিয়া দাও।

আমার প্রথম চিন্তার ধারা-আমি কে, আমি কি ও আমি কেন? কোথায় আমি ছিলাম কে আমায় আনিল, কেন আমি আসিলাম, পূর্ব্বে কি করিতাম, এখন কি করি? আগা গোঁড়া এই সকল জটীল চিন্তাধারা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিল। এ প্রশ্নের সমাধান করিবার শক্তি আমার নাই। বিশাল বিরাট ব্যপারের সমাধান করা ক্ষুদ্র মানব শক্তির অতীত বুদ্ধির অতীত ও চিন্তার অতীত। অনেক সময় অনেক কথা হয় তো বুঝিতে পারি, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা সত্বেও আমি গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, জানি না আমার শেষ পরিণতি কোথায়?

রাইচরণ। বাবু, কমলকন্তবাবু——

শশি। (বাধা দিয়া) হ্যাঁ, বুঝেছিরে ব্যাটা। যা, বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়। তোর আর বক্তিমে দিতে হবে না।

রাই। কবিতে কবিতে কর্য্যা বাবুদের মাথায় গোল বাধিছে।

(প্রস্থান)

শশি। তাই বল্‌চিলুম, নেপু—যদি বরানগর অঞ্চলে গঙ্গার উপর বেশ ছোট্ট খাট্ট ছবিটির মত বাগান-বাড়ী থাকত, বাগানে নানা রকমের ফুল, কুঞ্জ বন, ঝরণা, পাখীরা ডালে ডালে গান গাইত আর কল্পনাময়ী বীণা হাতে করে বেড়িয়ে বেড়াত, তা'হলে Inspiration এর জন্যে এমন করে কি মাথা খুঁড়্‌তে হত? তুমি বস্তা বস্তা কবিতা লিখে যেতে—বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবি হতে। বল্‌চি—লালতাকে বিয়ে কর, লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হয়ে দিগ্‌বিজয় কর।

নৃপেন্দ্র। না, এমন যাকে তাকে আমি কল্পনাময়ীর আসনে বসাতে পারিনে। Love জিনিষটা যে কি তা' কোন কবিই এখনও Fully grasp কর্‌তে পারেন নি।

(কমলকান্তের প্রবেশ)

কমল। দেখত কমল, শশি বিয়ে বিয়ে করে আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে, তুমিই বল, Love freedom না পেলে কখনও কি ফুট্‌তে পারে? কখন্ যে ফোটে কখন্ যে হাওয়া আসে তা' কেউ বল্‌তে পারে না। শশি আমায় গোলামী কর্‌তে বলে, আমার Ideal বিসর্জ্জন দিতে বলে।

কমল। (সহাস্যে) সত্যই ত' শশি!—কবিবরকে এমন উত্যক্ত কচ্ছ কেন?—Love আহা—হা—

গীত।

আহা কি মজা, বাহা কি মজা!
ভালবাসা কখন আসে, কখন ভাসে হৃদয়মাঝে
যায় না বোঝা!
দিনের বেলা, রেতের বেলা, ভোরে কি সাঁঝে
যায় না বোঝা!

এ মনস্তত্ত্ব কঠিন সত্য,

বিচার করা নয়ত সোজা !

এ ভূত চাপ্‌লে ঘাড়ে চিন্তা বাড়ে—কখনো না ছাড়ে—

ওষুধ জানে প্রেমের রোজা।

শশি। বা, কমল !—রস আছে দেখ্‌চি। বলি, প্রেমের রোজা টোজা পাক্‌ড়েচ না কি হে ?

কমল। না হে ভায়া ! সে গুড়ে বালি !—এখন কবিবরের খপর কি ! চাঁদনী রাতে মাদুর পেতে ছাদে শুয়ে আজ কি স্বপ্ন দেখ্‌বে ঠাউরেচ কবিবর ?

নৃপেন্দ্র। আরে ভাই, কবিতা-চর্চ্চা আর তেমন ভাবে হচ্চে কই ? যে জ্বালাতনে পড়েচি। (চারিদিকে তাকাইয়া) এ বসন্ত প্রকৃতির সুষমা সৌন্দর্য্য বৃথায় যাচ্চে !

কমল। (সহাস্যে) কেন, কেন !—তা' এখানে এই এঁদো গলিতে আর বসন্ত-প্রকৃতি কোথায় পাবে বল ? যাও তোমাদের পাড়াগাঁয়—সেখানে দোয়েল, কোয়েল সবই পাবে। কল্পনা করে এ সব লিখ্‌তে হবে না।

নৃপেন্দ্র। কেন, আমার কল্পনা কি বাস্তবের মত ফোটেনা কমল ?

কমল। তোমার ক্ষমতা আছে স্বীকার করি, কিন্তু তুমি তা' নষ্ট কচ্চ। ভাল কথা, শরৎবাবুদের বাড়ীতে তোমার খুব নাম হয়ে গেছে। সুশীল তোমার কবিতায় খুব ভক্ত হয়ে পড়েচে। বলে, তোমার কবিতায় Mysticism আছে, তাই কল্পনাকে Lattitude দেওয়া যায়।

শশি। বটে, বটে—তা'হলে আমি কবির ভাই বলে গর্ব্ব কর্ত্তে পারি !

নৃপেন্দ্র। না, এখনও পার না শশি ! (গর্ব্বোল্লাসে) তা' একবার সুশীলবাবুকে এ ধারে-এনো না কমল ! আমার সঙ্গে একটু মুখ চেনাচেনি আছে।

(রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। (তোত্‌লাইয়া) বড়বাবু, মা ডাক্‌তিছেন !

নৃপেন্দ্র। জ্বালাতন আর কি !—না, আর টেঁকা গেল না দেখ্‌ছি।

(প্রস্থান)

কমল। ললিতার জন্যে খুব ধরে পড়েচে বুঝি ? তা নেপু ত ছেলে মন্দ নয়—Graduate, কবিতার বাতিক না পেলে Career খুবই ভাল হত।

শশি। আমি ত' তাই বলি, কমল ! এই বিয়ে হলে ও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্‌বে। কালে বড় কবি হতে পার্‌বে। এস, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। এখন নেপুকে কি করে রাজি করাই ?

(উভয়ের প্রস্থান)

ক্রমশঃ

বর্ষাকাল !

লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

আকাশ ছেয়ে মেঘ উঠেছে চাল্‌ছে ফটিক্ জল।
বেঙগুলো সব নির্জ্জীব ছিল, পেলে নব বল ॥
মাছগুলো সব আমোদ ভরে খেল্‌ছে কত খেলা।
সূর্য্যের মুখ যায় না দেখা, এ তো বিষম জ্বালা ॥
রাস্তায় কাদা, চলা ভার, জল সর্ব্বময়।
রাতদিন ভিজে সর্দ্দি-কাশি সকলেরই হয় ॥
ভাল খাবার মিলে না কিছু, তরিতরকারি নাই।
মাছের মধ্যে ইলিশ মাছ শুধুই দেখ্‌তে পাই ॥
ফুলের মধ্যে অপরাজিতা আর শেফালিকা।
ফলের মধ্যে আনারস পেয়ারার পাই দেখা ॥
ভাল খাবার মিলে না বলে পেটের অসুখ হয়।
এই কালেতে বুড়োবুড়ি যায় যমালয় ॥
গরিবের হায়, বড় কষ্ট, চাল্ দিয়ে পড়ে জল।
খেয়ে শুয়ে পায় না আরাম কাঁদে অবিরল ॥
বড়লোকের সবই ভাল সব কাল সমা
গরিবের যে কি কষ্ট জানেন ভগবান ॥
দারুণ গ্রীষ্ম চলে গিয়ে এল বর্ষাকাল।
ঘাম জুড়োলো বটে কিন্তু বিষম জঞ্জাল ॥

অবিরল পড়ে জল বাইরে যাওয়া ভার।
ছাতি ছাড়া নাইকো গতি আর যে কাহার॥
জগৎবাসী দেখে শুনে ভাবে নেমমনে।
বর্ষাকাল না গেলে চলে, বাঁচিব কেমনে?
বর্ষাকাল মন্দ ভেবে কর হায় হায়।
কিন্তু জেনো এই কাল অন্নের উপায়॥

হাণ্টারের পরিণাম।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

হেলমণ্ড নগরে হাণ্টার নামে এক কামার বাস করিত। তাহার খামার বাড়ী ছিল নিজ গ্রামের টে নামক নদীর তীরে। টে নদীর উভয় পার্শ্বস্থ জমি বিশেষ উর্ব্বরা। বন্যার সময় উভয় তীর প্লাবিত হওয়ায় সেপ্টেম্বর মাস হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নানা ফসলও তরি তরকারী উৎপন্ন হয়।

হাণ্টার ৩২ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইয়া সংসারে নিতান্ত নিস্পৃহভাবে কাল যাপন করিত। পাশ্চাত্য দেশে অবিবাহিতা যুবতী কিংবা প্রৌঢ়া রমণীগণ অনেক সময় পরিণীতা হইবার আশায় বিপত্নীকের সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য অনাহূত হইয়াও আগমন করে। তাহাতে সমাজে দোষ হয় না। কিন্তু বিবাহিতা না হইয়া সন্তানবতী হইলে সে সমাজে পরিত্যক্তা হয়।

হাণ্টার যখন মনমরা হইয়া টে নদীর তীরস্থ খামার বাড়ীতে বাস করিতেছিল। সেই সময় এলোনা নাম্নী জনৈকা যুবতী, তাহার গৃহে আশ্রয় প্রাপ্তির নিমিত্ত আগমন করিল। হন্টারও পরমাগ্রহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

একত্রে কিছুদিন বসবাসের পর এলোনা গর্ভবতী হইল বটে, কিন্তু বিবাহিতা হইল না। হাণ্টার বিবাহ করিতে ইতস্ততঃ করায় এলোনা বিরক্ত হইল কিন্তু তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পারিল না। তাহার অশন বসন প্রভৃতির কোনই অসুবিধা হইত না। কামুকের কামানলে ইন্ধন প্রদানে যুবতীর আগ্রহ ছিলনা এমন বলা যায় না।

এদিকে হাণ্টারের বিরুদ্ধে সমাজপতিরা কানা-ঘুষা করিতে লাগিল। যুবকেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। অনেকগুলি উড়োচিঠি হাণ্টারের ঘরে আসিয়া পড়িল। তখন হাণ্টার কি করে; অগত্যা এলোনাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। তাহার খামারে এক বিশ্বাসী চাকর থাকিত, তাহার নাম ব্লাকী। সে ব্যক্তি অতি নির্দ্দয় প্রকৃতির। তাহার নিকট দয়াধর্ম্ম ছিল না। পশু পক্ষী শিকার করাই তাহার নিত্য-ক্রিয়া ছিল।

একদা সন্ধ্যাবেলায় হাণ্টারের সহিত ব্লাকীর গোপনে পরামর্শ হইল। হাণ্টার প্রকাশ্যে বলিল, "ব্লাকী, তুমি এলোনাকে উহার মামার বাড়ীতে রাখিয়া আইস। নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আবার এখানে আনিবে।" এই কথা এলোনার সাক্ষাতেই হইল। এলোনা আনন্দিতা হইল।

যথাকালে এলোনা নিজের কাপড় চোপড় লইয়া ব্লাকীর সহিত পদব্রজে যাত্রা করিল। ঝিপি ঝিপি বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, সন্ধ্যার আঁধারে নিশাচরগণ বাহির হইয়াছে, শিবাকুল চীৎকার করিয়া উঠিল. অন্ধকার পৃথিবী ছাইয়া ফেলিল। ব্লাকীর এক হাতে প্রকাণ্ড এক বর্ষা, অন্য হাতে সার্চ্চলাইট। (তীক্ষ্ণ আলোকরেখা বিকীর্ণকারী লণ্ঠন)।

এক মাইল গমন করিয়া টে নদীর একটি নালার নিকট উপস্থিত হইয়া এলোনা অবনত হইয়া জল লইতেছিল। তাহার মনে কোনই ভয় নাই কারণ ব্লাকী অনেক দিনের বিশ্বাসী চাকর।

এলোনা যখন মুখে চোকে জল লইতেছে সেই সময় নির্দ্দয় ব্লাকী পুনঃ পুনঃ বর্ষার খোঁচায় রমণীকে বধ করিল। শেষে কাপড় চোপড় শুদ্ধ বাঁধিয়া এলোনাকে নিকটস্থ গভীর খাদে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

এইবার হাণ্টার নিশ্চিন্ত মনে খামারে বাস করিতে লাগিল। কামুকের কাম-পিপাসা আবার জাগ্রত হইল। তখন সে এক কৃষক কামিনীকে ধরিয়া আনিয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিল। কৃষক কামিনীর নাম নোরা। নোরা সধবা, তাহার পতিও তাহাকে খুব ভালবাসে। তথাপি হাণ্টারের কুপরামর্শে হতভাগিনী বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিল, এবং হাণ্টারকেই স্বামীরূপে কল্পনা করিয়া পরমানন্দে হাণ্টারের গৃহে বাস করিতে লাগিল।

একদা শীতকালের রাত্রিতে নোরা বাহিরে গিয়াছে, এমন সময় জোরে বাতাস বহিয়া লণ্ঠনটি নিভাইয়া গেল। নোরা সভয়ে দেখিতে পাইল—একটি স্ত্রী-মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে। তাহার বুকে পিঠে ও মাথায় রক্ত ঝুজিয়া পড়িতেছে। রমণী

কাতর দৃষ্টিপাত করিতেছে।

নোরা অস্ফুট চীৎকার করিতেই যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইল। চৈতন্যহীন অবস্থায় ভূমিতে পতিত হইয়া একটু পরেই আবার চৈতন্য প্রাপ্ত হইল। তখন সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিল "ভগিনি! ভয় পাইও না। আমি তোমাদেরই এক জন। আমার নাম এলোনা। তোমার মত আমিও ঐকামুকের শয্যা-বিলাসিনী ছিলাম, কামুক আমার সর্ব্বনাশ করিয়া অবশেষে আমায় হত্যা করাইয়াছে।"

নোরা সভয়ে মৃদুকণ্ঠে কহিল,"তুমি কি মৃত? তবে কথা বলিতেছ কিরূপে?" এলোনা বলিল, "মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্ম-দেহে ধরাতলে বিচরণ করিতে পারে। আমার এই যে মূর্ত্তি, তাহা স্থূল দেহের। এই দেখ, আমার পাঁচ স্থানে নির্দ্দয় ব্লাকী অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। ভগিনি! তুমি এখনও সাবধান হও!"

নোরা বলিল "আমি কি করিব?"

এলোনা বিরক্তিস্বরে বলিল, "পলায়ন কর, নতুবা আমার মতই মরিবে।"

হাণ্টার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নোরার অন্বেষণে বাহিরে আসিয়া কথা বার্ত্তার শব্দ মাত্র শুনিতে পাইল। তাহার সন্দেহ হইল, বুঝি পূর্ব্ব পতির সঙ্গে নোরার কথাবার্ত্তা হইতেছে। তখন পরুষ কণ্ঠে হাণ্টার হাঁকিল "নোরা"। নোরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

নোরার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই খিল্ খিল্ করিয়া হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল। হাণ্টার দেখিল, রক্তাক্ত বসনে এলোনা!

হাণ্টার সভয়ে কহিল, "এলোনা! তুমি কি জীবিত আছ?"

"না—না—তোমার কৃপায় মরিয়া বাঁচিয়াছি।"

""তবে তুমি এখানে কেন?"

"পাষণ্ড নরঘাতি! তোর পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে। এইবার প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

"তুমি দূর হও, দূর হও।"

"এই যে দূর হচ্ছি, পশু!"

এই বলিয়া এলোনা ভয়ঙ্কর অট্টহাসি হাসিল।

সে হাসিতে কিছুমাত্র মাধুর্য্য ছিল না। হাণ্টার সভয়ে শুনিতে পাইল এলোনা যেন বলিতেছে—

"ওরে কামুক! এইবার তোর প্রায়শ্চিত্ত। আজ হতে একমাসের মধ্যে সর্পাঘাতে ব্লাকীর এবং বজ্রাঘাতে তোর মৃত্যু অনিবার্য্য।" এই বলিয়া মূর্ত্তি

অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অর্দ্ধ চৈতন্যাবস্থায় হাণ্টার চেয়ারে বসিয়াই রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিল এবং প্রভাতেই নিজ গ্রামের ধর্ম্মযাজকের নিকট গিয়া রাত্রি কালের ভূতদর্শনের কথা বলিয়া ফেলিল।

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "তুমি নিজের পাপ গোপন করিতেছ, সুতরাং এখান হইতে দূর হও, আমি কিছুই করিতে পারিব না।" হাণ্টার ক্ষুণ্ণমনে গৃহে আগমন করিল।

এদিকে ব্লাকীর অসুস্থতার বৃদ্ধি হইল, অত্যন্ত রক্তামাশয়ে দিবারাত্রি পায়খানা যায়। কিছু খাইতে পারে না। রাত্রে প্রত্যহই এলোনার রক্তাক্ত মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া বিনিদ্রযামিনী যাপন করে। একদিন রাত্রিকালে পায়খানার সিঁড়িতে পা দিতেই তাহাকে গোখুরা সাপে কামড়াইল। হতভাগ্য বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে তিনঘণ্টার মধ্যেই মরিয়া গেল। মৃত্যুকালে সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিতেছিল, "ঐ এলোনা, ঐ সাপ্, আর মেরো না, আর খুঁচিয়ে মেরো না, গো!" হতভাগ্য মরিয়া গেল।

ব্লাকীর মৃত্যু দেখিয়া এবং তাহার মুখে বিলাপ বাণী শ্রবণ করিয়া হাণ্টারের সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। সে সর্ব্বদাই গৃহের নিম্নতলে শুইয়া কিংবা বসিয়া থাকিত। নোরা প্রাণপণে সেবা করিত, কিন্তু কিছুতেই সে প্রফুল্ল হইত না। দিবা রাত্রি সে ভূত দেখিত।

এক মাসের শেষ দিনে ভয়ঙ্কর ঝড় এবং মূষল ধারায় বৃষ্টি। খামারে অনেক গুলি গম ও যব পালা দেওয়া ছিল। টে নদীর ভীষণ প্লাবনে সে গুলি ভাসিয়া গেল। হতভাগ্য হাণ্টার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "নোরা! আজ মাসের কোন্ তারিখ?"

নোরা বলিল, "আজ ৩১ শে।" হাণ্টার বলিল, "তাহলে বাঁচ্‌লাম নোরা। কাল আমার ফাঁ'ড়া কেটে গেছে।" অমনি দেওয়ালস্থিত একটা টীক্‌টিকি বলিয়া উঠিল, "না—না—না।" হাণ্টার অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া একটু চা পান করিল এবং মোটা লাঠির উপর ভর দিয়া বাহিরে চলিল।

অনেকক্ষণ হইতেই বন্যার শব্দ বাতাসের শব্দ এবং মেঘগর্জ্জন শব্দ সকলেরই আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে। হাণ্টার উঁকি মারিয়া দেখিল, সম্বৎসরের খাদ্য গম ও যবের পালাগুলি স্রোতের টানে ভাসিয়া যইেতেছে! তাহার বুক টন্ টন্ করিয়া উঠিল।

সে এক পা এক পা করিয়া আঙ্গিনায় পা দিবামাত্র শতশত কামান গর্জ্জনের ন্যায় মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তাহার পর, ভয়ঙ্কর বজ্র কড়্ কড়্ শব্দে তাহার মস্তক ও দেহ চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া পাতাল মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে হান্‌টারের জীবনলীলার পরিসমাপ্তির সহিত তাহার অত্যাচারও চিরতরে প্রশমিত হইল।

গীত।

একতালা ভৈরবী।

ভাবিতে ভাবিতে এসেছি মহীতে
মহিষ-মর্দ্দিনী কর মা উপায়।
তোমারই কমল- চরণ সম্বল
পদতরী বই নাহি গো উপায়॥
বাল্য যুবা গেল, এল বৃদ্ধকাল
কাল আসি কোপে ডাকে করাল
কাল-কান্তা কালী ওমা মুণ্ডমালী
কৃপা করি রাখ শ্রীচরণ ছায়॥
দ্বিজ নারায়ণ অকিঞ্চন অতি,
সদাচারহীন কদাচারে মতি
তব পূজা হেতু নাহি মাগো রতি
শমন শঙ্কায় শঙ্কিত সদাই॥

সুন্দরীর উপকথা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

চার।

বহুবর্ষ ফিরিয়াছে। সে দিনও অপরাহ্ণ বেলা; লোকজন সমাধিক্ষেত্রে স্মৃতি স্তূপ দর্শন করিতে আসিয়াছে। এ কজন তেজঃসম্পন্ন, সরলকায় পৌঢ়ও তাহাদের সহিত কোনমতে মিশিয়া গেছে।

লোকজন স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, এমন সময়ে ছদ্ম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়গণ, কাহার সম্মানকল্পে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে আপনারা কিছু বলিলেন না ত'?"

স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা

এই "স্বর্ণঘটিত অমৃত-সালসা" সেবনে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্তবিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দুষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের "অমৃত সালসা" সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দুর্ষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে। ইহা কেবল গাছ-গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। **ওষেরপরীক্ষা**—"অমৃত সালসা" সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বাপেক্ষার ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পর হস্ত পদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে, শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোককেই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২॥০ টাকা, মাশুল ১৲ টাকা ৬ শিশি ৪॥০ টাকা, মাশুল ১॥০ টাকা,

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত, "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও স্বতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তিহীনতা, উত্তেজনারাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।৶০ আনা, তিন শিশি ২॥০ টাকা, মাশুল ১৲ টাকা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেবী লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য, এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রিবেলার আনন্দ ও ক্ষুধা-বৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যাবেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন, ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে। একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, তিন কৌটা ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, এক সের ৮৲ আট টাকা।

কবিরাজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, পোঃ হাটখোলা কলিকাতা।


স্বাস্থ্যের পথে

অমৃতবল্লী কষায়

কি রোগী কি সুস্থ

সকলের পক্ষেই ইহা সমান উপকারী।

কবিরাজ
নগেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোংলিঃ
১৮।১৯, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39 MANICK ROSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শ বর্ষ] ১৩৩৮ আশ্বিন, [৬ষ্ঠ সংখ্যা]

১। শ্রীমদ্ বালানন্দ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৬১
২। অনু-প্রাস-মাধুর্য্য—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১৭৭
৩। শঙ্খ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ১৪৩
৪। আবাহন—শ্রীযুক্ত নিশাকান্ত ভট্টাচার্য্য ১৮০
৫। শক্তি—শ্রীযুক্ত শৈলরাণী বসু বি, এ, ... ১৮১
৬। প্রাচীন গল্প সংগ্রহ—শ্রীহজবরল-লিখিত ১৮৩
৭। কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৮৪
৮। সমালোচনা ১৯১

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।
৩৯ নং মাণিক নসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 5-1-32

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

এক দিনে জ্বরছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৮৩৩

চিন্তামণি

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারিং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়!

আমাদের জিনিষ লইলে নগদ টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন!

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত

অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমবন্ধু।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২৷৷০ অড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৬৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

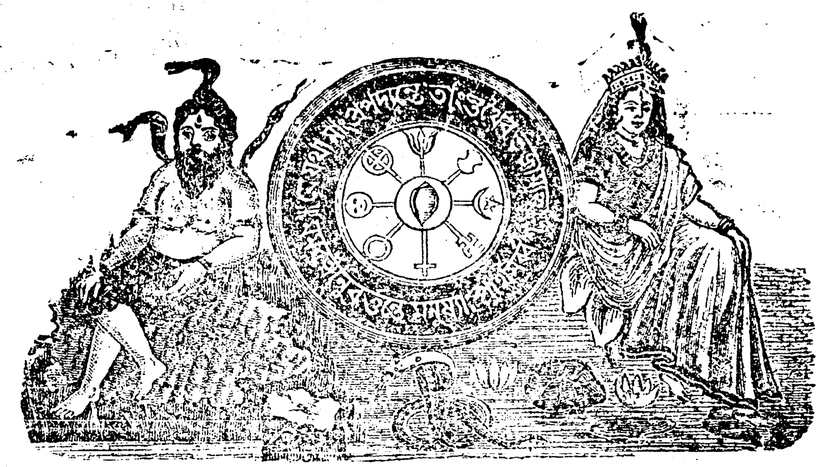

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ | ১৩৩৮ সাল, আশ্বিন | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামচরণবাবুর সহিত রাণাঘাটে মিলন ও পর পর ঘটনা।

রাণাঘাটে আগমন কালে মহারাজের নিকট অনেক গুলি উত্তম উত্তম রুদ্রাক্ষ ছিল, এ গুলি আসাম প্রদেশে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তখন কোন্ দিকে পর্য্যটনে বাহির হইবেন স্থির ছিল না। এজন্য সেগুলিকে রামবাবুর নিকট রাখিয়া দিলেন ও বলিলেন যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিয়া যখন তিনি সংবাদ দিবেন তখন সেখানে যেন এগুলি পাঠাইয়া দেন। রাম-বাবু পরমানন্দে ইহা রাখিলেন ও আশা করিলেন যে, তাঁহার অন্যত্র অব-স্থানের সংবাদ তবে নিশ্চয়ই পাইবেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাণাঘাট ত্যাগ করিবার পর এবারে পুনরায় তারকেশ্বর হইয়া মহারাজ উত্তর খণ্ডের দিকে

চলিয়া যান। এবার যাইবার পর ত্রিযুগীনারায়ণে ও গঙ্গোত্তরীতে যে, ব্যাপার হইয়াছিল ও পরে গঙ্গোত্তরীর জল লইয়া যেরূপে সেতুবন্ধে উপস্থিত হইয়া এ গঙ্গাজল রামেশ্বর লিঙ্গের উপর নিক্ষেপ করেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। রামেশ্বর হইতে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে প্রায় এক বৎসর পরে মহারাজ ৺কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এখান হইতে রামচরণ বাবুকে রুদ্রাক্ষ পাঠাইবার জন্য একখানি পত্র দিলেন। বহুদিন পরে রামচরণবাবু মহারাজের সংবাদ পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। রুদ্রাক্ষ ত পাঠাইয়া দিলেনই, সঙ্গে ২৫৲ টাকা ও পাঠাইয়া দিয়া মহারাজকে রাণাঘাটে যাইয়া একবার তাঁহাদিগকে দর্শন দিবার জন্য কাতরে প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ রুদ্রাক্ষ ও টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু রাণাঘাটে যাইবেন কি না ইহা জানাইলেন না। ইহার কিছুদিন পরে রামবাবু পুনরায় ২৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপে জানাইলেন। এ বারেও পত্র ও টাকা প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন মাত্র, কিন্তু রাণাঘাটে যাইবার বিষয়ে কিছুই লিখিলেন না। ইহার পর পুনরার তৃতীয়বার রামবাবু ২৫৲ টাকা পাঠাইয়া পূর্ব্বোক্তভাবে দর্শনের অভিলাষ কাতর ভাবে জানাইলেন। রামগিরি স্বামী বারবার রামবাবুর এই ভক্তির পরিচয় পাইয়া মহারাজকে এই ভক্তের সহিত দেখা করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এ স্বামীজীকে মহারাজ গুরুবৎ মান্য করিতেন এজন্য তাঁহার উপদেশ মত গুরুদেব রাণাঘাটে আগমন করিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে। এ উপলক্ষে মহারাজ কয়েকদিন রাণাঘাটে অবস্থান করেন। রামবাবু সস্ত্রীক দীক্ষা লইবার জন্য প্রার্থনা করেন। মহারাজ ইতিপূর্ব্বে আর কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, বিশেষ ইঁহারা গৃহস্থ। কিন্তু রামবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর কাতর প্রার্থনায় আকৃষ্ট হইয়া মহারাজ দীক্ষা দান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই সর্ব্ব প্রথম শিষ্য করিলেন।

এই দীক্ষাদানের পর রাণাঘাটে কয়েকদিন থাকিয়াই গুরুদেব পুনরায় পর্য্যটনে বাহির হন। ইহার পর বহুদিন তাঁহার আর সাক্ষাৎ পান নাই, পাঁচ বৎসর তাঁহাকে না দেখিয়া রামবাবু বড়ই ব্যাকুল হইলেন ও পরে সংবাদ পাইলেন যে, গুরুদেব কাশীতে আসিয়াছেন। এ সংবাদ পাইয়াই রামববু দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া কাশীতে গমন করিলেন ও ধ্রুবেশ্বর মঠে যাইয়া গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও দুদিন সেখানে থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। ইহার

পর দুই বৎসর পুনরায় কোন সংবাদ পাইলেন না। এ সময়ে গুরুদেব অমরনাথ ও মন্মহেশ অঞ্চলে চলিয়া যান। মন্মহেশ-যাত্রা এই প্রথম। নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে গুরুদেব গির্ণারে যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। সেখানে যে ঘটনা হয় তাহা শ্রবণ করা বড়ই কর্ত্তব্য। ইহা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভক্তের জন্য ভগবানের হৃদয় কিরূপ আকর্ষিত হয়। এজন্য শাস্ত্রকারেরা শুনাইয়াছেন যে, ভগবান সর্ব্বত্রই, স্বাধীন হইয়াও তিনি কিন্তু "ভক্তাধীন।"

ঘটনাটি এইরূপ। একদিন সকালে মহারাজ আসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ ছিলেন। এ সময়ে বেলা আন্দাজ ৮টা। এমন সময়ে মানস নয়নে দেখিতে লাগিলেন যে, রামচরণবাব যেন তাঁহার পা দুখানি ধরিয়া শুইয়া আছেন ও অপর কেহ ছুরী দ্বারা তাঁহার পিঠে অস্ত্রোপচার করিতেছে। রামচরণবাবু কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ না করিয়া কেবল এক দৃষ্টিতে মহারাজের প্রতি তাকাইয়া আছেন। আসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এরূপ এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া ইহার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। ইহা চিত্তের এক বিক্ষেপ মনে করিয়া প্রত্যাহার পুরঃসর পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন, কিন্তু এবারও পূর্ব্বদৃশ্য দেখিলেন। পুনরায় প্রত্যাহার পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইলে, তৃতীয়বারও ঐরূপ দৃশ্য দেখিলেন। তিনবার এরূপ দেখিবার পর তাঁহার মনে হইল যে, রামবাব বোধ হয় কোনরূপ বিপদগ্রস্থ হইয়াছেন। এজন্য সেই দিনই গির্ণার হইতে ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিয়া যে যে ভাবে উক্ত দৃশ্যটি দেখিয়াছেন তাহার বর্ণনা সহ একখানি পত্র হিন্দিভাষায় রামবাবুকে লিখিলেন। ৪।৫ দিন পরে এ পত্র পাইয়া রামবাবু তারযোগে জানাইলেন যে, উক্ত ঘটনা সত্য ও ইহার পূর্ণ বিবরণ তিনি পত্রে জানাইতেছেন। কয়েকদিন পরে এ পত্র পাইয়া মহারাজ অবগত হইলেন যে, রামচরণ বাবুর পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) হইয়াছিল। মহারাজ যে দিন যে সময়ে গির্ণারে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে কলিকাতায় ডাক্তারেরা তাঁহার পিঠে অস্ত্রোপচার করিয়াছিল। তিনি ক্লোরাফরম করিতে দেন নাই। তিনি একমনে কেবল গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া মনে মনে যেন তাঁহার চরণ দুইখানি ধরিয়া শুইয়াছিলেন ও এরূপ করায় এ অস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণা বিশেষ অনুভব করেন নাই। রামচরণ বাবুর এ পত্র পাইয়া ও তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্ত-হৃদয়ের এ আকর্ষণ জানিতে পারিয়া মহারাজও তৎপ্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইলেন।

ভক্তগণের এরূপ গুরুপদে আত্ম-সমর্পণ করিয়া স্থির থাকা, আমরা পরে

আরও দুই একবার দেখিয়াছি। এ উপলক্ষেই ইহা শুনাইতেছি, তবে এ দুইটী ইহার বহুদিনের পরের ঘটনা। মহারাজের এক বৃদ্ধ শিষ্য এখনও জীবিত আছেন, ইহার নাম দয়ানিধি বা। আমরা সচরাচর ইহাকে বৈদিকজী বলিয়া থাকি, কারণ ইনি বেদ অভ্যাসে ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে একজন পণ্ডিত। তাঁহার পৃষ্ঠে একবার পৃষ্ঠাঘাত হয় ও ডাক্তার কেদার নাথ সেন ইহার অস্ত্র করেন। মহারাজকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক বৈদিকজী নীরবে এ অস্ত্রোপচার অনেকক্ষণ ধরিয়া সহ্য করিয়াছিলেন ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম।

পুনরায় এ বৈদিকের নিজমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাও জানাইতেছি। ইহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দামোদর সংস্কৃত বিদ্যায় বেশ সুপণ্ডিত হইয়াছেন। ইহাঁরা পিতা পুত্রে মহারাজের কেরাণীবাদের আশ্রমেই অবস্থান করিতেন। এরূপ অবস্থান সময়ে দামোদরকে সর্পাঘাত করে। আমরা সে সময়ে দেওঘরে ছিলাম। রাত্রিকালে যখন দামোদর দেবীমাতার মণ্ডপের মধ্যে শয়ান ছিল, সে অবস্থায় এক বিষধর সর্প তাহাকে দংশন করে, কারণ সর্পটী দেখা গিয়াছিল। বৃদ্ধ বৈদিকজী পুত্রের এ অবস্থা দেখিয়া বিচলিত না হইয়া জপে বসিয়াছিলেন। দামোদরকে "দোবেজীর" আস্তানায় সকলে লইয়া গিয়া বিধিমত স্নান করাইতে লাগিল। দোবেজীর এ মণ্ডপ মহারাজ অন্যস্থান হইতে উত্থাপিত করিয়া এ আশ্রমেই সংস্থাপন করিয়াছেন। বৎসরে ২।১টা সর্পদংশনের রোগী এখানে আসিয়া বিধিমত স্নান ও দোবেজীকে কাতর-প্রার্থনারূপ স্তব প্রক্রিয়ায় আরাম হইয়া যায়। এ দোবেজীর বিবরণ এখানকার অনেকেই জানে, তবে এ প্রক্রিয়ায় অধীনে রোগীকে অপর কোন ঔষধ খাওয়ান নিষেধ। যাহা হউক, যখন দামোদরকে লইয়া উক্তরূপ প্রক্রিয়া চলিতেছিল তখন বৈদিকজী নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তিনি ধ্যানাবস্থায় কেবল দেখিতে লাগিলেন যে যমদূতের মত কতকগুলি পুরুষ আশ্রমে প্রবেশ করিতে বার বার উদ্যত হইতেছে, আর মহারাজ এক ত্রিশূল হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে তাড়না করিতেছেন। ২।১ বার এরূপ করিবার পর মহারাজের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা পলায়ন করিল ও দামোদর এ সর্পদংশন হইতে আরোগ্যলাভ করিল।

যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর তিন চারি মাস আর কোন সংবাদ পাইলেন না। অস্ত্রোপচারের পর রামবাবু কলিকাতায় থাকিতে অস্বীকার করিলেন। এ বৎসর হরিদ্বারে কুম্ভ স্নান ছিল। ইহা হইতেছে ১৮৯১ সালের

কুম্ভমেলা। পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে নানাস্থানের কুম্ভস্নান মহারাজ ২।৪ বার করিয়া করিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে কলিকাতায় অবস্থানকে যেরূপ "মানুষের জঙ্গলে বাস" বলিয়া পরিহাস করেন সেরূপ এ মেলায় যাইবার বিষয় শুনিলেও বলিয়া থাকেন যে "জাতকাল জমাৎকাল, মেলা ঠেলা তিন কাল" অর্থাৎ জাতে উঠান, জাতীয় মজলিস ও মেলায় অবস্থান কেবল ঠেলাঠেলি গুতাগুতি অধিক, অন্নলাভ অল্প। গির্ণার হইতে মহারাজ হরিদ্বারে আসিলেন। অস্ত্রোপচারের পর রামবাবু ৩ মাসের ছুটী লইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষত এ সময়ে ভালরূপ শুকায় নাই, এ অবস্থায় ছুটী লইয়া একটী ভৃত্য ও ব্রাহ্মণ সহ সস্ত্রীক তিনি মধুপুর ও দেওঘর আগমন করেন। এই তাঁহার প্রথম দেওঘর আগমন।

এ সময়ে ৺বাণীকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বাণীবাবু সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন ও তাঁহার এখানে খুব প্রতিপত্তি ছিল। তিনি রামবাবুর বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার মত বাণীবাবুও হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। রামবাবুর মুখে শুনিলেন যে তিনি একজন সাধুর নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহার পূর্ব্ব মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এখনও পিঠের ঘা সারে নাই ও ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার সেই সাধু গুরু দর্শন জন্য তিনি বাহির হইয়াছেন। এ সব শুনিয়া বাণীবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। এ ডাক্তার বন্ধুরও নিষেধ না শুনিয়া যখন তিনি যাইতে উদ্যত হইলেন তখন বাণীবাবু অনুরোধ করিলেন যে তাঁহাকে একবার এই সাধুকে দেখাইতে হইবে। রামবাবু চেষ্টা করিবেন বলিয়া রওনা হইলেন। রমবাবু কাশী এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ হরিদ্বার যাত্রা করেন ও কাশীতে ধ্রুবেশ্বর মঠে ও পথে অন্যান্য স্থানে মহারাজের অনুসন্ধান করিতে করিতে হরিদ্বারে গমন করেন।

কুম্ভমেলার সময় হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান সাধু-সন্ন্যাসীগণের বহুল পরিমাণে সমাগম হয়। ইহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন। এ অবস্থায় কোন সাধুর নির্দ্দিষ্ট বাসের স্থান জানা না থাকিলে এ সাধুভীড়ের মধ্যে কাহাকেও বাহির করা অতিশয় কঠিন। রামবাবু হরিদ্বারে ২০ দিন অবস্থান করিয়া ক্রমাগত মহারাজকে তল্লাস করিতেছিলেন, কিন্তু বাহির করিতে পারেন নাই। তথাপি তিনি আশা পরিত্যাগ করেন নাই। একদিন সকালে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এই বলিয়া বাহির হইলেন যে, সে দিন মহারাজকে দর্শন করিয়া তবে ফিরিবেন। বাস্তবিক এ দিন তাঁহার এ শুদ্ধ সংকল্প পরিপূর্ণ হইল। তিনি পোষ্টাফিসে যাইয়া নানাভাবে সন্ধান লইতেছেন এমন সময়

এক ব্যক্তির সহিত দেখা হইল। ইহার সহিত কাশীতে রামগিরি স্বামীর মঠে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। ইহাকে জিজ্ঞাসা করিতেই ইনি মহারাজের অবস্থিতি স্থান অবগত আছেন জানাইয়া একেবারে রামবাবুকে মহারাজের সমীপে লইয়া আসিলেন। মহারাজ তখন একখানি রুটী তাওয়ার উপর দিয়া অপরখানি হাতে ধরিয়া আছেন এমত সময়ে রামবাবু যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, ও মহারাজও এ ভক্ত দেখিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। ইহার পর ভোজন শেষ করিয়া রামবাবুর সহিত তাঁহার বাসায় আসিলেন। তাঁহার স্ত্রীও গুরু দর্শন পাইয়া তাঁহাদের সমুদয় ক্লেশ সফল জ্ঞান করিলেন।

এরূপে গুরুদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া রামবাবু সস্ত্রীক হরিদ্বারে আরও কয়েক দিন অবস্থান করিলেন ও প্রতিদিন গুরুদেবের সহিত বাহির হইয়া চণ্ডী পাহাড় প্রভৃতি বহু নিকটবর্ত্তী তীর্থ ও নানা সাধু দর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইহার পর রামবাবুর ছুটী প্রায় শেষ হইয়া আসিল এজন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে তিনি কাতরে প্রার্থনা করিলেন যে, বাঙ্গলা দেশে যাইয়া মহারাজ যেন আর একবার দর্শন দেন ও আরও জানাইলেন যে, বৈদ্যনাথ হইয়া যেন আগমন করেন, কারণ তাঁহার বন্ধু বাণীবাবুকে দর্শন করাইবেন এজন্য প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি আসিয়াছেন। মহারাজ এরূপ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তৃতীয়বার বৈদ্যনাথে আগমন ও এখানে অবস্থানের সূত্রপাত তপোবনের আশ্রম।

অস্ত্রাঘাতের পর রামবাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আর চাকরি করা কেন, ক্রমে যাইবার সময় ত নিকট হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে গুরুদেবের নিকট থাকাই কর্ত্তব্য।" ইহার পর যখন ছুটী লইয়া গুরুদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন তখন বলিয়াছিলেন যে, গুরুদেবকে এবার দেশে লইয়া আসিবেন। তিনি বলিতেন যে, যে রত্ন পাইয়াছেন, তাহার আস্বাদন আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে করাইবেন। এজন্য গুরুদেবের সহিত হরিদ্বারে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বাঙ্গলা দেশে আসিবার জন্য কাতরে প্রার্থনা করেন।

গুরুদেব আসিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এজন্য হরিদ্বারের মেলার পর তিনি কাশীতে আগমন করেন। পূর্ব্বে এখানে মউজগিরি (এ সময়ে ব্রহ্মচারী ধীরানন্দের) সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। এ মহাত্মার বিবরণ পরে

জানাইব। কাশীতে কয়েকদিন অবস্থানের পর এই মউজগিরিকে সঙ্গে লইয়া গুরুদেব বৈদ্যনাথ আগমন করিলেন। এই হইল তৃতীয়বার এখানে আগমন। পূর্ব্ব দুইবারে তাঁহাকে কেহ চিনে নাই। কিন্তু এবার এখানে প্রকট হইলেন। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার বাণীবাবু মহারাজের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিলেন। বৈদ্যনাথ হইতে তপোবনে যাইয়া সে স্থান তাঁহার বসবাসের অনুকুল হইবে প্রকাশ করিলেন।

রামবাবু এ সময়ে রাণাঘাট হইতে আলীপুরে বদলি হইয়াছিলেন। এ সময়ে বেকার সাহেব (যিনি পরে লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর হইয়াছিলেন তিনি) ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাহেবের সহিত রামবাবুর বিচার বিষয় লইয়া যেরূপ বচসা হয় তাহা লইয়া সংবাদ পত্রে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কথিত আছে, বেকার সাহেব কাছারীতে দাঁড়াইয়া বলেন যে রামবাবু বড় কম সাজা দেন ও এজন্য তিনি বিচক্ষণ কর্ম্মকুশল ডেপুটী নহেন। ইহা শুনিয়া রামবাবু স্থির গম্ভীর ভাবে অথচ রুদ্রমূর্ত্তিতে আসন হইতে উঠিয়া বলেন যে, ধর্ম্মাধিকরণে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিচারে মন্তব্য প্রকাশ করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা সাহেবের নাই। পুনরায় কোন কথা বলিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না। এ ঘটনার পর অনেক লেখালেখি হয় ও পরে রামবাবুকে বারাসতে বদলী করে। এ স্থান অতি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া এখানে আসিবার পর অসুস্থ হন ও এ জন্য স্থানান্তরে বদলি হইবার চেষ্টায় থাকেন। গুরুদেব ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রামবাবুর গুরুকৃপা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন। বৈদ্যনাথ হইতে গুরুদেব রামবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বারাসত গমন করিলেন ও তৎপূর্ব্বেই রামবাবুর পুনরায় আলীপুর আসিবার হুকুম হইল।

কেবল ইহাই নহে। যে সাহেবের সহিত তাঁহার মুখোমুখি বিবাদ ও নানারূপ লেখালেখি হইয়াছিল সেই বেকারের সহিত অতিশয় ভালবাসা ও বন্ধুত্ব হইল। তাঁহাকে ডাকিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যখনই দেখা হইত তখনই কর মর্দ্দন করিয়া বলিতেন যে, "আমি তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ভুলিয়া গিয়াছ ত?" ইহা বেকার সাহেবের এক মহানুভবতা বলিতে হইবে। রামবাবুও অতি প্রীতির সহিত বলিতেন যে, "আপনি উপরওয়ালা, সাময়িক উত্তেজনায় কখন কি বলিয়াছেন তাহা কি আর মনে রাখিতে আছে?" এক্ষণে এরূপ প্রীতিলাভের কারণটী বলিতে হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত অপ্রীতির কারণ মহারাজের কর্ণগোচর হইলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, ইহার

এক উত্তম প্রতিকার আছে। এজন্য গুরুদেব স্বরোদয়ের এক প্রক্রিয়ার উপদেশ দিলেন। এ প্রক্রিয়া অনুসারে স্বরের গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপরিতন অফিসারের নিকট দণ্ডায়মান হইলে বিপক্ষতা যাইয়া মিত্রতা আইসে। রামচরণ বাবু একদিন এরূপ করিতেই দেখিলেন যে সাহেব পূর্ব্বভাব একেবারে ভুলিয়া গিয়া সহসা অতিশয় প্রীতির সহিত রামবাবুর সহিত সম্ভাষণ করিলেন। ইহা পরে বরাবরই ছিল। তিনি রামবাবুর বেতন বৃদ্ধিও করাইয়াছিলেন। ইহার পর রামবাবুও পূর্ব্বমত গৌরব ও তেজের সহিত আলীপুরে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এ প্রক্রিয়া যে অতি সত্য তাহা এ লেখকও চাকুরী অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আলীপুরে বদলি হওয়ায় রামবাবু নিজের জন্য কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। মহারাজ বারাসতে পৌঁছাইতেই তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

মহারাজের কোন্ স্থানে থাকিতে পছন্দ হয় ইহার অনুসন্ধানে বাহির হইয়া মহারাজের পছন্দ হইল একটী ভূতের বাড়ী। ইহা ছিল মতিশীলের ঘাটের সন্নিকট। ইহতে ভূতের ভয় আছে বলিয়া কেহ ভাড়া লইত না, এজন্য খালি পড়িয়া ছিল। কলিকাতার কোন জমিদার সম্ভবতঃ পাইকপাড়ার রাজা ইহার মালিক ছিলেন। এ বাড়ীতে পূর্ব্বে নীলকুটীর এক সাহেব ভাড়াটিয়া ছিল। এ সাহেবটী হঠাৎ মারা পড়ে ও তাহার পর এখানে ভূত আছে বলিয়া প্রচার হয়। এক ডাক্তার ইহা জানিয়াও সাহস করিয়া ভাড়া লন। তিনি নানারূপ ভৌতিক ব্যাপারে বিব্রত হইয়া পড়েন। বেশ করিয়া দুয়ারজানালা বন্ধ রাখিয়া তাঁহারা বাসনগুলি একঘরে রাখিতেন। সকালে দেখিতেন সেগুলি নীচের নানা স্থানে পড়িয়া আছে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বিভীষিকাও দেখিতেন। এজন্য কয়েক দিন পরে এ ডাক্তার বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর আর কেহ সাহস করিয়া ভাড়া লইত না। এত বড় বাড়ী পড়িয়া থাকায় মালিকের লোকসান হইত। এটী ভূতের বাড়ী জানিয়াও মহারাজের এখানে থাকিতেই ইচ্ছা হওয়ায় রামবাবু যাইয়া মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তিনি আহ্লাদের সহিত বিনাভাড়ায় থাকিতে অনুমতি দিলেন। রামবাবুর মহারাজকে নিকটে কিছুদিন রাখিতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল, এজন্য ইহাতেই সম্মত হইলেন।

এ বাটীতে অবস্থানকালে দুইটী ঘটনা হইয়াছিল তাহাই এক্ষণে শুনাইব।

মহারাজও এখানে একদিন ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এ সময়ে কেবল স্বামী মউজগিরি তাঁহার সহিত ছিলেন।

একদিন রাত্রে মহারাজ ও মউজগিরি পৃথক পৃথক ঘরে শুইয়াছিলেন। মহারাজের যেন নিদ্রার পূর্ব্বে তন্দ্রার ভাব হইতেছিল। এরূপ সময়ে বোধ করিলেন যে, কে যেন তাঁহার পায়ে হাত দিতে যাইতেছে ও স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই হাত দুইটী উঠাইয়া লইতেছে। দুইবার এরূপ বোধ হইলে তাঁহার মনে হইল হয়ত মউজগিরি আসিয়া পা টিপিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এজন্য তন্দ্রাভাবেই বলিলেন, "যাও, শো রহো"। ইহা বলিতেই হাতটী সরিয়া গেল। ইহার পর পুনরায় হাতটী আসিয়া স্পর্শ করিবার মত হইলে মহারাজ সমান হইয়া হাতের প্রতি দৃষ্টি করিতেই দেখিলেন যে, কে যেন একজন দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন বোধ করিলেন যে, এ ত মউজগিরি নয়। এজন্য "মউজানন্দ" "মউজানন্দ" (মহারাজ প্রায়ই এরূপ সম্ভাষণ করিতেন) বলিয়া ডাকিলেন। এরূপ ডাকিতেই মউজগিরি আসিলেন ও মহারাজ তাঁহাকে ব্যাপারটী বলিলেন। মউজগিরি স্বামী জানাইলেন যে, তিনিও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই শুনিয়া উভয়ে চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলেন এবং দেখিলেন যে, বাহির দিকের সব দুয়ার বন্ধ আছে। তখন উহা একটী ভৌতিক ব্যাপার বলিয়াই বুঝিলেন। কিন্তু এরূপ হইবার পর আর কোনরূপ দৃশ্য সেখানে দেখেন নাই। এদিকে মহারাজের অবস্থিতির জন্য এখানে প্রতিদিনই বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। ক্রমেএ বাড়ীর ভূতের ভয় দূর হইল! এজন্য বাটীর মালিকও খুব সুপ্র- সন্ন হইলেন।

অপর ঘটনাটি হইতেছে কিছু হাস্যজনক। মহারাজ একদিন মতিশীলের স্নানের ঘাটে নামিয়া স্নানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইহা যে স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘাট তাহা তিনি জানিতেন না। এরূপ সময়ে এক দ্বারোয়ান আসিয়া একটু তেজের সহিত সে ঘাট হইতে মহারাজকে অন্যত্র যাইতে বলিল। অদূরে একখানি বড় জুড়ী গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও তাহাতে উক্ত শীলবাবুদের বাড়ীর কয়েকটী স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। দ্বারোয়ানটী রুক্ষস্বরে স্ত্রীলোকদের ঘাট হইতে চলিয়া যাইতে বলায়, মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেটী কাহার ঘাট। দ্বারোয়ান উত্তর করিল "মতিশীল বাবুর।" পুনরায় মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে বাবু এক্ষণে কোথায়? দ্বারোয়ান জানাইল যে, বাবুর পরলোক হইয়াছে। মহারাজ তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, সে ঘাট কখনই বাবুর নিজস্ব ছিল না। তাঁহার যাহা নিজস্ব বস্তু ছিল তিনি ত তাহা সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। ঘাট নিজস্ব হইলে অবশ্যই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। মহারাজ ও দ্বারোয়ানের এই কথাবার্ত্তা মায়ীরা বেশ শুনিতে পাইতেছিলেন। উক্ত কথাগুলি

শুনিতে পাইয়া তাঁহারা তখনই দ্বারোয়ানকে ডাকিলেন ও সাধুকে যেন স্নান করিতে নিষেধ না করে এই হুকুম দিলেন। দ্বারোয়ান আসিয়া এরূপ বলিতেই মহারাজ স্নান সম্পন্ন করিয়া তীরে উঠিলেন। মহারাজের সাধুমূর্ত্তি দেখিয়া মায়ীদের অতিশয় ভক্তি হইয়াছিল। এজন্য মায়ীরা আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কেহ এক, কেহ বা দুইটাকা মহারাজের পায়ের সম্মুখে প্রণামী দিলেন। কিন্তু সেই গঙ্গা-তীরে এরূপ দান প্রতিগ্রহ অকর্ত্তব্য বুঝিয়া মহারাজ চলিয়া গেলেন। যেখানকার টাকা সেখানেই পড়িয়া রহিল। ইহা দেখিয়া মায়ীদের ভক্তিভাব আরও বৃদ্ধি হইল। ইহার পর স্নানাদি শেষ করিয়া মায়ীরা নানারূপ ফল সহ সেই ভূতের বাড়ীতে আগমন পূর্ব্বক যাহাতে তাঁহাদের আনীত ফলগুলি কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ উহা গ্রহণ করিয়া মায়ীদিগকে নানারূপ উপদেশ দিলেন। মায়ীরা এরূপে পরিচিত হইয়া ইহার পর প্রায়ই আসিয়া মহারাজকে দর্শন করিতেন।

এই ভূতবাড়ীতে অবস্থান কালে, মহারাজ ক্রমশঃ রামবাবুর বন্ধুবান্ধবগণের নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন। কালিকানন্দের পিতা বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার বন্ধু পূর্ণবাবুকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। রামবাবু আলীপুরে অবস্থান কালে গঙ্গাসাগরে পৌষ সংক্রান্তির সময় যে মেলা হয়, তাহার ভার প্রাপ্ত অফিসার হইয়াছিলেন। মহারাজ এ সুযোগে তাঁহার সহিত গঙ্গাসাগর দর্শন করিয়া আইসেন।

ইহার পর মহারাজ কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথে আগমন করেন। এখানে আসিয়া প্রথমতঃ মাসাধিককাল হনুমানটিকরীতে একটী খালি বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তপোবনে গমন করেন। রামবাবুর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বৈদ্যনাথে অবস্থান করিবেন। মহারাজও জানাইলেন যে, তপোবন তাঁহার বাসের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। এজন্যই এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহারাজ প্রথমে যাইয়া দয়াঘনের আশ্রমে বাস করিতে থাকেন। এখানে অবস্থান সময়ে কিরূপে তাঁহার মাতা আসিয়া পুত্রের সহিত মিলিত হন, তাহাও পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

এখন তপোবন দেখিলে কেহ বুঝিতেই পারিবেন না যে, ইহা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল। এ সময়ে পাহাড়ের উপরের গুহা, তদুপরি ক্ষুদ্র বাস গৃহ, সম্মুখস্থ বারান্দা ও তাহার দক্ষিণে অবস্থিত খোলা ছাদ, উপরে উঠিবার রাস্তা ইহাদের কিছুই ছিল না। পাহাড়ের নিম্নে কেবলমাত্র তপোবনের মন্দির ও তাহার

পার্শ্বস্থ প্রস্তরাচ্ছাদিত ধুনী ও গুহাটী মাত্র ছিল। ইহার উত্তর দিকে দয়াঘনের আশ্রমে বাসোপযোগী কয়েকটী গুহা ও সামান্য সামান্য আবাস স্থান ছিল। এই শেষোক্ত স্থান গুলি চৈতন্যঘনের শিষ্য দয়াঘনের অধিকারে ছিল। তবে এ সময়ে দয়াঘনও প্রায়ই তাঁহার গুরু চৈতন্যঘনের নিকট মুলতানগঞ্জে থাকিতেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন। মহারাজ যদিচ দয়াঘনের আশ্রমেই মউজগিরি সহিত থাকিতেন, তথাপি তিনি অধিকাংশ সময়ে পূর্ব্বোক্ত ধুনীতে অথবা পর্ব্বতের উপর কোন এক নির্জ্জন প্রদেশে আসন গ্রহণ করিয়া যোগাভ্যাসে নিমগ্ন থাকিতেন। কখনও দেওঘরে আসিয়া নিজের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যাদি নিজেই ঝোলায় বহিয়া লইয়া যাইতেন। এ প্রকারে অবস্থান সময়ে তাঁহার মাতৃদেবীর দেহরক্ষা এখানে হওয়ায় এ স্থানটীর উপর একটি আকর্ষণ তাঁহার আসিল। পূর্ব্বোক্ত ধুনী ও তপোনাথের মন্দির সংলগ্ন স্থানে দুর্গাগিরি বলিয়া অপর একটী সাধু থাকিতেন ও এ স্থানগুলি তাঁহারই অধিকারে ছিল। এই দুর্গাগিরি দেহত্যাগ করিবার সময় ইহার অধিকার মহারাজকে প্রদান করিলেন। ইহা হইবার পর মহারাজ রাত্রিকালে ধুনীতে অবস্থান ও দিবাভাগে উহার পার্শ্বস্থ গুহা বা পাহাড়ের উপরের কোন স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়ে কিছুদিনের জন্য (প্রায় তিন বৎসর) মউজগিরি যাইয়া পঞ্চকোট কাশীপুর ও অন্যত্র বাস করিয়াছিলেন। রামচরণ বাবু মধ্যে মধ্যে আসিয়া দর্শন করিয়া যাইতেন। ইহার পর কিরূপে তপোবনের শ্রীবৃদ্ধি হইল জানাইতেছি।

একদিন পাহাড়ের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে মহারাজ দেখিলেন যে, একস্থান হইতে সামান্য এক ফাঁক দেখা যাইতেছে। ইহা কিরূপ ফাঁক দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া মহারাজ ইহার ভিতর একটী বংশদণ্ড প্রবেশ করাইলেন। এরূপ করিতেই দেখিলেন যে, সমুদয় বংশদণ্ডটী উহার ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। ইহা হইতেই মহারাজের মনে আসিল যে, উপরে যখন পাহাড়ের আচ্ছাদন রহিয়াছে ও নীচে এরূপ ফাঁক আছে, তখন নীচের ভরাট মাটী অপসারণ করিলে একটী পর্ব্বত গুহা আবিষ্কৃত হইতে পারে। যেমন এই চিন্তা আসিল অমনি পরদিন হইতে কয়েকটী লোককে সঙ্গে লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মহারাজের স্থপতি-বিদ্যার কৌশল, তাঁহার অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পুরুষকার যাঁহারা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই তাঁহার এ মধ্য বয়সের উদ্যমশীলতা অনুমান করিতে পারিবেন। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে উপরোক্ত ফাঁক স্থানের মৃত্তিকা কয়েকদিনেই অপ-

সারিত হইলে এক বিস্তৃত গুহা বাহির হইয়া পড়িল। এই গহ্বরটী স্থানে স্থা
প্রাচীর-বেষ্টিত করিতেই বর্ত্তমান এই গুহার সৃষ্টি হইয়াছে।

রামবাবু ক্রমে ক্রমে সাধনাপথে অগ্রসর হইলে তাঁহার ইচ্ছা হইল
চাকরী ছাড়িয়া পেন্‌সন লইবেন ও একান্তে গুরুদেবের সমীপে থাকিয়া
বানের আরাধনা করিবেন! এই মানসে এক বৎসরের ফার্লো লইয়া
ঘর আসিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। এখা
বাস করিবেন বলিয়া জমির বন্দোবস্ত লইয়া বাড়ী আরম্ভ করিলেন। কিন্তু
সময়ে কলিকাতা ইটালী পদ্মপুকুরে এক সাহেবের একটী বাড়ী কিনিবে
বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। যে ভদ্রলোকটী তাঁহার অংশীদার হইবে বলি
কথা দিয়াছিলেন, তিনি পিছাইয়া গেলেন। রামবাবু কিন্তু পাছে তাঁহা
কথার অন্যথা হয় এজন্য ২৩ হাজার টাকা দিয়া উক্ত বাটী ক্রয় করি
কিছু ঋণগ্রস্ত হইলেন। দেওঘরে অবস্থানকালে উক্ত বাড়ী খরিদ হওয়া
সংবাদ পাইয়া রামবাবু ফার্লো উঠাইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার প
রামবাবু ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইলেই, পেন্‌সেন লইলেন ও ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরে
নিতান্ত অনুরোধে তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তি
২ বৎসর মাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে রামবাবুর দেওঘরের বাড়ী
নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এদিকে তাঁহার বাড়ী যেরূপ নির্ম্মিত হইতে লাগিল অমনি গুরুদেবের
উপরোক্ত গুহা ও উহার উপরিস্থ বাসের ঘর, সম্মুখস্থ বারান্দা ও খোলা ছা
ও নীচের ভোজনঘর ইত্যাদিও ক্রমে ক্রমে নিজ খরচ দ্বারা রামবাবু নির্ম্মাণ কর
ইলেন। ইহা প্রস্তুত হইলে গুরুদেব উপরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।
এ সময়েই পূর্ণানন্দ মহারাজ আসিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও মউজগিরি
স্বামীও পুনরায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রামবাবু সকলরূপ চাকরী
হইতে অবসর লইয়া দেওঘরে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি
প্রতি সপ্তাহে টম্‌টমে যাইয়া সস্ত্রীক গুরুদর্শন করিতেন ও সন্ধ্যায় তপোবন
হইতে ফিরিয়া আসিতেন। ক্রমে এ তপোবনে আরও অনেকের দীক্ষা হইল।
ইহার মধ্যে একজন হইতেছেন, লেখকের খুল্লতাত ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইঁহাকে শিষ্যত্বে পাইয়া মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি অনেকবার
বলিয়াছেন যে "রাম" ও "কৃষ্ণ" তাঁহার ডান হাত ও বাম হাত স্বরূপ ছিল।

তপোবনে উপরে উঠিবার যে পাথর কাটিয়া সিঁড়ি আছে তাহা প্রায়

মহারাজের নিজ হস্তে প্রস্তুত। তাঁহার এ সময়কার শারীরিক বলও অসাধারণ ছিল। বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড যাহা ৭।৮ জন লোকে হটাইতে পারিত না, মহারাজ নিজে অনায়াসেই তাহাকে হটাইয়া দূর করিতেন।

নীচে ধুনীর সম্মুখে যে মহাদেবের মন্দির আছে, ইহা বহু পরে নির্ম্মিত হয়। এ সময়ে মহারাজ বিচরণে ছিলেন। ইহা হইয়া ধুনীর শোভা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া মহারাজ এখনও দুঃখ করেন। এ প্রবন্ধে তপোবন সম্বন্ধে সমুদয় বিবরণ দিয়া শেষ করিব এজন্য আরও কতিপয় বিষয় শুনাইতে হইতেছে।

গুরুদেবের মাতৃদেবীর স্মৃতিকল্পে একটী-ক্ষুদ্র সমাধিমন্দির হইল ও মহারাজ এখানে অবস্থান করিতে আরম্ভ করায় ও ক্রমে ক্রমে আরও শিষ্যমণ্ডলী হইতে আরম্ভ হওয়ায়, এ স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। এ তপোবন পাহাড় হইতেছে লছমীপুরের ঘাটওয়ালী জমিদারীর অন্তর্ভূত। জমিদার হইতে ইহার বন্দোবস্তও লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যখন ইহা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল, তখন মহারাজকে এ স্থান হইতে দূরীভূত করিবার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। তপোবনের কতিপয় পাণ্ডা এ জমিদারের পক্ষ হইয়াই নানারূপ উৎপাত ও মোকদ্দমা আরম্ভ করিল। রামবাবু জীবিত থাকিতে থাকিতে ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। মহারাজকে আদালতে হাজির করাইবার জন্য চক্রান্ত করিয়া এক শমনজারি করিল। গুরুদেব আজীবন বিচরণশীল এক সাধু। বৈষয়িক ব্যাপার ইহা তিনি কিছুই জ্ঞাত নহেন। তপোবন লইয়া গোলযোগ ও তাহার উপর আদালত হইতে শমন পাইয়া, তিনি এ সমুদয় গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য এ স্থান ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এজন্য ঝোলা ও আসন স্কন্ধে লইয়া শমন পাইবার রাত্রেই জসিডীতে ট্রেণে উঠিয়া হিমালয়ের কোন নিভৃত স্থানে চলিয়া যাইবেন বলিয়া তপোবন ত্যাগ করিলেন। বৈদ্যনাথে আসিয়া তাঁহার মনে হইল যে, একবার রামবাবুকে না বলিয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য। এজন্য রাত্রি ১০ টার সময় রামবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ এ অসময়ে গুরুদেবকে আসিতে দেখিয়া রামবাবু যেন একটু বিস্মিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ জানাইলেন যে তিনি তপোবন ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন ও ইহার কারণ জানাইয়া সেই শমনখানি রামবাবুর হাতে দিলেন। তাঁহার সহিত যে বাক্যালাপ হইয়াছিল তাহা শুনাইতেছি। রামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! শরীরে যদি কোন প্রকার ব্যাধি হয় তবে শরীর ত্যাগ করা উচিত না উহার প্রতিকার,

করা উচিত?" মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "বাবা! ব্যাধি আছে দুইপ্রকার এক "প্রারাব্ধিক", অপর "আগন্তুক"। আগন্তুক ব্যাধি ঔষধ সেবন ও নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা আরোগ্য হয়, আর প্রারাব্ধিক ব্যাধি কিছুতেই আরোগ্য হয় না। ভোগদ্বারা ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শরীর শীঘ্র ত্যাগ হইলেই ব্যাধিও ক্ষয় হয়।" ইহা শুনিয়া রামবাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন যে "প্রথম হইতেই কোনরূপ প্রতিকার না করিয়া কোন্‌টী আগন্তুক ও কোন্‌টী প্রারাব্ধিক ইহা কি সচরাচর বুঝা যায়?" মহারাজ উত্তর দিলেন যে, "কোন কোন ক্ষেত্রে বুঝা যায়, তবে সচরাচর বুঝা যায় না সত্য।" ইহা শুনিয়া রামবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "প্রথমে যে ব্যাধি ছিল না, পরে হঠাৎ দেখা দিল, তাহা আগন্তুক কি প্রারাব্ধিক ইহা স্থির করিবার জন্য প্রথমে প্রতিকারের চেষ্টা করাইত যুক্তিসিদ্ধ।" মহারাজকে অগত্যা "হুঁ" বলিতে হইল। ইহা শুনিয়াই রামবাবু বলিলেন যে "শারীরিক ব্যাধি নিবারণের জন্য তাহা হইলে বিশেষজ্ঞ বৈদ্যের সাহায্য লওয়াই উচিত। মহারাজ "হুঁ" বলিলেন। তখনই রামবাবু হাসিয়া বলিলেন যে, "আপনি যে জন্য স্থান ত্যাগ করিবেন বলিতেছেন, তাহা ত একটা বিষয় সংক্রান্ত ব্যাধি। এ ব্যাধির চিকিৎসক হইতেছি ত আমরা। দেখুন আমার দ্বারা ইহার কোন প্রতিকার হয় কি না।" গোপনে গোপনে চক্রান্ত করিয়া যে উপরোক্ত শমন জারি হইয়াছিল রামবাবু ইহার কোন সংবাদই পান নাই। সে রাত্রে গুরুদেবকে নিজবাড়ীতে রাখিলেন। পরদিন রামবাবু সবডিবিসান আফিসার ও পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টার (রাধিকাবাবু সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমুদয় ব্যাপার বুঝাইয়া এইরূপ শমন বাহির করা যে অতি অন্যায় হইয়াছে তাহা বুঝাইলেন। রামবাবু বেশ আইনানুযায়ী বুঝাইলেন যে, বিপক্ষগণের প্রতি শান্তিভঙ্গের মোকদ্দমাই রুজু করা উচিত ছিল। উক্ত দুই আফিসার তাঁহাদের ভ্রম বুঝিয়া উল্টা ফৌজদারি মোকদ্দমা বিপক্ষগণের উপর রুজু করিলেন। সকলে তখন এই উপ্টা উৎপত্তি দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল ও নানা উপায় করিয়া তবে উহা হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এবার যদিচ এ মোকদ্দমা মিটিয়া গেল, কিন্তু পুনরায় নানা মোকদ্দমা একটীর পর একটী আরম্ভ হইতে লাগিল। মহারাজ ক্রমাগত এ সমুদয় ঝঞ্ঝাট হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ সমুদয় মোকদ্দমা চলিবার কালে মহাত্মা রামবাবু স্বর্গারোহণ করেন। মহারাজ এজন্য আরও তপোবন ত্যাগ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তখন অন্যান্য শিষ্যেরা মহারাজকে

অন্যত্র হটাইয়া রাখিয়া জিদ ধরিলেন যে, যতই আপদ বিপদ বা অর্থ খরচ হউক না কেন, তাঁহারা মোকদ্দমা চালাইয়া যাইবেন। এ সময়ের মধ্যে মহারাজ উত্তরখণ্ড, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ, কলিকাতার উপকণ্ঠ কাশীপুর ও মেদিনীপুরের কর্ণগড়ে অবস্থান করেন। এ তপোবন সংক্রান্ত মোকদ্দমাতের বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। ঘাটোয়ালও বুঝিলেন যে, ইহা সহজে মিটিবে না। পরে মহারাজের শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয়-সুরেশপ্রসাদসর্ব্বাধিকারী ও প্রসিদ্ধ উকীল রাসবিহারী বাবুকে মধ্যস্থতায় আনিয়া ইহার রফা নিষ্পত্তি হইয়াছে। তপোনাথের মন্দির ও তপোবনের মেলার আয় ঘাটোয়ালীকে দিয়া অন্যান্য সমুদয় মহারাজের হইয়াছে। পরে ঘাটোয়াল তপোনাথের সেবা ও পূজা ও মহারাজের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করিয়াছেন। এ তপোবন সম্বন্ধে মহারাজ আমাদিগকে কয়েকটী আশ্চর্য্য গল্পও শুনাইয়াছেন। অনেকবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, ইহা একটী বহু প্রাচীনসাধনার স্থান।

একটী গল্প এইরূপ। একদিন গুহার ভিতর একান্তে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কতক্ষণ ধ্যানাবস্থায় ছিলেন মনে নাই। কিন্তু যখন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন তখন দেখিলেন যে, এক বিচিত্র রংবিশিষ্ট সর্প তাহার বিশাল ফণাটী বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। সর্পের আর একটু বিশিষ্টতা এই ছিল যে, মানুষের গোঁপের মত অনেকগুলি দীর্ঘ দীর্ঘ রোম মুখে ছিল। ইহাকে দেখিয়া মহারাজ কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার ধারণা হইল যে ইহা কখনও সর্প নহে, তবে সর্পবেশে কোন মহাত্মা পরীক্ষা করিতেছেন। এইরূপ মনে হইতেই মহারাজ ত্রাটক মুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক এ সর্পের চক্ষুর সহিত নিজ চক্ষু সংযোগ করিলেন। ইহা করিতেই সাপটি ফণা সংযোগ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে গবাক্ষ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপর ঘটনাটি এইরূপ মহারাজ নিম্নে ধুনীতে রাত্রিকালে একাকী শয়ন করিয়া আছেন। তখন শীতকাল, এজন্য একখানি কম্বল তাঁহার গায়ে ছিল। রাত্রি বোধ হয় ১টা বা ২টার সময় তিনি বোধ করিলেন যে, কে যেন তাঁহার গা হইতে কম্বলখানি ফেলিয়া দিল। ইহা করিতেই তিনি সজাগ হইলেন। দেখিলেন যে কম্বলখানি বাস্তবিকই ধুনীর নীচে পড়িয়া আছে। এমন সময়ে দেখিলেন যে, কে যেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ও তাঁহাকে পাহাড়ের উপর যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। মহারাজ এ আহ্বানে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বা কেন ডাকিতেছ জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহার পিছনে পিছনে যেন একটা আবেশ ভরে উপরে চলিতে লাগিলেন। এরূপ ভাবে উপরের গুহা পর্য্যন্ত তাঁহাকে লইয়া গেল। গুহা দিনের

বেলায় তালাবন্ধ করিয়াছিলেন ইহা মহারাজের বেশ মনে ছিল। কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখিলেন গুহার দ্বার খোলা রহিয়াছে। যে, তাঁহাকে আগে ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। মহারাজও স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় গুহায় প্রবেশ করিলেন। গুহা অতিশয় অন্ধকারময় ছিল। এজন্য পূর্ব্বোক্ত আহ্বানকারীকে আর দেখিতে পাইলন না। গুহার ভিতর একটী নির্দ্দিষ্টস্থানে মহারাজের দিয়াশলাই ও বাতি থাকিত, এজন্য অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া উহাদের তল্লাস করিতেছেন, এরূপ সময়ে গুহাতে এক পরম উজ্জ্বল। অথচ নিগ্ধ বিজলীর আলোর মত আলো হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। এ আলো এত পরিষ্কার যে মেজেতে সূঁচ পড়িয়া থাকিলেও দেখা যাইত। পূর্ব্বোক্ত আহ্বানকারীকে কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। মহারাজের চিন্তা আসিতে লাগিল যে তিনি তখন জাগ্রত না স্বপ্নাবিষ্ট। এরূপ ভাবিতেই তিনি যেন সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। সকালে নীচের ধুনীতে মহারাজকে না দেখিয়া প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিল যে, মহারাজ বোধ হয় বেড়াইতে গিয়াছেন। অধিক বেলা হইলেও তাঁহাকে ফিরিতে না দেখিয়া সকলে উপরের গুহায় গেল। তখন প্রায় মধ্যাহ্নবেলা। কিন্তু যাইয়া দেখিল তখনও মহারাজ ধ্যানস্থ। সকলের আহ্বানে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল ও তিনি রাত্রির বিবরণ প্রকাশ করিলেন। এ তপোবনের এখন দিন দিন আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানে যাইবার যে পাকা রাস্তা এখন হইয়াছে, ইহা করিতে মহারাজের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার এক ভক্ত মাড়োয়ারী রমেশবাবু (বলদেব বাবুর পুত্র) দশহাজার টাকা এককালে প্রদান পূর্ব্বক ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের তদ্বিরে করাইয়া দিয়াছেন। কেরাণীবাদের আশ্রমে অনেকে একদিন সমবেত হইয়া চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক রাস্তাটি করাইবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বর বাবু এ সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। দশ হাজার টাকা খরচে হইতে পারিবে শুনিয়া তিনি তখন বলিলেন যে এজন্য নানা-লোকের নিকট সাহায্য লইবার আবশ্যক নাই। তিনি নিজেই দশহাজার টাকা দিবেন। এজন্য ডেপুটি কমিশনারের সহিত লেখালেখি করিতে বলিলেন। পরে এককালে দশহাজার টাকা দান করিয়াছিলেন!

তপোবনে নির্ম্মিত উপর ও নীচের ঘরগুলি পুরাতন হওয়ায় গত বৎসর ১৯২৮ (খৃঃ অঃ) মহারাজ বহু টাকা ব্যয় করিয়া এ গুলিকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ভবিষ্যতে আরও কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ইচ্ছা আছে।

(ক্রমশঃ)

কবিবর ৺দাশরথি রায় মহাশয়ের

অনুপ্রাস মাধুর্য্য।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দাশরথি প্রথম শ্রেণীর কবি নহেন। তাঁহার নিকট কবিকঙ্কণ চণ্ডী বা অন্নদামঙ্গল আশা করা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে ১৫৩৭ অব্দে (৩) মুসলমান আমলে কবির কাব্য লিখিত হয়। তখন আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, কাব্য লেখার মর্য্যাদা ছিল এবং গুণগ্রাহী দেশীয় রাজগণ কবির সম্মান করিতেন। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া কাব্যাদি রচনা করেন। তাঁহার অন্নদাতা কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজা কবিকে বহু জমি জায়গা প্রদান করেন। স্থান কাল অনুকূল থাকায় কাব্য লেখায় কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন ঘটে নাই। ভারতচন্দ্র রায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় সভাকবি ছিলেন।

ইংরাজ রাজার আমলে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ১২১২ সালে দাশরথি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বুদ্ধি ছিল খুব কিন্তু লেখা পড়া শিখিতে তেমন পারেন নাই। তথাপি বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও সামান্য মাত্র ইংরাজী শিক্ষা করিয়াই গানের দিকে ঝুঁকিলেন। স্থান কাল তাঁহার অনুকূল ছিল না। মাতুলান্নে প্রতিপালিত

---

(১) অর্দ্ধচন্দ্র মানে গলা ধাক্কা দেওয়া। দীনেশ বাবু কবিওয়ালা বলিয়া ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালীর সম্যক্ আলোচনা করেন নাই। সেই জন্যই বোধ হয় কবিকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

(২) বঙ্গবাসী সংস্করণ "৺দাশরথি রায়ের পাঁচালী" উদ্ধৃত অভিমত সংগ্রহে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর কাব্যবিনোদ মহাশয় লিখিত।

(৩) দীনেশ বাবুর অনুমান। কবির উক্তি "শকে রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। সেইকালে দিলা গীত হরের বনিতা॥" রস ছয়ও হয়, নয়ও হয়। ছয় ধরিলে ১৪৬৬ শকাব্দায় "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর" সৃষ্টি হয়। তাহা হইলে কবির জন্ম অনুমান ১৪৪০ শকাব্দা ধরা যায়।

হইয়া অক্ষয়া বায়তিনির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সংসর্গের দোষে তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা ম্লান হইয়াছিল। (১)

কবির জীবনী-লেখক প্রকৃতই বলিয়াছেন, "হায় কি আক্ষেপের বিষয়! দাশরথির বুদ্ধি প্রতিভা পীলার নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর ও পাটুলীর টোল চতুষ্পাটীর অধ্যাপক পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে অথবা নিজগ্রামের মহাত্মা ভৈরব চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কীর্ত্তি কলাপে ও তাঁর চরিত্রে ঈর্ষা না করিয়া, নীলকণ্ঠ হালদারের কবি-সঙ্গীত-রচনালব্ধ প্রতিষ্ঠার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইল।"

সেই ঈর্ষার ফলে তিনি একজন কবিওয়ালার তালিকায় পড়িলেন। কবিওয়ালা বা পাঁচালী-গাথক নামে বিখ্যাত হইলেও তাঁহার শ্যামা-সঙ্গীত আত্মবিলাপ এবং সমস্ত দেব-দেবী বিষয়ক সঙ্গীতগুলিই নৈশ—শিশির—পরিষিক্ত করবীর ন্যায় অথবা সরোজিনীর ন্যায় সমুজ্জ্বল—ভক্তিমধুরসে পরিপূর্ণ। আর—সমস্ত কবিতাই প্রায় উত্তম মিলনে মিলিত। ত এর সঙ্গে থ, ম এর সঙ্গে ন, জ এর সঙ্গে ঝ, কিংবা ক এর সঙ্গে খ এর মিল নাই। এ বিষয়ে কবি দাশরাথ খুব সাবধান।

প্রাচীন কবিগণের উত্তম মিলের দিকে প্রায় নজরই থাকিত না। শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থ গুলি পাঠ করিলেই এ বিষয়ের প্রমাণ পাইবেন। দাশরথির শব্দ-সম্পদ-ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল। যেখানে যে কথাটি স্থাপন করিলে বেশ সুষ্ঠু হয়, সেখানে সেই সেই শব্দই সন্নিবেশিত করিতে তাঁহাকে ঘর্ম্মজল ফেলিতে হয় নাই। শব্দশাস্ত্রেও তাঁহার চমৎকার অধিকার ছিল। (২)

রুক্মিণী-হরণ" পালায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূতরূপে আগত ব্রাহ্মণের ভোজন "পর্ব্বটি দেখুন :—

(১) অথবা অক্ষয়ার সংসর্গেই কবিত্ব-রস জাগিয়া উঠিয়াছিল কিনা বলা যায় না। রামী রজকিনীর প্রেমমুগ্ধ দ্বিজ-চণ্ডীদাস রামীর সংসর্গেই কবিকুলপূজ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস দীপ্তসূর্য্য সদৃশ ; দাশরথি সামান্য তারকা মাত্র। তুলনা করিতেছি না, তুলনা হয়ও না। কেননা চণ্ডীদাসের রামী জীবনে মরণে সঙ্গিনী। দশরথি অক্ষয়ার প্রেমরসে দিনকতক নিমগ্ন ছিলেন মাত্র। পরে তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হন।

(২) ৺ভারত চন্দ্রের কাব্যনিচয়কে কোনও সমালোচকপুঙ্গব বলিয়াছেন "ভাষার তাজ-মহল"। ইঁহার সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথা বলা চলে।

"জিজ্ঞাসেন নন্দ নন্দন কেমন বটে রন্ধন ?
সূপকার তো সুপক্ক করেছে ?
দ্বিজ বলে করি তাক শাক বড় হয়েছে পাক,
সব হারি মেনেছে শাকের কাছে ॥
বলিছে করি নির্ঘণ্ট, আশ্চর্য্য হয়েছে ঘণ্ট,
কচুর শাকের, ওহে হরি !
চিনি গোল্লা মিছরি মিছে, ফাঁক ফাঁক সব শাকের নীচে
কি সৃষ্টি করেছেন শাকম্ভরী ॥
জন্মে যাহা খাই নাই কভু, প্রচুর খাওয়ালেন প্রভু !
ভোজনটি খুব হলো কিন্তু এখানে।
ক্ষীর ক্ষীর সে কেবল পোষক, বাড়ার ভাগ কি আবশ্যক,
নালিতের শাক চালিতের অম্বল যেখানে ?
খায় দ্বিজ উদর পূরি, রুচি পূর্ব্বক পূরী কচুরী,
ধরে না তবু পোরে আত্তি মন।
ঊর্দ্ধশ্বাস উপজিল, উদরীর মত উদর হৈল,
উঠে শেষে সাধ্য কি আচমন !

হাস্যরসের অবতারণায় কবির অদ্ভুত শক্তি। কথায় কথায় রহস্য। গানের মজলিসে, বরযাত্রার সভায়, কবির আখড়ায় সর্ব্বত্রই সস্মিতবদন রায় মহাশয় বিদ্রূপবিষদিগ্ধ রহস্য-লাড্ডুক বিতরণ করিয়াছেন।

দানেশ বাবু কেবল বৈষ্ণব-নিন্দার কবিতা-গুলি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে "দাশু যে স্থলে গালি দিবেন, সেখানে তাঁহার লেখনীসংযম অভ্যাস নাই। শত্রুর গালে চুণকালী দিয়া তিনি তামাসা দেখিতেন।"

কিন্তু ঐ শত্রুতা যতক্ষণ কবির লড়াই ততক্ষণই। পরে সাজঘরে আসিয়া গলাগলি মিলন ! স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের ন্যায় তিনি কোনও সম্প্রদায়কেই ছাড়িয়া কথা কন নাই। যেখানে ভণ্ডামী সেখানেই চাবুক, সে যে সম্প্রদায়ই হউক না কেন ? "শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ" পালায় "কলির ব্রাহ্মণ" শীর্ষক পাঁচালীটি দেখুন ! নিজের জাতির গলদটা কেমন করিয়া দেখাইয়াছেন !

(ক্রমশঃ)

শঙ্খ।

লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

শঙ্খ বলে মোর গুণ সাবাসে সকলে।
সাগরে জনম মোর বাস করি জলে॥
সকল মঙ্গল কার্য্যে আমাকেই ডাকে।
নারীগণ সন্ধ্যাকালে বাজাইয়া থাকে॥
বিবাহ বা পূজা আদি মঙ্গল উৎসবে।
পরিপূর্ণ হয় ধরা মোর ঘোর রবে।
আমি সকলের শ্রেষ্ঠ জানে সর্ব্বজন।
যথা লোকে করে পূজা অগ্রে গজানন॥
কিন্তু সেই গজানন পূজার সময়।
আমারে বাজায় অগ্রে তবে পূজা হয়॥
গজানন চেয়ে দেখ শ্রেষ্ঠ হই আমি।
আমার কি গুণ তাহা জানে অন্তর্যামী॥
প্রতিগৃহে বাস মোর ধরার ভিতরে।
বিশেষতঃ নারী জাতি আমারে আদরে॥
কিন্তু মোর মনে সদা এই বড় দুখ।
বাজায় আমার ভায়া দিয়া মুখে মুখ॥
কোথা ওহে দীনবন্ধু দেব নারায়ণ।
আমার বিষাদ দেব করুন মোচন॥
শুনিয়া শঙ্খের বাণী কহে নারায়ণ।
কেন শঙ্খ কর তুমি খেদ অকারণ॥
আমার দক্ষিণ হস্তে সদা তব বাস।
তোমার রবেতে হয় ভুবনের ত্রাস॥
নামিলাম পাপ মর্ত্তে তোমার বিষাদে।
চাঁদের কলঙ্ক শুনি চাঁদ কভু কাঁদে?
সুস্থির হইল শঙ্খ শুনি এ বচন।
আনন্দে বৈকুণ্ঠে হরি করেন গমন॥

শক্তি।

লেখিকা—শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু বি, এ,।

শক্তির অভাব নাই;—যে শক্তি দিয়াছ মোরে,
সেই শক্তি ধ'রে
বিধাতার এ অনন্ত ধামে
—দক্ষিণে ও বামে—
একটি স্বতন্ত্র সাম্য আত্ম-অধিকারে
পারি স্থাপিবারে!
নহে এ মন্ত্রের শক্তি—মায়া মায়াবীর,
অথবা শারীর,
মানসিক কোন শক্তি কিছু,
তবু সবা হ'তে উচু;এই সবা হ'তে নীচু!
হে আমার মহাশক্তি দেবি!
সাধনায় সেবি,
তোমার ও রাতুল চরণাব্জ দু'খানি,
মোর অভিমানী
আত্মা লুটিয়া লুটিয়া বিশ্বে
প্রাকৃতিক দৃশ্যে
যুগে যুগে এক হ'য়ে গেছে। আজি তাই
নহি অকিঞ্চন,;আকিঞ্চন কিছু মোর নাই।

আবাহন।

[ইমন—একতালা।]

১

কতকাল ধরে, দেখিনি যে সবে,
প্রাণের প্রতিমা, প্রাণ উমায়।
ব'সে আছি তাই, পথপানে চেয়ে,
প্রাণের প্রতিমা, প্রাণেতে আয়॥

২

চাও মাগো ফিরে, করুণ নয়নে,
দেখ মাগো তব, সন্তানগণে,
এসেছি যে মোরা, সাজাতে তারিণী,
ভক্তি ফুল হারে, রাঙ্গা পা দুখানি,
এস মা দুর্গে, এস মা দুর্গে,
এস মা অভয়-দায়িনী।
এস মা শক্তি, এস মা মুক্তি,
এস মা জগত পালিনী ॥

৩

এসেছি যে মাগো, তোমারই কাছে,
জুড়াও প্রাণের জ্বালা,
ধর মা ধর মা মিনতি মোদের
ধর মা পুষ্প মালা—
দীন সন্তানে যাচে রাঙ্গা পায়
পাপী তাপী বলে ঠেল না গো পায়
রাখ মা ভবানী, রাখ নিস্তারিণী
হোয়ো নাক মাগো পাষাণী ॥
এস মা দুর্গে ইত্যাদি

৪

কেঁদে কেঁদে মাগো দৈন্যেরি কারণ,
জরাজীর্ণ সবে তাই ভগ্নীগণ
সহেনা যে আর বেদনার ভার
করুণ নয়নে চাহ একবার
বাজেনা কি বুকে, ও মা ত্রিনয়নি !
সন্তানের ব্যথা, পতিত-পাবনী
মা হইয়ে মাগো হোয়ো না ঈশানী
এতই কঠিনা এতই পাষাণী ॥
এস মা দুর্গে ইত্যাদি

প্রাচীন গল্প সংগ্রহ।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই।

[শ্রীহজবরল-লিখিত]

এক দল চোর জনৈক গৃহস্থের বাটিতে সিঁদ দিয়া পিতল কাঁসার যত ঘরকন্নার জিনিষ ছিল সব চুরি করিয়া নিকটস্থ একটা বাগানে জমা করে। চোরেরা গৃহস্থের কাঁথা বালিশ পর্য্যন্ত ছাড়ে নাই। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল! কি উপায়ে অপহৃত দ্রব্য সকল গ্রামান্তরে সরাইয়া লইয়া যাইবে তৎসম্বন্ধে মন্ত্রণা করিবার জন্য তাহারা পুকুর পাড়ে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে স্থির করিল যে, একখানা দড়ীর খাট যোগাড় করিতে হইবে ও তাহার উপর অপহৃত দ্রব্য সকল রাখিয়া তাহার উপর কাঁথা চাপাইয়া দিয়া শবদেহ তীরস্থ করিবার ভাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ঘাটি পার হইয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে দুইজন তখন মড়ার খাট পছন্দ করিয়া দোকানদারকে তাহার দাম জিজ্ঞাসা করিল। দোকানদার যে দাম বলিল তাহাতেই রাজী হইয়া খাটখানি লইয়া তাহারা সেই বাগানে আসিয়া অন্যান্য চোরের সহিত মিলিত হইল ও খাটের উপর অপহৃত দ্রব্য সকল চাপাইয়া কাঁথা ঢাকা দিল। তার পর তাহারা সেই খাট কাঁধে করিয়া নিঃশব্দে বাগান হইতে বাহির হইয়া সদর রাস্তায় পড়িয়া "রাম নাম সত্য" এই বাক্য সমস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে চলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দুই তিন জন চোর ক্রন্দনের সুরে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"বাপ্‌রে বাপ, বাপ্‌রে বাপ্‌, কাঁহাগিয়া বাপ্‌।"

রাত্রি তখন প্রভাত হইয়াছে। অপর দিক হইতে একজন পথিক সেই রাস্তা দিয়া আসিতেছিল। সে শববাহীদের নিকটবর্ত্তী হইলে, দেখিতে পাইল যে, সেই দড়ীর খাটের ফাক দিয়া একটি গাড়ুর নল বাহির হইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, "গাড়ুর নল ঢাক।"

"বাপ্‌রে বাপ্‌, বাপ্‌রে বাপ্‌, কাঁহা গিয়া বাপ্‌।" "গাড়ুর নল ঢাক।

শববাহীরা নিজেদের মধ্যে চোরের ভাষায় কথা কহিয়া স্থির করিল যে, এই লোকটাও চোর, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে, সুতরাং তাহার মুখ বন্ধ করা উচিত। চোরেরা তখনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—

"ভাগ নেবে ত এস।"

চোরের কথা চোরে বুঝে। সেই লোকটা অমনি খাটের নিকটে আসিয়া—খাটে কাঁধ দিয়া চলিতে চলিতে বলিতে আরম্ভ করিল—"ও ভাই, কবে ম'ল মেসো।"

"ভাগ নেবে ত এসো।"

"ও ভাই কবে মল মেসো।"

——— অবতার।

কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়।

লেখক—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা থানার সীমান্তর্গত, পদ্মাতীরস্থ, তেলিয়া বুধুরী গ্রামের রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ সহোদরদ্বয়ের নাম বৈষ্ণব সমাজে ও বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। আমরা বক্ষ্যমান প্রবন্ধে, উক্ত ভগবদ্ভক্ত ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয়ঃ—বৈদ্যবংশ-সম্ভূত উভয় ভ্রাতাই বিখ্যাত পদকর্ত্তা এবং গৌর-গণান্তর্গত অষ্ট-কবিরাজশাখাভুক্ত। ইহাদের পিতার নাম, চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম, সুনন্দা দেবী (যিনি শ্রীখণ্ডনিবাসী, শক্তিমন্ত্রোপাসক, দিগ্বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিত, জ্যোতির্ব্বিদ ও মহাকবি বিখ্যাত দামোদর সেনের কন্যা ছিলেন)। চিরঞ্জীব চৈতন্যদেবের "বিশিষ্ট পরিকর ও বিজ্ঞতর পার্ষদ" বলিয়া অভিহিত হইতেন। ধর্ম্মপ্রাণ চিরঞ্জীব দিবারাত্রি সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া থাকিতেন। তিনি প্রতি বৎসরই রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিবার জন্য পুরীধাম গমন করিতেন। চিরঞ্জীব শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্ব নিবাস (কাটোয়ার নিকট, মাজিগ্রামের ৩ মাইল দূরবর্ত্তী) কুমারনগর ত্যাগ করিয়া চিরঞ্জীব শ্বশুরালয় শ্রীখণ্ডে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্রেরা পুনর্ব্বার কুমারনগরের পৈতৃক বাসভূমিতে বাস করিতে আরম্ভ করিলে, তথাকার বৈষ্ণববেষী শাক্তগণের উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া, পৈতৃকভিটা পরিত্যাগ পূর্ব্বক (বর্ত্তমান ভগবানগোলা, ই, বি, আর, ষ্টেসনের সন্নিকটে অবস্থিত, পদ্মাতীরবর্ত্তী) তেলিয়া বুধুরী গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

রামচন্দ্র কবিরাজঃ—১৪৫৮ শকে (১৫৩৬ খৃঃঅব্দে) রামচন্দ্র মাতুলালয়ে কুমার-নগরে জন্মপরিগ্রহ করেন। তিনি অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত রচনায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। যাহাহউক রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু তিনি বাঙ্গালা রচনায় অধিকতর মনোযোগী হইলে বোধ হয় যে বৈষ্ণব সমাজের শিরোভূষণ হইতে পারিতেন।

দীক্ষা ও পাণ্ডিত্যঃ—১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ অব্দে) ৺শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভু রামচন্দ্রকে দীক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা প্রভাবে, এক মাসের মধ্যেই ভক্তিশাস্ত্রে যৎপরোনাস্তি পাণ্ডিত্য অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ যেমন প্রশংসিত পণ্ডিত তেমনি পরম রূপবানও ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে ইহার রূপগুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"বুধুরী নিবাস রামচন্দ্র কবিরাজ। শাস্ত্রজ্ঞ প্রশংসনীয় পণ্ডিত সমাজ।"
রামচন্দ্র কবিরাজ গৌউর বরণ। সুদৃশ্য সৌন্দর্য্যসখা জিনিঞা মদন॥"
(ভক্তমাল—১৯ মালা)

রামচন্দ্র কবিরাজ বিরচিত পুস্তকঃ—"স্মরণ-দর্পণ" "বঙ্গজয়"ও "সাধনচন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থত্রয় ও রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কতকগুলি বাঙ্গলা পদ রামচন্দ্র কবিরাজের বিরচিত। তাঁহার "বঙ্গজয়" পদ্যগ্রন্থ, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এখানি বৃহৎ পদ্যে লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

রামচন্দ্রের কবিরাজ উপাধিঃ—শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু শ্রীজীবগোস্বামীর আদেশপত্রানুসারে ১৫০২ শকে (১৫৮২ খৃঃ অব্দে) মাঘী বাসন্তী পঞ্চমীর দিনে বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হন। কিছু দিনের মধ্যেই রামচন্দ্রও আচার্য্য প্রভুর অনুসন্ধানে গৌড়ধাম হইতে ব্রজধাম গমন করেন। সেই সময় রামচন্দ্রের কবিত্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ব্রজধামের গোস্বামী মোহান্তগণ রামচন্দ্রকে "কবিরাজ" উপাধিতে বিভূষিত করেন।

ঐ বৎসর বর্ষাগমের পূর্ব্বেই রামচন্দ্র কবিরাজ, আচার্য্য ও শ্যামানন্দ তিনজনে বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবগোস্বামীপ্রদত্ত "চৈতন্য চরিতামৃতাদি" বহুগ্রন্থ সহ বিষ্ণুপুরে আগমন করেন। বিষ্ণুপুরে দুইমাস অবস্থিতির পর রামচন্দ্র আচার্য্য-প্রভুসহ (১৫৮৩ খৃঃ অব্দে) ১৫০৪ শকে মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কাঞ্চন গড়িয়ার বিরাট মহোৎসবে যোগদান পূর্ব্বক মহোৎসবান্তে আচার্য্য প্রভুকে

সঙ্গে লইয়া নিজালয় তেলিয়া-বুধুরীতে উপনীত হন। তৎপূর্ব্বেই রামচন্দ্রের আদেশমত তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা গোবিন্দও পৈতৃক বাসভূমি কুমারনগর ত্যাগ করিয়া তেলিয়া বুধুরীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য প্রভুর বুধুরীতে অবস্থান কালে, রাজসাহীজেলার পদ্মাতীরস্থ গোপালপুরের উত্তরাঢ়ীয় কায়স্থ রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র বিখ্যাত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও আচার্য্য সহ সাক্ষাৎ জন্য তেলিয়া বুধুরীতে আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময় রামচন্দ্রের সহিত নরোত্তমের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই উভয় ভক্ত সেইদিন হইতে সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পর পরস্পরের নিকট চিরতরে আত্মবিক্রীত হন। শিখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণ সেন, পক্বপল্লীর রাজা নরসিংহ রায় প্রভৃতি তাঁহার (নরোত্তমের) অনেকগুলি অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

(১৫৮৩ খৃঃ অব্দে) ১৫০৪ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরীতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠোপলক্ষে যে মহামহোৎসব হয়, রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য প্রভুসহ খেতুরীর সেই বিরাট মহোৎসবে যোগদান করেন। মহোৎসবান্তে কবিরাজ ও ঠাকুর, অভিন্নহৃদয় উভয়ভক্ত, একত্রে খেতুরীতে গমন করিয়া ভজন-সাধনানন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ঐ বৎসর রাসপূর্ণিমার সময়, রামচন্দ্র ও নরোত্তম বিষ্ণুপুরের (খেতুরীর ন্যায় একটি বিরাট মহোৎসবে) মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুর সহ গমন করিয়াছিলেন। উক্ত মহোৎসবে নরোত্তম গড়ের হাটী কীর্ত্তনসম্প্রদায় * লইয়া গিয়াছিলেন। ৪ মাস পরে কবিরাজ ও ঠাকুর মহাশয় খেতুরীতে প্রত্যাগমন করেন।

(১৫৮৩ খৃঃ অব্দে) ১৫০৪ শকে চৈত্রমাসে আচার্য্যপ্রভু, কবিরাজ ও ঠাকুর একত্রে (পূর্ব্বপরামর্শমত) নবদ্বীপধাম দর্শন পূর্ব্বক শ্রীখণ্ড ও তথা হইতে, তিন জনেই মাজিগ্রামে আচার্য্যাশ্রমে আগমন করেন।

(১৫৮৪ খৃঃ অব্দে) ১৫০৬ শকে পুনরায় তিনজনেই কিছুদিনের জন্য খেতুরী ও তথা হইতে শ্রীখণ্ড যাত্রা করেন।

রামচন্দ্রের ব্রাহ্মণ শিষ্য :—রামচন্দ্র ও নরোত্তমের গুণে মুগ্ধ হইয়া সে সময় অনেক ব্রাহ্মণও তাঁহাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সৈদাবাদ আচার্য্য

* তিন প্রকার কীর্ত্তনের নাম গ্রন্থে পাওয়া যায়। (১) গড়ের হাটী (২) মনোহর সাহী ও (৩) বেনেটী। পৃথক্ পৃথক্ ৩টী পরগণার নামানুসারে এই ৩টী নামের সৃষ্টি।

পাড়ার ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ রামকৃষ্ণ আচার্য্য, রামচন্দ্র কবিরাজের (জাতি বৈদ্য হইলেও) গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হন।*

রামচন্দ্রের লীলা সম্বরণ :—১৫৩২ শকে (১৬১০ খৃঃ অব্দে) রামচন্দ্র কবিরাজ তদীয় গুরুদেব শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু সহ বৃন্দাবনধাম গমন করেন। ঐ বৎসর কার্ত্তিকের শুক্লাষ্টমীতে আচার্য্য প্রভু শ্রীধামেই অপ্রকট হন। ইহার অল্পকাল পরেই ৭৪ বৎসর বয়সে রামচন্দ্র কবিরাজও তদীয় ইষ্টদেব আচার্য্য প্রভুর পন্থানুসরণ করেন।

সমাধি :—বৃন্দাবনে ধীর-সমীরণ কুঞ্জের নিকটস্থ আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও তদীয় প্রিয়শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের সমাধি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া তীর্থক্ষেত্ররূপে বিরাজ করিতেছে।

রামকৃষ্ণপুত্র কৃষ্ণচরণ ও নরোত্তমশিষ্য গান্তীলাগ্রামের (বালুচরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম) বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ ও মহাপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ "চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের" নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গান্তীলায় অবস্থিতি করেন।

রামকৃষ্ণ ও হরিরাম বংশীয়গণ এক্ষণে সৈদাবাদের অধিবাসী।

রামচন্দ্রের বিগ্রহ ও বর্ত্তমান বংশধর :—এখনও বুধুরীর পশ্চিম পাড়ায়, রামচন্দ্র কবিরাজের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে। কবিরাজ ঠাকুরের অধস্তন নবম পুরুষ, শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ কবিরাজ মহাশয় বর্ত্তমানে কায়ক্লেশে উক্ত বিগ্রহের সেবা পূজাদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। বৈষ্ণব সমাজের করুণদৃষ্টি এই দুঃস্থ বংশধরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গৌরাঙ্গ লীলার রামচন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণলীলায় সুলোচনা ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

* কথিত আছে যে :—লোয়াস গ্রামের (পূর্ব্বমুর্শিদাবাদের মধ্যে) শক্তি উপাসক ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীনিত্যানন্দ আচার্য্যের পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণ আচার্য্য দুর্গাপূজার বলিদানের জন্য ছাগ মেষাদি ক্রয় করিতে আসিয়া সমাজশাসন অগ্রাহ্য পূর্ব্বক, প্রেম ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া নরোত্তম ঠাকুরের চরণাশ্রিত হন। সেই সময় হরিরাম, রামচন্দ্র কবিরাজের এবং রামকৃষ্ণ নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হন। ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই রামকৃষ্ণের বা তৎপুত্র কৃষ্ণচরণের শিষ্য বলিয়া পরিচিত।

গোবিন্দ কবিরাজ ঃ—১৪৬১ শকে (১৫৩৯ খৃঃ) গোবিন্দ কবিরাজের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র অপেক্ষা কনিষ্ঠ গোবিন্দ ৩ বৎসরের ছোট ছিলেন। কথিত আছে যে, রামচন্দ্র তেলিয়া বুধুরীতে উঠিয়া যাওয়ার পরও গোবিন্দ কিছু দিন কুমার নগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পরে জ্যেষ্ঠের আদেশ মত গোবিন্দ তাঁহার মাতা সুনন্দা দেবী, ভ্রাতৃজায়া (রামচন্দ্র পত্নী) রত্নমালা এবং ভাগিনেয় বলরাম (বিখ্যাত পদকর্ত্তা বলরাম দাস কবিরাজ) সহ পৈতৃক বাসস্থান কুমার নগরের বাস ও পিতৃস্বসা মালিনী দেবীর অভিভাবকত্ব ত্যাগ করিয়া বুধুরী গ্রামে আগমন পূর্ব্বক বাস স্থাপন করেন। পরে তাহাদের শিষ্য, তেলিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারগণ কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বুধুরী হইতে তেলিয়া লইয়া গিয়া তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

গোবিন্দের দীক্ষা গ্রহণ ঃ—শক্তি মন্ত্রের উপাসক মাতামহালয়ে প্রতিপালিত কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে শাক্ত ছিলেন। গোবিন্দের সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে ১৭শ মালায় এইরূপ লিখিত আছে ঃ—"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ নিবাস বুধুরী উপাসনা মহামায়া শক্তি শ্রীশঙ্করী। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবী হন কবিরাজে। প্রতিমা রূপেতে এক মূর্ত্তিতে বিরাজে।" কথিত আছে যে, এক সময়ে গ্রহণী রোগে প্রপীড়িত হইয়া গোবিন্দ ভক্তিভরে একান্তশরণে মাতা ভগবতীকে ডাকিতে আরম্ভ করিলে ভগবতী তাঁহাকে এইরূপ প্রত্যাদেশ করেন—"আকাশবাণীতে দেবী কহে বারবার। গোবিন্দ শরণ লও হইবে নিস্তার॥" "কৃষ্ণ না ভজিলে না ঘুচে দুর্গতি।" "রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র সর্ব্ব মন্ত্র সার হয়। সেই পাদপদ্ম তুমি কর আশ্রয়॥" ইত্যাদি। এই প্রত্যাদেশের পর গোবিন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নিকট রাধাকৃষ্ণ যুগল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক রোগমুক্তহন। "এত কহি হরি নাম মহামন্ত্র দিলা। স্নেহ করি শ্রীচরণ মস্তকে অর্পিলা॥ তৎক্ষণাৎ তার সর্ব্বরোগ শান্তি হৈল। স্বচ্ছন্দ পাইয়া তবে উঠিয়া বসিল॥" (ভক্তমাল ১৭ শ মালা) ১৫০৪ শকে (১৫৮৩ খৃঃ) মাঘীকৃষ্ণা একাদশীতে, কাঞ্চন গড়িয়ার মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ সহ আচার্য্যপ্রভু তেলিয়া বুধুরীতে আগমন পূর্ব্বক গোবিন্দকে দীক্ষা দান করেন। অতঃপর তিনি সপার্ষদ খেতুরীর মহোৎসবে (১৫০৪ শকে ফাল্গুনী পুর্ণিমায়) শুভাগমন করেন। ১৫০৪ শকের মাঘী কৃষ্ণএকাদশী তিথির পর ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্ব সময় মধ্যে গোবিন্দের দীক্ষা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। দীক্ষার পর "শ্রীগোবিন্দ দাস ঠাকুর" তাঁহার নাম হয়।

গোবিন্দের দীক্ষা সময় ও জন্ম কাল লইয়া বর্ত্তমানেয় বৈষ্ণব সাহিত্য-সেবীগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাবু ক্ষীরোদ প্রসাদ চৌধুরী মহাশয় ১২৯৯। আশ্বিনের সাহিত্য পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, ১৫২৫ খৃঃ গোবিন্দের জন্ম হয়। বাবু শিবরতন মিত্র প্রণীত "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" মতে গোবিন্দের জন্ম ১৫৩৮ খৃঃ, দীক্ষা ১৫৭৭ খৃঃ মৃত্যু ১৬১৩ খৃঃ অব্দে। রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুরের "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য" মতে জন্ম ১৫৩৭ খৃঃ, দীক্ষা ১৫৭৭ খঃ মৃত্যু ১৬১২ খঃ অব্দে। বাবু মুরারি লাল অধিকারীর "বৈষ্ণব দিগ্ দর্শনী" মতে জন্ম ১৫২৭, দীক্ষা ১৫৮৩, মৃত্যু ১৬১২ খঃ অব্দে। বিশ্বকোষের মতে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে গোবিন্দের জন্ম। অনেকে আবার গোবিন্দকে জ্যেষ্ঠ ও রামচন্দ্রকে কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। বর্ত্তমানের বৈষ্ণব সাহিত্যসেবীগণ দয়া করিয়া বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক গোবিন্দের জন্ম ও দীক্ষালাভ এবং মৃত্যুকাল অভ্রান্তরূপে স্থির করিয়া দিলে আমরা পরম উপকৃত ও বাধিত হইব।

ভক্তমালে লিখিত আছে যে ঃ—রামচন্দ্র বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণকালে অনুজ গোবিন্দকেও বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ জন্য অনেক অনুরোধ করেন, কিন্তু গোবিন্দ অগ্রজের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন। পরে দেবীর আদেশে প্রাণরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

গোবিন্দ দাসের গ্রন্থ রচনা ঃ—গোবিন্দ কবিরাজও রামচন্দ্রের ন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ১৫০১ শকে (১৫৭৯ খৃঃ অব্দে) তিনি "সঙ্গীত মাধব" নাটক ও "কর্ণামৃত" কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৫০৩ শকে (১৫৮১ খৃঃ অব্দে) সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার বিরচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক পদাবলীর সংখ্যা অনেক ছিল। তাঁহার লিখিত পদগ্রন্থ মধ্যে "গৌরাখ্যান" "গীতামৃত" ও "অষ্টকালীয় একান্ন পদ" এই তিন খানির নাম পাওয়া যায়। তিনি পদকর্ত্তা বলিয়াই বৈষ্ণব সমাজে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রচিত পদ সকল যেমন কোমল, তেমনি কবিত্ব ও ভক্তিব্যঞ্জক এবং ভাবপ্রবণ। তাঁহার রচনায় বাঙ্গলা ভাষার সহিত হিন্দি ও মৈথিল ভাষা মিশ্রিত, সেই কারণেই তাঁহার পদসকল অতীব শ্রুতিমধুর। যাহাহউক উৎকৃষ্ট পদাবলী রচনার জন্যই গোবিন্দ কবিরাজ শেষ জীবন পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সমাজের যথেষ্ট সম্মান ও প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

গোবিন্দ কবিরাজের অন্তরঙ্গ ও অনুরক্ত ভক্তগণ—যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের সহিত গোবিন্দের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। সেই

কারণে গোবিন্দ মধ্যে মধ্যে যশোহর রাজসভায় যাইতেন।

এলার সিন্দুর নিবাসী বারেন্দ্রব্রাহ্মণ পরমবিদ্বান শ্রীরূপনারায়ণ গোস্বামী; গৌড়াধিরাজ-অমাত্য নরোত্তম ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতাত রাজা পুরুষোত্তম দত্ত ও তৎপুত্র সন্তোষ দত্ত ; রাজমহলের রাজা চাঁদরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্তোষরায় গোবিন্দের গুণমুগ্ধ অন্তরঙ্গ ছিলেন।

চৈতন্যভক্ত দাক্ষিণাত্য রঙ্গক্ষেত্রবাসী ভক্ত পদকর্ত্তা চম্পং রায় গোবিন্দের জনৈক অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

গোবিন্দ কবিরাজও খেতুরীর মহাসহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। "আগে যাইবেন গোবিন্দাদি কয়োজন। সেই সঙ্গে পদ কর্ত্তা করিবে গমন।" (নরোত্তম-বিলাস)। খেতুরীর মহোৎসব প্রাচীন বৈষ্ণব ইতিহাসের একটী স্মরণীয় দিন, এবং বহুসংখ্যক বৈষ্ণবকবি,পদকর্ত্তা প্রভৃতির সময় নিরূপণের প্রধান অবলম্বন।

গোবিন্দের কবিরাজ উপাধিলাভ :—১৫০৫ শকে, (১৫৮৩ খৃঃ অব্দে) নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবীদেবী ও তাঁহার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সহ গোবিন্দদাস, বৃন্দাবন ধাম গমন করেন। গোবিন্দের অসাধারণ কবিত্ব নৈপুণ্য ও মনোহর পদ রচনার জন্য বৃন্দারণ্যের গোস্বামীগণ গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। "গোবিন্দের বাক্যে শ্রীআচার্য্য হর্ষ হইলা। গোবিন্দে প্রশংসিত কবিরাজ খ্যাতি দিলা।"এই বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে আচার্য্যপ্রভুই গোবিন্দকে কবিরাজ খ্যাতি দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের শ্রীজীবগোস্বামী প্রমুখ ভগবভক্ত বৈষ্ণবগণ গোবিন্দের বিরচিত সুললিত পদসকল পরমেশ্বর দাস মুখে শ্রবণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হন, এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ রচিত পদসকল তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিতে আদেশ দেন। এই আদেশ গোবিন্দের পরম সৌভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

গোবিন্দের ব্রাহ্মণ শিষ্যঃ—তেলিয়ার ব্রাহ্মণ জমীদার শ্রীবল্লভ রামচন্দ্রের ও রাজীবলোচন বল্লভ গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হন। তাঁহারাই কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়কে বুধুরী হইতে তেলিয়া লইয়া যান, ও তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পরে পশ্চিম পাড়ার জমীদার রঞ্জিত রায় (রাজপুত) ও ধনঞ্জয় নন্দী (তিলি জাতীয়) তাঁহাদিগকে পশ্চিম পাড়ায় লইয়া যান ও তথায় বাস ভবনাদি প্রস্তুত করাইয়া দেন। এখনও বুধুরীর পশ্চিম পাড়ায় উক্ত কবিরাজ বংশের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

উভয় ভ্রাতার সাধন ভজনানুরাগাদি নিষ্ঠা ও বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা দেবী ও নিত্যানন্দ গৃহিণী জাহ্নবী দেবী, অনেক সময়

বুধুরীতে আসিয়া কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভবনে বাস করিতে ভাল বাসিতেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া গোবিন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তমাদি সাধুগণের নিকট সর্ব্বদাই বাস করিতেন। তৎকালেও গোবিন্দ কবিরাজ অনেক পদ রচনা করেন। তাঁহার রচিত সেই সকল পদাবলী, কাঞ্চন গড়িয়ার দ্বিজ হরিদাসের (চৈতন্য রায়ের) পুত্র গোকুলনাথ ও শ্রীদাম দাস প্রভৃতি সে কালের খ্যাতনামা কীর্ত্তনগায়কগণ কর্ত্তৃক গীত হইত। সেই সকল সংগীত শ্রবণ করিয়া জীবগোস্বামী এবং বীর চন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মা বৈষ্ণববৃন্দ পদকর্ত্তাকে প্রেমবিহ্বল চিত্তে সাদর আলিঙ্গন প্রদান করিতেন।

শেষজীবনে গোবিন্দ বুধুরী গ্রামে রহিয়া বহু পদরত্ন সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। "নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে।" (ভক্তিরত্নাকর ১৪ তরঙ্গ)

গোবিন্দের দেহরক্ষা :- (১৬১২ খৃঃ অব্দে) ১৫৩৪ শকে, আশ্বিনের কৃষ্ণা-প্রতিপদে ৭৩ বৎসর বয়সে গোবিন্দ কবিরাজ দেহরক্ষা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ এবং "শ্যামকুণ্ড" "রাধাকুণ্ড" নামক জলাশয়দ্বয় অদ্যাপি বুধুরীতে বিরাজিত রহিয়াছে।

গোবিন্দ কবিরাজ অষ্ট কবিরাজের অন্যতম এবং কৃষ্ণ-লীলার মহাভক্ত ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

গোবিন্দের পুত্র দিব্য সিংহ পিতার ন্যায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তৎপুত্র ঘনশ্যাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত ও সংস্কৃতে "কর্ণামৃত" কাব্য রচনা করেন।

সমালোচনা।

কিশোরে-যোগিনী।—(একাঙ্ক নাটিকা)শ্রীযুক্ত শ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। জুপিটার থিয়েটারে অভিনীত। শ্রীযুক্ত দেবীপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২২ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট ৺কালীঘাট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

পুরাণে বর্ণিত প্রসিদ্ধ সুকন্যা ও চ্যবন ঋষির উপাখ্যান অবলম্বনে এই

নাটকখানি বিরচিত হইয়াছে। সতীত্বের অপূর্ব্ব আদর্শ ও মহর্ষি চ্যবনের পবিত্র চরিত্রের মহিমা এই নাটিকায় গ্রন্থকার অতি দক্ষতার সহিত সুন্দর ভাবে সুচিত্রিত করিয়াছেন। নাটিকাখানিতে যে কয়টি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বস্তুতঃই মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার সঙ্গীত রচনায় কিরূপ কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নে কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।

(গাহিতে গাহিতে বনদেবীর প্রবেশ)

শিখবে যদি ভালবাসা যাওরে জগৎ ফুলের কাছে।
আপ্‌না ভুলে বাস্‌তে ভাল, ফুলের মতন্ কে আর আছে॥
অলির্ মুখে মুখ্‌টি রেখে, ঢালে মধু ফুল্—
অনিলে দেয় বাস বিলায়ে হেলে দুলে দুল্,
চোখে চোখে রূপ্ মাখায়ে করে প্রাণ আকুল্।
দিক্ সাগরে ছড়ায় শোভা, আপন পর সে নাহি বাছে॥

(প্রস্থান)

(নেপথ্যে গীত।)

কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে কুসুম কলিকা ফুটিছে যে।
ফুলবাস হরি, ধীরি ধীরি ধীরি মধুর মলয় বহিছে রে।

সনৎ।—রাজকন্যা বড়ই ভক্তিমতী। আজ তিন দিন মাত্র ঋষির আশ্রমে বাস ক'রে, ঋষির ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রেছে। রাজকন্যা ব'লে মনে কোন অহঙ্কার নাই, যেন কতই আনন্দময়ী।

(নেপথ্যে গীত)

আধ ঘুম ঘোরে, থাকিয়া থাকিয়া, পাপিয়া তান ধরিছে রে।
সোহাগে সুরাগে, প্রেম অনুরাগে, উষা সতী কিবা হাসিছে রে॥
এখনি ঘুচিবে, নিশার আঁধার, সুখ দিবাকর উদিবে রে॥
সরসী সলিলে; সুধার পিয়াসী কুমুদিনী ঐ মুদিবে রে॥

"কিশোরে যোগিনী" নাটকের সঙ্গীতগুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে বলিয়াই আমরা উক্ত নাটক হইতে গান কয়টি উদ্ধৃত করিয়া পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিলাম। আমাদের হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরে হিন্দু কুল-ললনাগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া পবিত্র সতী ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নারীজীবন ধন্য জ্ঞান করিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুশিক্ষিত ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়গণের মতে প্রস্তুত বিংশবর্ষকাল সুপ্রচলিত

প্রত্যেক মহৌষধাবলীর নাম ও ট্রেডমার্ক হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্নী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল, দ্বারা আইনানুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে—ক্রেতাগণ ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।

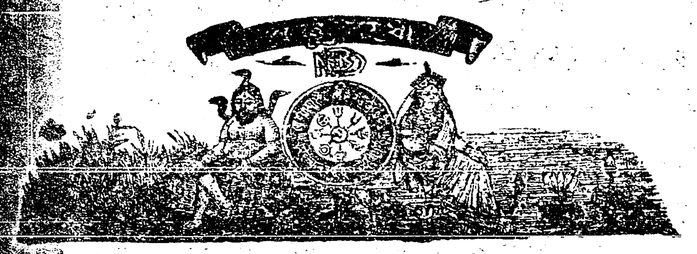

বর্ত্তমানকালে জ্বররোগে যত প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে ডাক্তারি মতের ঔষধই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আশু ফলদায়ক তাহা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার মহাশয়গণের দ্বারা এই **"শম্ভুসুধা"** মহৌষধটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শম্ভুসুধা সেবনে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর, নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ঘুসঘুসে পালাজ্বর, কম্পজ্বর, মেহ ও প্রমেহ ঘটিত জ্বর, কুইনাইনে আট্‌কান জ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, বাতজ্বর পিত্তজ্বর কফজ-জীর্ণ জটিল জ্বর, কালাজ্বর ও ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বরই **শম্ভুসুধা** সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়, এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। শম্ভুসুধা ২।৪ মাত্রা সেবনেই জ্বর বন্ধ হয়, কিছুদিন ব্যবহারে প্লীহা যকৃৎ কমিয়া যায় এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরভাব সর্দ্দি কাশী হইলে শম্ভুসুধা একমাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের জড়তা দূর হইবে। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে টনিকের কার্য্য করে; অতএব শম্ভুসুধা প্রত্যেক গৃহস্থের সর্ব্বদা গৃহে রাখা আবশ্যক, শরীর সামান্য একটু শ্লেষ্মা ভারাক্রান্ত বোধ হইলে একমাত্রা "শম্ভুসুধা" সেবন করিলে শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। মূল্য প্রতি ৮ আট আউন্স শিশি ৸০ আনা ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।



রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্নস্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে **"অমৃত সাল্‌সা সালসা"** সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের **অমৃত সালসা"** সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা। ৩ শিশি ৩।০ টাকা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র, এক ডজন লইলে ১০৲ টাকা।

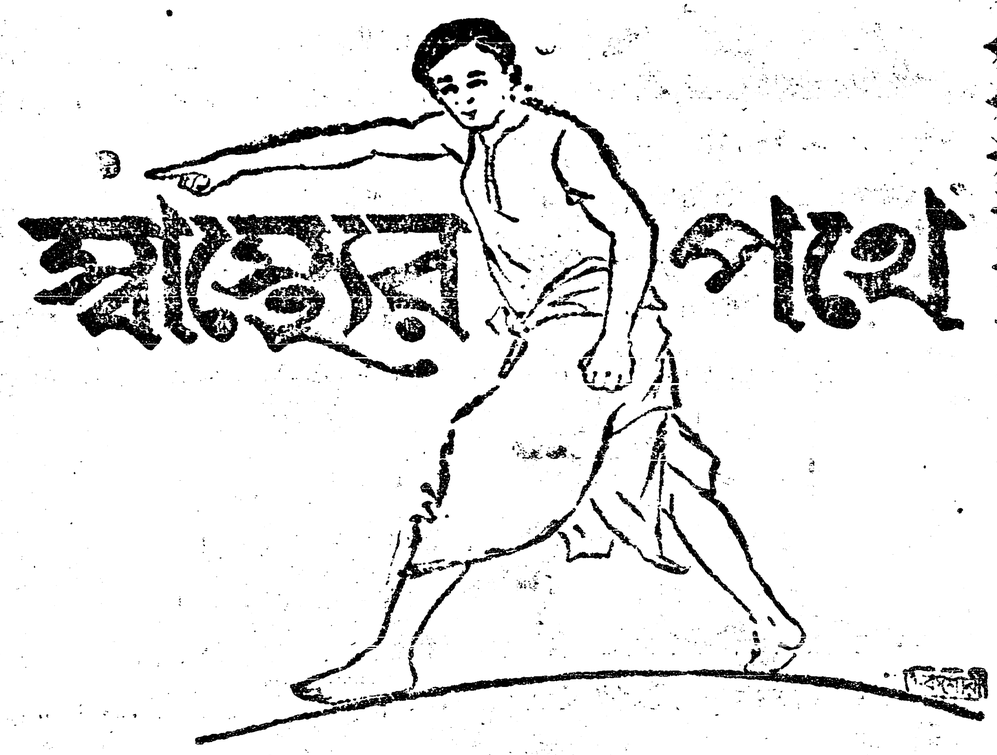

অমৃতময়ী কষায়

কি রোগী কি সুস্থ
সকলের পক্ষেই ইহা সমান উপকারী।

প্রস্তুতকারক
নরেন্দ্র নাথ সেন এণ্ড কোংলিঃ
১৮।১৯।১, লোয়ার চিৎপুর রোড্, কলিকাতা

PRINTED By N. DUTTA At The JANMABHUMI PRESS
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শবর্ষ] ১৩৩৮ কার্ত্তিক, [৭ম সংখ্যা]

১। শ্রীমদ্ বালানন্দ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৯৩
২। সন্ধানে—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ, ... ২০৯
৩। আচার ও যোগ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর ২১১
৪। গুরুভক্তির পরিণাম—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২১৩
৫। সংসারে ব্রহ্ম সাধন—শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস, সি, বি, এল, বিবৃত ২১৬
৬। বিনামূল্যে-দেশীয় ঔষধ—কবিরাজ-শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন ২২২

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়। ১-3-32
৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
নরেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

ভীমরুল জারমলীন ঘরে রাখিবে

এক দিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৸০, ডজন ৫৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৪২।B, মুক্তাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্থাপিত—১৮৩৩

চিরায়ুগতি

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারীং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি, সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিস্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২৷৷০ অড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৩৯ নং মাণিকতলার ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

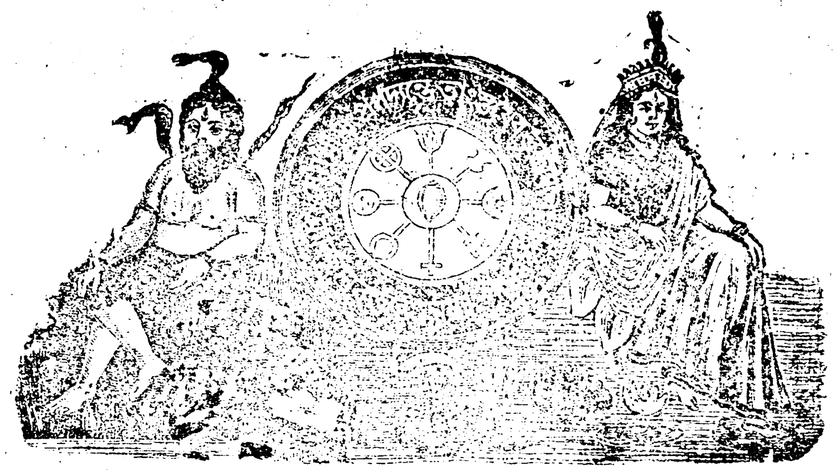

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ } ১৩৩৮ সাল, কার্ত্তিক { ৭ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কেরাণীবাদের আশ্রমের সূত্রপাত।

যখন জীবদেহ ধারণ হইয়াছে, তখন এ নশ্বর ভৌতিক দেহ একদিন ত্যাগ করিতেই হইবে। মহাত্মাগণ এ দেহ কিরূপ ভাবে ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা পরম গুরুদেবের জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছি। মানুষের যত কিছু সাধনা আছে তাহার পরীক্ষা এই শেষদিনে। শ্রীভগবান গীতায় শুনাইয়াছেন।—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

রামবাবু গুরুকৃপাবলে সাধন-মার্গে কিরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মহাপ্রয়াণের কাহিনী বলিয়া তাহা এক্ষণে সকলকে শুনাইব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শুনাইয়াছি যে তিনি শ্রীগুরুদেবকে তপোবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যখন এস্থান লইয়া নানা উপদ্রব ও মোকদ্দমা চলিতে থাকে সে সময়ে স্বর্গারোহণ করেন। ইহা হইতেছে ইংরাজী ১৯০১ সালের ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দ্দশীর দিনে। ৫৫ বৎসরে পেনসন লইবার পর, এ ঘটনা হয় তাঁহার ৬২ বৎসর বয়সে, সুতরাং সরকারী কার্য্য হইতে ও ঠাকুরবাড়ীর চাকরী হইতে অবসর লইবার পর প্রায় ৫ বৎসর কালই তিনি একান্তে দেওঘরে বাস করিয়াছিলেন।

তিনি গুরুদেবকে প্রায়ই শুনাইতেন যে, সাংসারিক জীবনে তাঁহার সকল আশাই পূর্ণ হইয়াছে। কেবলমাত্র এক বাসনা আছে যে, মহারাজের সম্মুখে হাসিতে হাসিতে যেন চলিয়া যাইতে পারেন। মহারাজও বলিতেন যে, তিনি যেরূপ বিশিষ্ট ভক্ত তাহাতে শ্রীভগবান ইহাও পূর্ণ করিবেন। রামবাবুর এই বাসনা পরিপূর্ণ করিবার জন্যই মহারাজ তপোবন ত্যাগ করেন নাই। গুরুদেব আমাদিগকে সর্ব্বদা শুনাইয়া থাকেন যে,—

"অনায়াসেন মৃত্যুং চ বিনা দৈন্যেন জীবনং।
তদ্দেহি কৃপায়াঃ সিন্ধু, ভক্তিরেব মে অচলা॥"

ইহা রামবাবুর জীবনে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিনি স্বরোদয় যোগে পূর্ণ অভ্যাসী হইয়াছিলেন। এজন্য এ বৎসরেই যে তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন ইহা বেশ বুঝিয়াছিলেন। এজন্য পূর্ব্ব হইতেই বৈষয়িক বন্দোবস্ত নির্ব্বাহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। গুরুশিষ্যের মধ্যে আভাস ইঙ্গিতে পরস্পরের মধ্যে ইহার কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল। রামবাবুর মধ্যে মধ্যে হাঁপের পীড়া দেখা দিত। এ বৎসরের ২০শে পৌষ বেড়াইতে যাইয়া হঠাৎ পড়িয়া যান ও বুকে বেদনা বোধ করেন। ডাক্তারেরা এ বেদনা ধরিতে পারে নাই। এজন্য সকলের ইচ্ছা হইয়াছিল যে, কলিকাতায় গিয়া ভালরূপ চিকিৎসা হয়। এরূপ কথা উঠিলেই তিনি বলিতেন যে, সময়মত যাওয়া যাইবে। এ সময়ে গুরুদেব প্রায়ই আসিতেন ও দুজনের বহুপ্রকারের আলাপ গোপনে হইত। সকলে ইহার কারণ বুঝিতে পারে নাই, তবে গুরুদেবকে একটু চিন্তাকুল সকলেই দেখিত। ১লা ফাল্গুন রামবাবুর বুকে হঠাৎ ব্যথা দেখা দিল। দেওঘরের ডাক্তার হরিচরণ বাবু ও নিজের সেজ জামাতা ডাক্তার কেদার বাবু ৪ঠা আসিয়া দেখিলেন ও কলিকাতায় যাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন। রামবাবু বলিলেন যে, শিবচতুর্দ্দশীর পর যাইলেই হইবে। শিবরাত্রির সংযমের দিন নেংটাবাবাকে নিমন্ত্রণ করিয়া

খাওয়ানহইল ও গুরুদেব ও উপস্থিত থাকিলেন ও পরে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ৪ঠা কোন পীড়ার চিহ্নও নাই। সমুদয় দিন নাতি নাতনী ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত বেশ রঙ্গরসে কাটাইলেন। এ দিন রাত্রি ১০টার সময় হঠাৎ জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল। ইহা দেখিয়াই বলিলেন যে, তাঁহার শ্বাস হইয়াছে, গুরুদেবকে আনাইতে হইবে। মহারাজ পরদিন প্রাতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পরমানন্দে পদধূলী লইয়া পদধৌত জল স্ত্রীর হাতে দান করিলেন। এ সময়ে গুরুদেবের চক্ষে জল দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হইল। গুরুদেব একটা ঔষধ দিলেন ইহাতে যন্ত্রণা কম হইল। তখন সকলে কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। মহারাজ বলিলেন এ সময়ে—

"ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং
বৈদ্যঃ নারায়ণ-হরিঃ।"

ইহার পর গুরুশিষ্যের মধ্যে নানা ভাবে আভাস ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। রামবাবু একবার প্রকাশ্যে বলিলেন যে, "বাবা! প্রাণত্যাগের সময় কষ্ট না হইয়া যায় না, ইহা বেশ বুঝিতেছি। জন্মান্তরে এরূপ কষ্ট বহু বার অনুভূত হইয়াছে। তাহাই স্মরণ করিয়াই সকলে মৃত্যু-ত্রাস বোধ করে ইহাই বোধ হইতেছে।" গুরুদেব বলিলেন যে, "এ মরণজনিত বিক্ষেপ অল্প বা অধিক সকলকেই সহ্য করিতে হয়। তবে সাধনবলে মনের বিজ্ঞান দ্বারা এ বিক্ষেপ কম করা যায় মাত্র। তোমার তত কষ্ট হইবে না।" কিঞ্চিৎ পরে রামবাবু বলিলেন যে, "এ বিক্ষেপ ত আর সহ্য করা চলে না।" গুরুদেব বলিলেন, "আর রাখিবার প্রয়োজন নাই, ছাড়িয়া দাও।"

এ সময় পুনরায় কেহ কেহ কলিকাতা হইতে ডাক্তার আনাইবার প্রস্তাব উঠাইলেন। ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, রাত্রি ১০টার পর ব্যবস্থা করিবে। এই ভাবে বেলা ৫টা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। মহারাজের নিজ মুখের মহিম স্তোত্র পাঠ শুনিতে শুনিতে দুই এক চরণ তাঁহার সহিত নিজে নিজে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তবে এ সময়ে বেশীক্ষণই জপে নিবিষ্ট রহিলেন। এক বার জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন যে, চতুর্দ্দশী রাত্রে ১০টার লাগিবে বাস্তবিক যেমন রাত্রি ১০টা বাজিয়া ৫ মিনিট হইল ও বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রথম প্রহরের পূজার বাদ্যধ্বনি বাজিয়া উঠিল, অমনি এ মহাত্মা হাসি হাসি মুখে শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে নশ্বর দেহ রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। মহারাজ কপালে বিভূতি মাখাইয়া গলায় রুদ্রাক্ষ মালা পরাইয়া দিলেন। গুরু-

দেব সৎকারের আয়োজন পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজে সঙ্গে যাইয়া তাঁহার চিতার উপর ধুনা ও চন্দন কাষ্ঠ নিক্ষেপ পূর্ব্বক একনিষ্ঠ সেবকের পারলৌকিক কার্য্য যথাবিধি নিষ্পন্ন করাইলেন।

রামবাবুর দেহত্যাগের পর মহারাজ পূর্ণানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া উত্তরখণ্ডে ভ্রমণে বাহির হন। এ সময়ে কেরাণীবাদে একটীও বাড়ী ছিল না। ইহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সন্ধ্যাকালে এদিকে আসিতে লোকে ভয় পাইত। বর্ত্তমানে যেখানে আশ্রম হইয়াছে সেখানে একখণ্ড জঙ্গলপূর্ণ খালি জমি পড়িয়াছিল। ইহা রোহিণী ঘাটোয়ালষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তপোবন লইয়া যখন বিবাদ চলিয়াছিল, তখন রামবাবু ইহার বন্দোবস্ত লইয়া রাখিয়াছিলেন, তপোবনের মামলায় যদি শেষ পর্য্যন্ত কিছু ফল না হয়, তবে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এ জমিতে একখানি ক্ষুদ্র বাড়ী তৈয়ার করাইয়া গুরুদেবকে অবস্থান করাইবেন। তাঁহার এ সংকল্প কেবল তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। রামবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার সহধর্ম্মিণীর এ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা হইল। গুরুদেব এ সব সংকল্পের বিন্দুবিসর্গও বিদিত ছিলেন না।

গুরুদেব শুনাইয়াছেন যে, হরিদ্বারে অবস্থান কালে তিনি যখন নিজাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানস্থ, তখন কেরাণীবাদের এক চিত্রপট সহসা তাঁহার মানস পটে উদিত হইল। তিনি স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন যে এ স্থানের বনজঙ্গল দূরীভূত হইয়াছে ও এ স্থান একটী সহর রূপে পরিণত হইয়া নানাপ্রকার অট্টালিকা দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে। এখানে বহুতর দেব মন্দির ও পুষ্করিণী হইয়াছে। এরূপ দেখিবার পর আসন হইতে উঠিয়া পূর্ণানন্দজীকে ইহার বিষয় বর্ণনা করিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন, যে, মহারাজের শুদ্ধ চিত্তপটে যখন এ সব দেখা গিয়াছে তখন কেরাণীবাদ হয়ত ঐ রূপই হইবে।

এ ঘটনার ৭।৮ দিন পরেই দেওঘর হইতে রামচরণ বাবুর স্ত্রী এক খান পত্র মহারাজের নিকট পাঠাইলেন ও ইহাতে জানাইলেন যে, কেরাণীবাদের সেই পরিত্যক্ত জমিতে তিনি মহারাজের অবস্থানের জন্য একটী ছোট বাড়ী প্রস্তুত করাইবেন সংকল্প করিয়াছেন। এ বাড়ী কিরূপ হইলে মহারাজের বাসের অনুকুল হইবে, ইহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে ও এজন্য মহারাজ যদি একটী খসড়া নকসা পাঠাইয়া দেন, তবে তিনি কৃতার্থ হইবেন। উপরোক্ত দৃশ্য দেখিবার কয়েকদিন পরে এই পত্র পাইয়াই মহারাজ হাসিয়া উঠিলেন

এবং পূর্ণানন্দজীকে বলিলেন যে, "দেখ, পূর্ণানন্দ, উস্‌দিনমে কেরাণীবাদকা যো চিত্রপট ধ্যান মে দেখা হ্যায় উস্‌কা সাৎ ইস্‌কা সংযোগ মালুম হোতা হায়।" পূর্ণানন্দ বলিলেন, ইহা হইতে পারে। যাহা হউক রামবাবুর স্ত্রীর পত্রের উত্তরে জানাইলেন যে, তাঁহার কোনরূপ নক্সা দিবার ইচ্ছা নাই। মায়ীর যাহা ইচ্ছা সেই মতই তিনি করিতে পারেন।

ইহার পর মহারাজ পঞ্জাবের দিকে চলিয়া যান। হিমালয় প্রদেশ হইতে তাঁহার নিম্নপ্রদেশে আসিবার আর ইচ্ছা ছিল না। পূর্ণানন্দ প্রয়াগে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অগত্যা মহারাজ প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইতে স্বীকৃত হইলেন। পূর্ণানন্দ টিকিট কিনিতে যাইয়া টিকিট খরিদ করিলেন কাশী পর্য্যন্ত। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি নিজের অজ্ঞতা ও ভ্রম জানাইলেন। এজন্য মহারাজ বিরক্ত হইয়া অগত্যাই কাশী আসিলেন। এখন হইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বাহির হইবেন। এ সময়ে পূর্ণানন্দজী প্রস্তাব করিলেন যে, বৈদ্যনাথে একবার রামচরণ বাবুর স্ত্রীকে দর্শন দিয়া যাইলেই ভাল হয়। তিনি দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলা হইয়াছেন।

এতক্ষণে মহারাজ বুঝিলেন যে, পূর্ণানন্দের ইহাই একান্ত ইচ্ছা ও ইহার ভিতরে একটা মতলব আছে। মহারাজ বিরক্তির সহিত সম্মত হইলেন ও বলিলেন যে, বৈদ্যনাথে তিনি কয়েকদিন মাত্র থাকিবেন। অগত্যা কাশী হইতে বৈদ্যনাথ আসিলেন বা চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে আনা হইল। এখানে আসিতেই রামবাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য সকলে জিদ ধরিলেন যে, কেরাণীবাদে বাড়ী হইয়াছে। ইহা মহারাজের অবস্থানের সংকল্প লইয়াই হইয়াছে। এজন্য এই নূতন বাড়ীতে ২।৪ দিন বাস করিতেই হইবে ও এ নূতন বাড়ীতে আর কি কি অভাব আছে জানাইলে সেই মত সমুদয় নির্ম্মিত হইবে। মহারাজ ২।৪ দিন মাত্র থাকিবেন জানাইয়া সে নূতন বাড়ীতে আসিলেন। এখানে থাকিবার জন্য তখনই নূতন তৈজসপাত্র কেনা হইল। তখন এস্থানে ইঁদারা, বারাণ্ডা সংযুক্ত চৌঘরা, ও পাকের নিমিত্ত একটী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা কার্য্য বাকী ছিল তাহা মহারাজ বলিয়া দিলে, সেই মত আরও হইতে লাগিল। এ রূপে এ নূতন বাটীতে আসিয়া মহারাজ কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। এই হইল মহারাজের নূতন বন্ধনের সূত্রপাত। এ বাড়ী প্রস্তুত হইবামাত্রই রামবাবুর স্ত্রী উক্ত কেরাণীবাদের জমি ও বাড়ী প্রভৃতির এক পাটা প্রস্তুত ও রেজেষ্টারী করাইয়া উহাদের এক অর্পণনামা পত্র হস্তান্তরিত পূর্ব্বক লইয়া

আসিয়া মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অর্পন করিলেন। এতক্ষণে মহারাজ হরিদ্বার হইতে যে জন্য চক্রান্ত করিয়া এখানে তাঁহাকে আনা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিলেন। মহারাজ জীবনে এ পর্য্যন্ত কখনও বিষয় সংস্রবে আগমন করেন নাই। সুতরাং বিষয়ের এই অর্পণনামা গ্রহণ করিতে বার বার অস্বীকার করিলেন। কিন্তু মায়ীর ক্রন্দনে ও কাতরতায় ও অন্যান্য সকলের প্রার্থনায় ইহা লইতে হইল। তপোবনে তাঁহার মাতৃদেবী আসিয়া সমাধি লইবার পর উহার প্রতি যে একটা মাতৃবন্ধন আসিয়াছিল তাহা যদিচ উড়াইয়া দিয়া বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই ভক্তি রূপিণী মাতৃদেবীর নিকট ভাল রূপে বন্ধনে পড়িলেন। নবম বৎসরে যে মাতৃশক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, আজি সে শক্তির নিকটে তিনি পরাস্ত হইলেন। এ শক্তি হইতেছে—"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ। মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ।" "সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে। সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। চণ্ডী। ত্রিযুগী নারায়ণে মনসাগিরির নিকট যাহা জানিয়াছিলেন অর্থাৎ "নিম্নে এখনও কর্ত্তব্য বাকী আছে"—তাহার সূত্রপাত হইল। এ অঙ্কুর হইতে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া যখন বিষয়-রূপ ফল তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়াছিল তখন প্রায়ই বলিতেন,"বিষয় বিষ হ্যায়" ও যখন ভরতমুনির মৃগশাবকের সংস্রব পাঠ শুনিতেন তখন চক্ষে জল আগমন করিয়াছে ইহাও দেখা গিয়াছে। সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, "প্রারব্ধই বলবান্॥"

এই অর্পণনামাগ্রহণ হইবার পরই মায়ী (রামবাবুর-স্ত্রী) জানাইলেন যে, সে স্থানে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর স্মরণার্থ তিনি এক মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। এজন্য যত ব্যয় হইবে তাহা তিনি বহন করিবেন। তবে এ মন্দির নির্ম্মাণ ও শিবপ্রতিষ্ঠার ভার তাঁহাকে লইতে হইবে। রামবাবু তাঁহার পরমভক্ত, মায়ী তাঁহার পরমা স্বামী-স্ত্রী ও এ সমুদয় সংকল্প শুভ ইহা চিন্তা করিয়া গুরুদেব ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। বন্ধনের উপর বন্ধন আসিতে লাগিল।

এই ভার লইবার পর গুরুদেবের অন্যত্র যাওয়া স্থগিত হইল। মউজগিরি এতদিন তপোবনে বাস করিতেছিলেন ও তপোবন সম্বন্ধে মোকদ্দমার তদ্বিরে ছিলেন। তিনিও সেখান হইতে কেরাণীবাদে আসিলেন। মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। এ মন্দিরের সমুদয় স্থপতি কার্য্যের বিশিষ্টতা মহারাজের নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত।।

ইহার নিম্নে গুহা ও রোয়াকের চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক গুহা আছে। মন্দির নির্ম্মিত হইলেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইল। পূর্ণানন্দজী জয়পুরে যাইয়া মূর্ত্তিগুলি খরিদ করিয়া প্রেরণ করিলেন ও পরে গঙ্গোনাথ যাইয়া পরম গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। ইহার বর্ণনা পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯৬২ সংবতের (খৃঃ অঃ ১৯০৪) সৌর চৈত্রমাসের সপ্তমী তিথিতে পরমগুরুদেব নিজ হস্তে এই নর্ম্মদেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা রাম বাবুর স্বর্গারোহণের ৩ বৎসর পরে হইয়াছিল। এই মন্দিরের প্রস্তর ফলকে এইরূপ লেখা আছে :—

"যোগানন্দ-সুধাপান-প্রহৃষ্টমুখমণ্ডলঃ।
সকল সংশয়চ্ছেত্তা যোগমার্গপ্রদর্শকঃ॥
বালানন্দ-পদাম্বুজভৃঙ্গো যো বসুবংশজঃ।
রামচরণ ইত্যাখ্য আসীন্মো জীবিতেশ্বরঃ॥
তন্মোক্ষপ্রাপ্তিকামাহং কাত্যায়নীতিবিশ্রুতা।
উৎসৃজাম্যাতিযত্নেন তদিষ্টদেবমন্দিরং॥"

এ ঘটনার পর মহারাজ গঙ্গোনাথে যাইয়া কিরূপে পরমগুরুদেবের সমাধি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর কেরাণীবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইহার পর হইতেই এ আশ্রমের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। উক্ত শিবপ্রতিষ্ঠার দশ বৎসর পরে এখানে "বালেশ্বরী" নামে এক ত্রিপুরসুন্দরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ণানন্দজী নেপালে যাইয়া এ মূর্ত্তি আনয়ন করেন ও এ দেবীর নামানুসারেই ইহা "রামনিবাস বালেশ্বরী আশ্রম" নামে পরিচিত হইয়াছে। এ প্রতিষ্ঠার ব্যয় মহারাজ নিজেই বহন করেন। মউজগিরি স্বামী দেহরক্ষা করিলে তাঁহার স্মরণার্থ ১২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এখানে মহারাজ মহারুদ্রযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন ও উক্ত স্বামীর সমাধিস্থানের উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। একটী নূতন পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বহু টাকা ব্যয় করিয়া এক বরুণযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। পরে এখানে এক বৃহৎ গোশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাচীন টোল প্রথানুরূপ অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যাদান জন্য পৃথক্ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে। ভক্ত ও শিষ্যগণও এ আশ্রমের নানারূপে আয় ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য বাড়ী, জমি ও অন্যান্য প্রকার দান দ্বারা ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন॥ বহু পূর্ব্বে হরিদ্বারে

বসিয়া মানসপটে মহারাজ কেরাণীবাদের যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন এখন তাহা ফলীভূত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্য লোকেরও বহু সৌধ, মন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ইহা এক্ষণে সহরের মত হইয়াছে। এখনও আর কত হইবে কে বলিতে পারে? তপোবন পূর্ণ অধিকারে আসিয়া এক্ষণে ইহাও কেরাণীবাদের আশ্রমের অন্তর্ভূত হইয়াছে। এ আশ্রমে দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পূজা বৎসরের মধ্যে দুই এক যজ্ঞ, অতিথি সেবা, সদাব্রত, ধর্ম্মসম্বন্ধে পাঠ, কীর্ত্তন বক্তৃতা, কথকতা, অন্ন-বস্ত্রাদিদান ও উপদেশ প্রদান প্রভৃতি নিয়মিত ভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালের এই অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে এজন্য মহারাজ "বালানন্দ-ট্রষ্ট ফণ্ড" (Balananda Trust Fund) বলিয়া একটী কায়েমী সেটেলমেণ্ট পত্র রেজেষ্টারী করিয়া ৫ জন ট্রষ্টীর উপর পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন। এ আশ্রমের যিনি সেবায়ত হইবেন তাঁহার কার্য্যাবলিও "সেবায়ত" পত্রিকায় নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এ সেবায়তও উক্ত ট্রষ্টীগণের মধ্যে একজন বরাবর নির্দ্দিষ্ট থাকিবেন।

(১) প্রথম Trust Deed এ একলক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সমুদয় আয় হইতে উপরোক্ত খরচ নির্ব্বাহ হইবে। ইহা ১৯২৩ সালের ২৯শে জানুয়ারীতে দেওঘরে রেজেষ্টারী হইয়াছে। এসময়ে Sebait Deed ও পুনরায় সংশোধিত হইয়া রেজেষ্টারী হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয়বার উপরোক্ত ফণ্ডে ৫৫ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মূল্যের কোম্পানীর কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সুদের আয়ও উক্ত ফণ্ডের ট্রষ্টি-গণের পরিচালনায় সেবায়ত কর্ত্তৃক ব্যয় হইবে। ১৯২৫ সালের ১৭ই নবেম্বর দেওঘরে রেজেষ্টরী হইয়াছে।

(৩) তৃতীয়বার ৫৬ হাজার টাকা মূল্যের কাগজ প্রদত্ত হইবে বলিয়া মুসুবিদা হইয়া ষ্টাম্প কাগজে দস্তখত হইয়াছে।

পাঠকগণ একবার চিন্তা করুন যে যিনি এক সময় মুষ্ট্যান্ন পাইবার জন্য অন্যের নিকট ভিক্ষার্থী ছিলেন, আজ তিনি পরার্থে কতটাকা কিরূপ দান করিয়াছেন!

মহারাজ আমাদিগকে প্রায়ই শুনাইয়া থাকেন—

"জিস্‌কা দান উস্‌কা পুণ
যোগী অবধুতকা পাপনাশন"

অর্থাৎ যে দান করে তাহারই পুণ্য হয়। যোগী বা অবধূতের পাপও নাই, পুণ্যও নাই। তিনি নিজে টাকা রোজগারও করেন নাই, কাহারও নিকট প্রার্থনাও করেন নাই। গৃহস্থলোকের অর্থ অতিপ্রিয়। এরূপ প্রিয়বস্তুকে তাহারা তাঁহার হস্তে ত্যাগ করিয়াছে। তাহাদেরই পুণ্যফল-প্রাপ্তির জন্য উর্ব্বরাক্ষেত্রে ইহা বীজ স্বরূপ ফেলিয়া যাইতেছেন। বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে যদি সুরক্ষিত হয়, ইহার ফল বহুব্যক্তি ভোগ করিবে।

এক্ষণে আমার প্রিয় গুরুভাই ও ভগিনীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, একবার শ্রীগুরুদেবের মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখুন ও হৃদয়াসনে এ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করুন। আমি দেখিব কি ভাই, দেখিলেই যেন আত্মহারা হইয়া যাই। আমি দেখি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হরের মূর্ত্তি যেন একাধারে বিরাজিত।

পাঠকগণকে কহিতেছি যে, ভাই সব! আপনারা অনেকেই হয়ত শ্রীমদ্ভাগবতে পড়িয়াছেন যে, :—

"ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণঃ উত্তমঃ।"

বা—তৃ-২৯-৩১

এক্ষণে আপনারা সম্মুখে সেই বর্ণাশ্রমের শীর্ষ-চূড়ামণি ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি দর্শন করুন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচর্য্যের কার্য্যাবলি হয়ত শাস্ত্রে মাত্র পাঠ করিয়াছেন। আজ সম্মুখে সেই নয়-বৎসর বয়স হইতে উক্ত ব্রতাচরণকারী, এ ভারতের এক প্রাচীন নিদর্শন সম্মুখে দেখিয়া লউন। ৯ বৎসরে গৃহত্যাগী পাদচারী হইয়া ভারতের বহুতীর্থ পর্য্যটনকারী, হঠযোগ ও রাজযোগ সাধনায় সিদ্ধ ভারতের এক কমনীয় যোগী মূর্ত্তি দেখিয়া লউন। দেখুন একাধারে হরিহররূপী গৈরিক-বসন-পরিধান-কারী, দীর্ঘজটা-বিমণ্ডিত, ত্রিপুণ্ড্র-শোভিত তপস্যা-নিরত, যোগশান্তি-প্রস্ফুরিত সদানন্দে বিভূষিত পরমশিবদ একমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি দেখিয়া ইহাকে ব্রহ্মা কহিবেন, কি বিষ্ণু কহিবেন, কি মহাদেব কহিবেন, বলুন দেখি। দেখিয়া যাউন সৃজনকারী ব্রহ্মার মূর্ত্তি, যিনি ভিক্ষাচারী হইয়া বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন। এক সময়ে যাঁহার বাস ছিল বৃক্ষমূলে বা দেবমন্দিরে, যিনি নিজ হস্তে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ভিক্ষান্ন পাক করিয়াছিলেন, তিনি আজ কিরূপ সুন্দর আশ্রম, দেবমন্দির, গোশালা, অতিথিশালা, তপোবনের গৃহ ও গহ্বরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কেরাণীবাদে যেখানে আশ্রম হইয়াছে, তাহা একসময়ে জঙ্গলে পরিপূর্ণ পরিত্যক্ত একখণ্ড জমিমাত্র ছিল। সে স্থান আজ সাধুর মঠে পরিশোভিত হইয়াছে। সেখানে আজ নিত্য বেদপাঠ, শাস্ত্রীর

ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান, দেবসেবা, গো-সেবা, সদাব্রত, সাধু সেবা, আতুর-গণকে বিনামূল্যে ঔষধ দান, মধ্যে মধ্যে নানাবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা সদাই মুখরিত হইতেছে। তপোবনের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত ও যোগীগণের সেব্য যে গুহা ও আবাস তাহা এই কৌপীনধারী ভিক্ষুক ব্রহ্মচারীর মস্তিষ্কপ্রসূত ও নিগ্র-কায়িক পরিশ্রমলব্ধ বস্তু। কেরাণীবাদে তিনি যজ্ঞেশ্বর রূপে শিবলিঙ্গ ও মন্দির, দেবীমূর্ত্তি ও মন্দির, মহারুদ্রযজ্ঞ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, গ্রহণকালীন নানারূপ অনুষ্ঠান ও যজমানগণকে ভুরি দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন। ইহা উপরোক্ত ঐ নেংটা ফকির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একদিকে ব্রহ্মারূপে এ সব সৃজন করিয়া, বিষ্ণু-রূপে এ সকলের রক্ষারও স্থায়ী সুব্যবস্থা হইয়াছে। বেতনভোগী অধ্যাপকগণ বহু বিদ্যার্থীকে সর্ব্বখরচবর্জ্জিত বিনামূল্যে সংস্কৃত বিদ্যাদান করিতেছেন। বেতন ভোগী ডাক্তার আতুরগণকে অবৈতনিক ঔষধ দান দ্বারা চিকিৎসা করিতেছেন। নিঃস্ব ব্যক্তির কেহ কেহ পিতৃমাতৃদায়, কেহ বা দারপরিগ্রহ, কেহ বা গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতিতে নানারূপ অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। সাধুগণের পর্য্যটনের সাহায্য ও সমাদর, অতিথির সেবা, বিচরণশীল ব্যক্তিকে অন্ন-বস্ত্র-কম্বল ও পাথেয় প্রদান প্রায় সর্ব্ব সময়েই চলিতেছে। কৃতবিদ্য কথক, গায়ক, বক্তা, শাস্ত্রব্যা খ্যাতা ও কীর্ত্তনকারীগণ প্রায় সর্ব্বসময়েই সমাদরে আহূত হইয়া যথাবিধি মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেছে। সহরবাসীরা পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, জলাশয়, দুর্গামন্দির, হিন্দুবোধিনী সভা হরিসভা প্রভৃতির জন্য অভাবজ্ঞাপন করিলেই যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন। যিনি এরূপ ভাবে এতাধিক মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহার নিজ খরচ একছটাক চাউলের অন্ন বা এক ছটাক আটার প্রস্তুত ক্ষুদ্র ৪।৫ খানি রুটী মাত্র ভক্ষণই স্থির আছে। ইহাকে দুগ্ধ দধি লবণ মসলাযুক্ত ভোজন করিতে দেখিতে পাইবে না। ইহাকে সামান্য কয়েকঘণ্টা তন্দ্রাযুক্ত বিশ্রামভিন্ন কখনই গভীর-নিদ্রাযুক্ত দেখিতে পাইবেন না, পরিশ্রমে কাতরতাদেখিতে পাইবেন না, উদ্যমে অবসন্নতা দেখিবেন না এবং ক্ষুদ্র কুকুরটী হইতে মহাত্মাগণের প্রতি সর্ব্বদাই চক্ষু যেন ব্যস্ত আছে দেখিতে পাইবেন। তাঁহার মধুর উপদেশ ও সিদ্ধান্তবাক্যও ক্রমে শুনাইব।

মউজগিরি স্বামী।

পাঠকগণকে একবার নিবেদন করিয়াছি যে, যখন সাধু-জীবনী লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি তখন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সাধুচরিতের আলোচনা করিতে দেখিলে বিরক্ত হইবেন না।

মহারাজের জীবনীতে শুনাইয়াছি যে, তিনি যখন তৃতীয়বার বৈদ্যনাথে আগমন করেন তখন তাঁহার সহিত মউজগিরি স্বামী কাশা হইতে আগমন করেন। এ সময়ে ইনি ছিলেন ব্রহ্মচারী ও ইহাঁর নাম ছিল ধীরানন্দ। কাশীতেই ইহার সহিত মহারাজের পরিচয় হয়। বৈদ্যনাথ হইতে যখন মহারাজ কলিকাতায় যাইয়া ভূতের বাড়ীতে অবস্থান করেন তখনও ইনি মহারাজের সঙ্গে ছিলেন, পরে কলিকাতা হইতে পুনরায় বৈদ্যনাথে আসিয়া মহারাজ যখন দয়ামণের আশ্রমে তপোবনে অবস্থান করেন ও যে সময়ে মহারাজের মাতৃদেবী আগমন করেন তখনও এই স্বামী সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে মহারাজ দুর্গাগিরির নিকট হইতে তপোবনের ধুনীর আসন পাইবার পর যখন সেখানে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন তখন কিছুদিন তাঁহার সহিত বাস করিয়া মাত্র ২।৩ বৎসর তিনি অন্যত্র ছিলেন। এ তিন বৎসর বাদে তিনি মহারাজের সহিত পুনরায় মিলিত হন ও ইহার পর হইতে তাঁহার দেহ-ত্যাগ পর্য্যন্ত ৩৩ বৎসর কাল তিনি গুরুদেবের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া কালাতি-পাত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ২।৩ বৎসর কাল তিনি মানভূম পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে এখানকার রাজা ছিলেন নিলমণি সিং। ইনি এ ব্রহ্মচারী ধীরানন্দকে বড়ই মান্য করিতেন। রাজকুমার গৌরীকুমার ইহাঁর পরম ভক্ত ছিলেন ও ইহার নিকট কিছু কিছু যোগক্রিয়ার উপদেশ লইয়াছিলেন। গৌরীকুমারের মৃত্যুর পর ইনি কাশীপুর ত্যাগ করিয়া কাশী ভ্রমণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পূর্ব্বে তিনি যোগ ক্রিয়ার উপদেশ লইয়াছিলেন ও সে সময়েই তিনি মহারাজের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মচারী রূপে নৈষ্ঠিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ দ্বিতীয়বার কাশী গমন করিয়া তিনি রাণীক্ষেতে ৺শ্যামা-চরণ লহিড়ী মহাশয়ের গুরুদেবের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে পুনরায় আসিয়া তপোবনে মহারাজের সহিত মিলিত হন। এ সময় হইতে মিলিত হইয়া তিনি বরাবর তপোবন ও কেরাণীবাদের আশ্রম ত্যাগ করেন নাই।

তিনি পূর্ণ যোগাভ্যাসী ছিলেন ও এই সুদীর্ঘ কাল আশ্রমের যাবতীয় ব্যবহার কর্ম্ম একনিষ্ঠ সেবকরূপে ও নিষ্কামকর্ম্মীরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট সেবকের সম্বন্ধে কিছু না জানাইলে প্রত্যবায় হইবে বলিয়া এ প্রবন্ধ আরম্ভ করিলাম।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী ষ্টেশনের সন্নিকট মানকর বলিয়া একটী গ্রাম আছে। এ খানে বর্দ্ধমান রাজবংশের গুরুবংশ, যাঁহারা সদরাচর গোস্বামী বলিয়া খ্যাত, বাস করেন। এ স্বামীজী এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা-দিগের জমিদারীর আয়ও যথেষ্ট ছিল। ইহার বাৎসরিক আয় ২৫।৩০ হাজার টাকা হইবে। স্বামীজী যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন ইহার পিতার পরলোক হয়। এ গর্ভে পুত্র সন্তান হইলে ইনি সম্পত্তির একাংশের মালিক হইবেন বুঝিয়া পুত্র হইলে যাহাতে শিশুকালে তাহার বিনাশ সাধন হয় এরূপ একটা চক্রান্ত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার মাতা ও বর্ত্তমানের বৃদ্ধারাণী বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তাঁহার মাতা কলেবর পরিত্যাগ করেন। এ সময় এ শিশু পুত্রটীও মারা পড়িয়াছে ইহা প্রচার করিয়া স্বামীজীকে স্থানান্তর করা হয় ও একটী কায়স্থ স্ত্রীলোক ইহাকে প্রতিপালন করিতে থাকে। ইহা বৃদ্ধরাণী ও কতিপয় বিশ্বস্ত লোকই বিদিত ছিলেন। যখন বৃদ্ধারাণী উদ্যোগী হইয়া যজ্ঞোপবীতের ব্যবস্থা করিলেন তখনই সমুদয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহার পর ইহার রীতিমতভাবে বিদ্যাভ্যাসের বন্দোবস্ত করা হয়। ইনি বিশ্ববিদ্যা-লয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে ইনি বিশেষ ব্যুৎপেন্ন ছিলেন। তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সেও রীতিমত সাধন ভজন ও আশ্রমের নানারূপ ব্যবহারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিবার কালেও অবসর মত অতি-উচ্চ অঙ্গের অঙ্কশাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। সময়ে সময়ে অতিদুরূহ অঙ্ক তিনি এত সুগমে কসিতেন যে অঙ্কশাস্ত্রের গ্রাজুয়েটগণ অবাক হইয়া যাইতেন। তিনি আমাদিগকে বলিতেন যে, মনকে একতানবৃত্তিতে লইয়া আসিতে হইলে এই অঙ্কবিদ্যা এক সুগমপন্থা। বিদ্যালাভের পর তিনি জমিদারীর এক অংশের মালিক হইয়াছিলেন ও "ছোটবাবু" বলিয়া পরিচিত হইয়া কিছুদিন নিজহস্তে জমিদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও করিয়াছিলেন।

এই সময়ে পুনরায় তাঁহার প্রাণনাশের আয়োজন হইয়াছিল। তিনি প্রতিদিন ঠাকুরের প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। একদিন এই প্রসাদের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দেওয়া হয়। এই অন্নের সহিত

বিষভক্ষণে তাঁহার প্রাণনাশ হয় নাই, কিন্তু ৩ দিন পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞানা-বস্থায় থাকেন। পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ হইলেও তাঁহার মস্তিষ্কের এক বিকৃতি হইয়া যায়। যদিচ এ বিকৃতি পরে বহুল পরিমাণে আরোগ্য লাভ করে তথাপি ইহার চিহ্ন কিছু কিছু শেষ পর্য্যন্ত ছিল। প্রথমাবস্থায় অনেকে তাঁহাকে পাগলই মনে করিত। তাঁহার এই মস্তিষ্ক বিকৃতি কিরূপে দূরীভূত হইবে ইহা জানিবার জন্য তিনি বৈদ্যনাথে "ধরণা" দিয়াছিলেন। এখানে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সাধু হইবার জন্য আদেশ হয়। এই আদেশ পাইয়া সমুদয় সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিয়া তিনি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক ধীরানন্দ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হন। এ সময়ে নানা ছাত্রকে অঙ্কবিদ্যা-শিক্ষা দিয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই নিজের খরচ নির্ব্বাহ করিতেন। মাণ্ডালপুরের জমিদার পুত্রগণকেও এক সময়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরে কাশীতে যাইয়াও এরূপ করিতেন। এখানে প্রসিদ্ধ ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যোগশিক্ষা করেন ও পরে মহারাজের নিকট নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা-গ্রহণ পূর্ব্বক যখন মহারাজ তৃতীয়বার বৈদ্য-নাথে আগমন করেন তখন তাঁহার সঙ্গী হন। ইহার পর যাহা কয়েন তাহা পূর্ব্বে জানান হইয়াছে। ইনি এক জন সরল প্রাণের সাধুছিলেন। আমরা ইহাঁকে কেরাণীবাদে দেখিয়াছি। যে কেহ একবার ইহার সংস্রবে আসিয়াছে সেই তাঁহার বালকোচিত সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার নিয়মিতভাবে যোগানুষ্ঠান ক্রিয়া ও অপরদিকে তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সরল মীমাংসা, উচ্চনীচ ধনীনির্ধন সকলের প্রতি সমভাব, নিজহস্তে তামাক সাজিয়া সকলকে খাওয়ান ও রহস্যপূর্ণ বার্ত্তালাপ যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই ভক্তিশ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইয়াছে। এদিকে আশ্রমের সমুদয় ব্যবহারকার্য্য তিনি সানন্দ চিত্তে বরাবর বহন করিয়াছেন। ইতর ভদ্র কেহ কোন বিষয়ে তাঁহার সাহায্য লইতে আসিলে তিনি নানাকার্য্যের মধ্যেও তাহা করিতেন। গরীব লোকদিগকে ঔষধ দিবার জন্য হোমিওপ্যাথিক পুস্তকাদি সর্ব্বদাই পড়িতেন ও কাহারও ব্যাধি দেখিলে তখনই ঔষধ প্রদান করিতেন। এদিকে গুরুদেবের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়া অমরা অবাক্ হইতাম। মহারাজের সামান্য মাত্র অসুখ শুনিলেই তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। তাঁহার প্রাণায়াম অতি মনোরম ছিল। এ সময়ে বংশীর ধ্বনির মত এক সুমধুর শব্দ শ্রুতিগোচর হইত। গুরুদেব অনেক সময় এজন্য হাসিতে হাসিতে বলিতেন "মউজগিরি তোমারা বংশী ফুকা হো গেয়া"? যদি যোগক্রিয়া শেষ না হইত অমনি বলিতেন "মহারাজ! কুছ্ বাঁকী হ্যায়।" মধ্যে

গুরুদেবের শরীর একবার অসুস্থ হয়। এ সময়ে আমাদিগকে শুনাইতেন যে মহারাজের পূর্ব্বে তাঁহাকে যাইতে হইবে। আর যথার্থ করিলেনও তাহাই। দেহরক্ষার কয়েকমাসপূর্ব্ব হইতে নাভিদেশে বেদনা Colic pain এর মত একটা বেদনা মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে লাগিল। এরূপ বেদনা ভোগ করিলেও তাঁহার নিয়মিত কার্য্যে তিনি একদিনও পশ্চাৎপদ হন নাই। নানারূপ চিকিৎসা চলিতে থাকিলেও পরে এ বেদনাক্রমশঃ ঘন ঘন হইতে আরম্ভ হইল। সময়ে সময়ে যেরূপ যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিতেন তাহা দেখিয়া আমাদের কষ্ট হইত। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও তিনি একদিনও শৌচাদির জন্য পরমুখাপেক্ষী হন নাই বা শয্যাগ্রহণ করেন নাই। দেহরক্ষার মাত্র একদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে শয্যা লইতে দেখিয়াছি; কিন্তু এ অবস্থায়ও কেহ দেখিতে আসিলে আদর আপ্যায়ন সমভাবেই করিয়াছেন।

যে দিন দেহরক্ষা করিলেন সে দিনও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকলের সহিত বার্ত্তালাপ করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর আরতি হইতে লাগিল ও সে সময়ে আন্দুচোবেকে দুর্গাকবচ পাঠ করিতে বলিলেন। আন্দুপাঠ সমাপ্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "স্বামীবাবা! পাঠ ঠিক হইয়াছে ত?" তিনি উত্তর করিলেন যে অতি পরিশুদ্ধভাবে পাঠ হইয়াছে ও তিনি বিশেষ আনন্দ পাইয়াছেন। ঠিক এই সময়েই গুরুদেব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "মউজানন্দ! কেসা হ্যায়?" স্বামীজী উত্তর করিলেন "মহারাজ! আচ্ছি আনন্দে হ্যায়। আবি হামারি সুখভি নেহি হ্যায়, দুঃখভি নেহি হ্যায়।" ইহার পর পুনরায় মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে "কুছ ইচ্ছা হ্যায়?" স্বামীজি বলিলেন "কুছ ইচ্ছা নেহি হ্যায়, কেবল আপ্‌কো কৃপা।" মহারাজ লক্ষ্য করিলেন যে, শেষোক্ত কথা কয়েকটী যেন জড়তার সহিত প্রকাশিত হইল। ইহার অল্পক্ষণ পরেই স্বামীজী তিনটী ঢেকুর তুলিলেন ও এই ঢেকুরের সহিত যেন তিনবার তিনটী প্রণবধ্বনি বাহির হইল। ইহা হইতেই মহারাজ ইহাঁকে শয্যা হইতে ভূতলে তুলসী-বৃক্ষ সমীপে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন ও মুখে গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র দিয়া দিলেন। এরূপ করিতে এ মহাত্মা তাঁহার নশ্বর ভৌতিক দেহ রক্ষা করিলেন। ইহা হইয়াছিল ১৯২২ খৃঃ অঃ ২রা নবেম্বর ও এ সময়ে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর।

এ স্বামী মহারাজ সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার এ দেহ রক্ষার সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে পল্লী ও সহরে প্রচার হইল। তখনই পল্লীস্থ লোক জন আসিয়া

সমাধিস্থান খনন করিয়া ফেলিল। এ স্থানে গুরুদেবের আজ্ঞামত তাঁহাকে রুদ্রাক্ষমালা এবং বিভূতি ও পুষ্পমালায় পরিশোভিত করিয়া তাঁহার পুত দেহ বিধিমত সমাধিস্থ করা হইল।

এ মহাত্মার দেহরক্ষার পর গুরুদেবের চক্ষে জল দেখিয়াছি। তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গৃহস্থেরা পুত্রশোকে কেন কাতর হয় ইহার কিঞ্চিৎ বোধ মউজগিরি করাইয়াছে। সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে এ মহাত্মা আশ্রমের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার স্মরণার্থ ১২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া যে মহারুদ্রযজ্ঞ ও তাঁহার সমাধিস্থানের উপর যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন তাহা বহু পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ যজ্ঞব্যাপার ৭ দিনকাল এ সহরকে উন্মত্ত করিরাছিল।

মহারাজ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

মহারাজের জীবনের সহিত বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত আর একটী সাধুজীবন ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এজন্য তাঁহারও কিঞ্চিৎ জীবনী এই সঙ্গে দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। ইনি হইতেছেন মহারাজ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। ইনি আমাদের অনেকেরই গুরুভ্রাতা হইলেও আমরা ইহাকে সচরাচর "ছোট মহারাজ" বলিয়াই সম্ভাষণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মহারাজের মাতৃদেবীর তপোবনে দেহরক্ষার পর এবং রামচরণ বাবুর দেওঘরের নিজ বাড়ীতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের পর ও যে সময়ে মউজগিরি স্বামী তপোবন হইতে কাশীপুরে যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন সে সময়েই ইনি আসিয়া তপোবনে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে এই সুদীর্ঘকাল তিনি গুরুদেবের প্রধান শিষ্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এ সময় হইতে মহারাজ যখন উত্তরখণ্ড পঞ্জাব দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশে বিচরণ করিয়াছেন ইনি সে সময়ে সঙ্গে থাকিয়াছেন।

প্রথম হইতেই কেরাণীবাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ইনিই প্রধান উদ্যোগী ওসহায় ছিলেন কবলিতে হইবে। মহারাজের সঙ্গে ব্যতীতইনি নিজে রুদ্রনারায়ণ, পশুপতিনাথ, অমর নাথ; কামিখ্যা চন্দ্রনাথ ও গঙ্গাসাগর পর্য্যটন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে (১৯২৯ খৃঃ অঃ) ইহার বয়স হইবে ৫২।৫৩ বৎসর। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি সাধুজীবন গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ৩৩।৩৪ বৎসর কাল ইনি মহারাজের সহিত বাস করিতেছেন। মহারাজের নিকট বহু বিষয়ে ইনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলাস্থ জনাই নামক স্থানের কুলীন মুখোপাধ্যায় বংশে ইনি জন্ম-

গ্রহণ করেন। ইহাঁরা জনাইয়ের প্রাচীন জমিদারবংশসম্ভূত॥ ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সাধু চরণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ এখনও এই জনাই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কলিকাতায় তাঁহাদের বাড়ী ছিল ও জনাই গ্রামের তাঁহারা আংশিক মালিক ছিলেন; সুতরাং তিনি "শ্রীমতাংগেহেই" জন্ম-লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলে ইনি বিদ্যাভ্যাস করিতেন ও প্রবেশিকা ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছিলেন!

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সাধুসঙ্গ লাভ বা সাধু হইবার সংস্কার জাগরূক হইয়া উঠে। পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে, যখন ভূতানন্দ স্বামী প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে অবস্থান করিতেন সে সময়ে প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইয়া হঠযোগের কিছু কিছু উপদেশ লইয়া অভ্যাস করিতেন। ইহার পর তাঁহার এক বন্ধু সহিত পলাইয়া সাধু হইবার সংকল্প করিয়াছিলেন ও তপো-বনে আসিয়া মহারাজকে এ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। এ সময়ে তাঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের সম্মতি না হইলে গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ হইতে পারে না ইহা বুঝাইয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দেন ও মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। এ সময়ে তিনি সত্যব্রত সামশ্রমীর নিকটে উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থও কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। এ ঘটনার পর তাঁহার সংসারবৈরাগ্য বিশেষভাবে উদিত হয় ও এই তীব্রবৈরাগ্য লইয়া সাধু হইবেন স্থির করেন। এসময়ে কালীঘাটে কালীমাতার আদেশ পাইয়া মহারাজই তাঁহার গুরু হইবেন ইহা স্থির জানিতে পারেন ও পুনরায় তপো-বনে আইসেন। মহারাজ বুঝিয়াছিলেন যে, এ বালক গৃহস্থাশ্রমে থাকিবে না। এজন্য তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিলে, তিনি আনন্দের সহিত ব্রহ্মচারী জীবন গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন ও ইহার পর গুরুদেবের নিকট নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় হইতে তিনি মহারাজের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া প্রশান্তমনে তাঁহার সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এ সময় হইতেই তিনি বরাবর মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবস্থান করিয়া আসিতেছেন ও বহুবিষয়ে তিনি শ্রীগুরুদেবের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাজের অপ্রকট অবস্থায় তিনিই কেরাণীবাদ ও তপোবনের আশ্রমের সেবায়তরূপে সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন ইহা স্থির হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সন্ধানে।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,।

আমি অস্থির হ'রে উন্মাদসম
বিশ্বের দ্বারে দ্বারে।
প্রাণের দেবতা পূজিব বলিয়া
ফিরিয়াছি বারে বারে।

নগরীর মাঝে মহাকোলাহলে,
রাগ-রাগিণীর রূপসভাতলে,
যেথা নাচে প্রাণ মলয় হিল্লোলে
সেথায় পাইনি তাঁরে।
সেথা হ'তে গেছি তটিনীর তীরে,
রচেছি আশ্রম-লতা পাতা ঘিরে,
ধ্যানেতে বসেছি জটা রাখি শিরে
তবুও পাইনি তাঁরে।
দেবতা আমার! তোমার লাগিয়া
ফিরিয়াছি দ্বারে দ্বারে।

তথা হ'তে গেছি তীর্থেতে আমি,
দেখা পাব ব'লে, ওগো অন্তর্য্যামি!
আলোক সন্ধান না পাইনু স্বামি!
রহিনু অন্ধকারে।
ছুটিয়া বেড়াই পাগলের প্রায়,
তবু আমি তব দেখা নাহি পাই,
নিরাশা আঁধারে ঘুরিয়া বেড়াই
হতাশায় হাহাকারে।
হৃদয়-দেবতা পূজিব বলিয়া
ফিরিয়াছি বারে বারে॥

এত দিন পরে বুঝিনু এবার,
বৃথা শ্রম সুধু হয়েছে আমার,
মিথ্যা হইল অর্ঘ্য-উপহার
চরণেতে ভারে ভারে।
অজ্ঞান সম পুজেছি পাষাণে,
হৃদয়ের ব্যথা সে তো নাহি জানে,
ভক্তি-বিহীন জপ, তপ, দানে
কভু নাহি মিলে তাঁরে।
এতদিন ধরে পুজেছি কেবল
প্রাণ-হীন দেবতারে ॥

কস্তুরী সম গন্ধে মাতিয়া,
মরীচিকা ভ্রমে বৃথা না ঘুরিয়া,
নিরাশাক্ষুব্ধ হৃদয় লইয়া
চলিনু যমুনা পারে।
দূরেতে দেখিনু দীন একজন,
আমারে হেরিয়া করিছে ক্রন্দন,
দু' হাতে তুলিয়া মুছায়ে নয়ন
বুকেতে লইনু তারে।
এই বুঝি মোর প্রাণের দেবতা
যমুনা নদীর ধারে ॥

কাঙ্গালের বেশে, কাঙ্গালের মাঝে
পাইনু গো দেবতারে।
মন্দির মাঝারে কভু না মিলিল
মিলিল পথের ধারে ॥

আচার ও যোগ।

(পৌরাণিক আখ্যান)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

চন্দ্রবংশীয় রাজার পুত্র বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তপোবলে ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যার কথা পুরাণ-বিৎ পণ্ডিতগণ পরিজ্ঞাত আছেন। সেই বিশ্বামিত্রের একটি শিষ্যের নাম পাতঞ্জল।

পাতঞ্জল অতিশয় সদাচারী ও গুরুভক্ত ছিলেন। আশ্রম অনুযায়ী আহার ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার কঠোর সংযম ছিল (১)। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র পাতঞ্জলকে সঙ্গে লইয়া কোনও দুর্গম তীর্থে যাইতেছিলেন, পথে এক কিরাত-পল্লী। কিরাতপল্লীতে প্রবেশ করিয়াই পাতঞ্জলের অত্যন্ত পিপাসা হইল। তিনি পিপাসায় কাতর হইয়া জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বিশ্বামিত্র "কিরাতপল্লীর জল অপেয়" বলিয়া নিরস্ত করিলেন। পাতঞ্জলও পিপাসা দমন করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

বহুদূর গিয়া পাতঞ্জল একটী ঝরণার জলে পিপাসার নিবৃত্তি করিলেন। এদিকে বিশ্বামিত্র মুনি একটি কিরাতপল্লীতে গিয়া কিরাতের সহিত অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। পাতঞ্জলের মনে ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। ভাবিলেন, এই চণ্ডালের অন্ন গুরুদেব ভোজন করিলেন! তাও আবার উচ্ছিষ্ট! অথচ আমাকে একটু জলও কিরাতপল্লীতে খাইতে দেন নাই? আশ্চর্য্য!

---

(১) বর্ত্তমান কালে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী নিজের উপবীত বর্জ্জন করিয়া হঠাৎ "পরমহংস" হইবার জন্য চেষ্টিত। অথচ প্রথমে ব্রহ্মচারীর ব্রতগুলিই পালন করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ বালানন্দ স্বামীজী মহারাজ এ প্রথার বিরোধী। নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসীর কঠোরতা সম্বন্ধে তিনি বলেন "আগে হাঁস পরে পরমহংস।" অর্থাৎ আগে আশ্রমোচিত আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হও, পরে পরমহংসের সাজ ধরিবে। ব্রহ্মের সঙ্গে খোঁজ খবর নাই অথচ "আমি ব্রহ্মচারী" বলিয়া গেরুয়া ধরিলাম, এ কেমন কথা?

(প্রবন্ধ লেখক)

বিশ্বামিত্র মুনি শিষ্যের বিরক্তি লক্ষ্য করিলেন বটে, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আবার চলিতে লাগিলেন। মধ্যে সুবিস্তৃত কানন। এই মহারণ্য অতিক্রম করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে যাইতে হইবে।

দৈবযোগে সেই কাননের নিকটে যাইতেই দাবাগ্নি লাগিয়া কানন দগ্ধ হইতে লাগিল। ঐ কানন অতিক্রম করিতে হইলে মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঐ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পাতঞ্জল গুরুদেবের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, ভাবিলেন এই জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্য দিয়া কিরূপে যাওয়া যায়?

গুরুদেব কিন্তু অবহেলায় অগ্নিরাশির মধ্য দিয়া কাননের অপর পারে পৌঁছিলেন এবং শিষ্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শিষ্য তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে জড়বৎ হইয়া বসিয়া আছেন।

বিশ্বামিত্রের আহ্বানে পাতঞ্জল বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি আসিয়া লইয়া যান।" গুরুদেব তখন সেই অগ্নিরাশির মধ্য দিয়াই শিষ্যের নিকট আসিয়া তাঁহাকে কাননের অপর পারে লইয়া গেলেন। পাতঞ্জল নির্ব্বাক বিস্ময়ে কেবল গুরুদেবের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

শিষ্যের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র মিষ্টবাক্যে পাতঞ্জলের প্রতি কহিলেন, "কিরাত পল্লীতে তোমাকে জলপান করিতে নিষেধ করিয়া আমি নিজেই কিরাতের অর্দ্ধভুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিলাম, ইহাতে তোমার মনে আমার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মিয়াছে। তাহা জন্মিবারই কথা বটে! কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখ, যোগীর প্রথমাবস্থায় অনেক সব আচার বিচার মানিয়া চলিতে হয়; শেষ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে আর আচার বিচার না মানিলেও চলে। (১)

আমি অগ্নিমধ্য দিয়া গমন করিতে পারি, জলের উপর দিয়াও গমন করি, তোমার সে শক্তি জন্মায় নাই। সেই জন্যই তোমাকে আমি আচার ভ্রষ্ট হইতে দিই নাই। যোগীর পক্ষে প্রথম অবস্থায় আচার বিচার মানিয়াই চলিতে হয়। শেষে সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়।"

পাতঞ্জল গুরুদেবের বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং কঠোর সংযমের সহিত যোগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন।

---

(১) ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন, যে "ব্রহ্মজ্ঞান আঁচলে বেঁধে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই যাও, দোষ নাই।" নিম্নস্তরের যারা তাহাদের জন্যই খাওয়া পরার সংযম প্রয়োজন, উচ্চস্তরের যোগীগণ চিরসংযমী বলিয়া আর তাঁহাদিগকে বিধি নিষেধ মানিতে হয় না। (প্রবন্ধ লেখক)

গুরুভক্তির পরিণাম।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

(১)

রত্নপুরের হরিসাধু সম্প্রতি পিতৃহীন হইয়াছেন। তাঁহার মাতৃদেবী ইতঃপূর্ব্বেই স্বর্গগমন করিয়াছেন। সুখ দুঃখের কথা বলিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতে তাঁহার ভাই শ্রীনাথ ও পত্নী রমা ভিন্ন সংসারে আর কেহই নাই।

সাধু মহাশয়ের পিতা ব্যবসায় বাণিজ্যে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। তিনি পুত্রকে বলিতেন, "বাবা! শ্রীগুরুর কৃপায় আমার এই সব হয়েছে। আগের অবস্থা মনে করিয়া বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "পয়সার অভাবে আমি পড়্‌তে পারিনি, একবেলা ছাতু খেয়ে থাক্‌তেম, একবেলা সিদ্ধ পোড়া ভাত পেতাম। আমায় চিরদুঃখিনী মাতা কতদিন অনশনে, কতদিন অর্দ্ধাশনে দিন কাটিয়েছেন। গুরু কৃপা করে এই পাতার ঘরে এলেন, আমার মা পাদপদ্ম প্রক্ষালনের সময় কেঁদে ফেল্‌লেন। যত্নের সহিত চুল দিয়ে পাদপদ্ম মুছিয়ে দিলেন।

গুরুদেব একটু হেসে মাথায় হাত দিয়ে বল্‌লেন "মা, তুমি কেঁদো না। তোমার অবস্থা ফির্‌বে, শীঘ্রই ফির্‌বে। কৈ, তোমার যা আছে আমায় দাও মা।" আমার মা কলার পাতে করে, একটু গুড় আর একটি ফুটি কাঁকুড় গুরুর সেবার জন্য রেখে দিয়ে অঝোর ঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

গুরুদেব চক্ষু মুদিয়া ইষ্টদেবকে সেই ফুটি নিবেদন কর্‌লেন, তৎপরে খানিক ফুটি-কাঁকুড় ও গুড় সেবা করে একটু জল খেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, "গাছে আর একটি ফুটি ধরেছে, সেটি বড় হলে যত্ন করে তুলে রেখো, আমি আস্‌বো।" কিছু দিন পরে এসেই বল্‌লেন, আজ পূর্ণিমা তিথি। তোমরা উপবাস থেকে ইষ্ট পূজা কর।"

আমার মাতা পিতা সমস্ত দিন ইষ্টসেবা কর্‌লেন, ইষ্টনাম জপ কর্‌লেন। শেষে গুরুদেব বল্‌লেন, "সেই ফুটি কাঁকুড়টি আনত মা!" আমার মা ফুটি হস্তে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গুরুদেবের কাছে গেলেন। গুরুদেব সেটিকে ভেঙ্গে ফেল্‌তেই দেখা গেল, আশ্চর্য্য! ভেতর থেকে কেবলই সোনা বেরুচ্ছে। খুব কম হলেও একসের সোনা। সে সোনার কি রঙ্গ! যেন আগুন!

এই সোনাতেই সোনা ফল্‌লো! একজন স্বর্ণকারকে দোকান করে দিয়ে অল্প লাভে গয়না বিক্রী কর্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমেই গ্রাহক বাড়্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু সেই সোনার কিছু অংশ দিয়ে শ্রীগুরু পাদপদ্ম গঠন ক'রে নিত্য তাতে ফুল চন্দন দিয়ে থাকি। তুমিও যাবজ্জীবন দিও বাপ্!"

২

সেই অবধি হরি সাধু পিতার আদেশ মত পিতৃগুরুর শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি পিতৃদেবের গুরুদেবও দেহ রক্ষা করিয়াছেন। গুরুমাতার নিকট দীক্ষা লইয়া সাধু মহাশয় গুরুপাটটি বাহাল রাখিয়াছেন। গুরুমা বৃদ্ধা এবং বাতব্যাধি পীড়িতা, তজ্জন্য যাতায়াত করিতে অসমর্থা। কাজেই তাঁহার এক ভাই আসিয়া দিদির সংসার দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যুক্তি করিবার জন্য সাধু মহাশয় শ্রীপাটে পত্র লিখিলেন। পত্র পাঠ মাত্র গুরুদেবের শ্যালক শ্রীমান গজেন্দ্র নাথ ঠাকুর পদব্রজে রত্নপুরে শুভাগমন করিলেন।

গজেন্দ্র ঠাকুর গজবুদ্ধি, গঞ্জিকাসেবী এবং গতিপটু। বেশী বাক্যব্যয় করেন না, কারণ বিদ্যায় গোবরগণেশ। "কি জানি, কখন কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব আর লোকে হাসিয়া দন্ত দেখাইবে।" এই ভাবেন।

গজেন্দ্র ভোজনপটু ভোম্বলদাস, কিন্তু তত্ত্বকাজে ভুলেন না। পুটুলি বন্ধন করিতে খুব শীঘ্রহস্ত।

গজেন্দ্র ঠাকুর শুভাগমন করিলে শ্রীনাথ সহ হরিসাধু গড় হইয়া দণ্ডবৎ করিলেন এবং পদধূলি মাথায় ও মুখে দিলেন। শ্রীনাথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, তিনি ধূলা খাওয়াটা পছন্দ করেন না। কারণ ধূলায় কত জীবাণু আছে, তাহা খাইয়া মরণ ডাকিয়া আনা কেন?

কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করার পর সকলে উপবেশন করিলেন। নূতন কলিকায় তামাকু সাজিয়া ঠাকুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল "হুঁকা আছে কি?" ঠাকুর মহাশয় ঘাড় নাড়িলেন এবং পুটুলি খুলিয়া হুঁকা বাহির করতঃ তাহাতে জল করিতে আদেশ দিলেন। তামাকু সেবন করিতে করিতে সংক্ষেপে ঠাকুর মশায় জিজ্ঞাসা করিলেন —

"ক্রিয়াটা দান সাগর কর্‌বে ত?"

হরি। আপনার অনুমতি।

ঠাকুর। হ্যাঁ, তাই কর। কারণ শাস্ত্রেই বলেছে—

"বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥"

অর্থাৎ ধন থাকৃতে কৃপণ হইতে নাই। হ'লে পিতৃহত্যার পাতক হয়।

হরি। আজ্ঞা, এ বিষয়ে আপনার যা অভিপ্রায় তাই হবে। কোনও বিষয়ে যেন ত্রুটি দোষ না হয়।

ঠাকুর। না, আমি থাকৃতে তা হতে দেব না। এইবলিয়া ফুর ফুর করিয়া একটি দম দিয়া ধূম রাশি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন।

এদিকে সাধুগৃহিণী রমাসুন্দরী একটী গামলায় জল লইয়া জলচৌকি পাতিয়া নূতন তোয়ালে লইয়া বসিয়া আছেন, হরিদাস একবার বাড়ীর মধ্যে গেলেন, দেখিলন সব ঠিক হইয়াছে, তখন ঠাকুর মহাশয়কে বলিলেন, "আসুন, চরণ ধৌত করুন।"

বহির্ব্বাটী হইতে ভিতরে যাইতে যাইতে গজেন্দ্র দেখিলেন, কয়েকটি কাঁঠাল গাছে প্রচুর কাঁঠাল ধরিয়াছে। কাঁঠালগুলি নাতি না তিনীর ন্যায় ঠাকুরদাদা রূপী মহাবৃক্ষকে কাঁধে পিঠে বুকে পেটে ধরিয়া আমোদ করিতেছে।

তাহার পর কতকগুলি নারিকেল বৃক্ষ, তাহাতে ডাব ধরিয়াছে। ডাব গুলির সরস সবুজ রঙ দেখিয়া গজেন্দ্র নাথের গলা শুকাইয়া উঠিল, তাঁহার মনে হইল, অদ্যই এক আধটা পান করিবেন। মনের ভাব দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "বেশ ডাবগুলি ধরেছে। গ্রীষ্মকাল, এ সময় এগুলির প্রয়োজন। তা, এ ব্যাপারে অনেক ডাবের প্রয়োজন বটে। ধরেছেও অনেকগুলি!"

হরিদাস কহিলেন, "এ গুলি স্বর্গীয় ঠাকুর মহাশয়ের আদেশে পূজনীয় পিতৃদেব যশোর থেকে আনিয়ে ছিলেন। বার বৎসর হ'লো ফল্‌ছে। "এ গুলি কি?"

"এ গুলি তরমুজের গাছ। দুই চারিটি ধরেছে।"

গজেন্দ্র মনে মনে প্রীত হইয়া অট্টালিকার অলিন্দে উপনীত হইলেন। রাজবাড়ীর তুল্য প্রাসাদ। মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মেজে দেওয়ালের সবুজ বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছে। অঙ্গনে বেল যুই নাইটকুইন প্রভৃতি পুষ্পের গাছ সুসজ্জিত। বারান্দায় টবে করিয়া রজনীগন্ধা চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ স্বদেশীয় পুষ্প ও বিদেশীয় পুষ্পলতিকা সজ্জিত রহিয়াছে।

আঙ্গিনায় উচ্চবেদীর উপরে তুলসীবৃক্ষ স্থাপিত, তদুপরি মৃণ্ময় কলসী সছিদ্র করিয়া টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ কলসীতে চন্দনাক্ত জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা বিন্দু বিন্দু করিয়া তুলসী বৃক্ষে পতিত হয়। সাধু দম্পতীর নিত্যকর্ম্ম তুল সী বৃক্ষে জলদান। ইহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই।

ঠাকুর মহাশয় সাধুর ঐশ্বর্য্য দর্শনে অবাক হইলেন। (আগামী বারেসমাপ্য)

সংসারে ব্রহ্মসাধন।

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস, সি, বি, এল, বিরত।

১। অপ্রতিম পরব্রহ্মকে লাভ কর।

যে অপ্রতিম পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আমাদের আজকাল এই উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন, হে অমৃতের পুত্রগণ! উত্তিষ্ঠত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উত্থান কর, জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের সন্নিধানে গিয়া সেই পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ কর। আজ এই মাঘোৎসবের পুণ্যপ্রভাতে ঋষিদিগের উচ্চারিত জাগরণ-মন্ত্রের দ্বারা অপ্রতিম পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য আপনাদিগকে আমি তারস্বরে আহ্বান করিতেছি। যে নিত্য জাগ্রত মঙ্গলময় বিধাতা নিয়তই আমাদের মঙ্গলবিধান করিতেছেন এবং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে নিয়তই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে মাত্র বুদ্ধিতে জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। শ্রদ্ধাভক্তির ভিতর দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে হইবে।

২। সংসারে ব্রহ্মসাধন সহজ পথ।

নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে আমাদের দেশে এই একটি ভাব চলিয়া আসিতেছে যে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে সমস্ত সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ভিতর যে সত্য নাই তাহা নহে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটি বৃহত্তর সত্য আছে, যাহা সাধনা করিবার জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিশেষভাবে উপদেশ লাভ করি। সেই বৃহত্তর সত্য এই যে, যেমন দুঃখবিপদের কশাঘাতের ভিতর দিয়া ভগবানকে জানিতে হইবে। সেইরূপ সুখ, সম্পদের করুণারও ভিতর দিয়াও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অরণ্যপর্ব্বতের নীরবতার ভিতরেও যেমন তাঁহাকে আত্মা দ্বারা স্পর্শ করিবে, সেইরূপ গৃহ-সংসারের সজন কোলাহল কলরবের ভিতরেও তাঁহারই করুণামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সংসারধর্ম্ম বজায় রাখিয়া পরমাত্মার সহিত আত্মসমাধানের উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ ঝোঁক দিয়া থাকেন। ভগবান যখন আমাদিগকে পিতামাতা ভাইভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত গৃহসংসার দিয়াছেন, তখন

সেই গৃহসংসারের ভিতরে থাকিয়াই তাঁহাকে লাভ করা তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, ভগবান আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস যেমন সহজ করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ গৃহ-সংসারে থাকিয়াও তাঁহাকে লাভ করাও প্রত্যেক মানবের অন্তরে সহজ সত্যরূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন; তাই এই সহজ সত্য ছাড়িয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে প্রবেশ করিবার অথবা অযথা তর্কবিতর্কের গহন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

৩। সীমাবদ্ধ হওয়াই দুঃখের কারণ।

ভগবানই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। আমরা তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত একএকটী সীমাবদ্ধ বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। সুতরাং শরতের নির্ম্মল আকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বর্ষার প্রারম্ভে যেমন মসীবর্ণ ঘনমেঘজাল সুনীল আকাশমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ দুঃখবিপদের ঘন মেঘজাল যে আমাদের অন্তরকে সময়ে সময়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, পাপতাপের জ্বালাযন্ত্রণার অসহ্য উত্তাপে সময়ে সময়ে আমরা যে মুহ্যমান হইয়া পড়িব, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সীমাবদ্ধ হইবার কারণেই আমরা পূর্ণ ভগবান নহি বলিয়াই এইরূপ দুঃখবিপদ পাপতাপের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। একথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা যে, আমরা কেন সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। এই প্রশ্নের উপর শতবিধ কূট তর্কবিতর্ক উপস্থিত করিতে পারিলেও উহার শেষ সিদ্ধান্তে মানব কোনকালে উপস্থিত হইতে পারিবে বলিয়া মনে করি না। একমাত্র ভগবানই এই প্রশ্নের শেষ পরিসমাপ্তি।

৪। মঙ্গলময় সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে।

সংসারে দুঃখবিপদ আছে বলিয়া মঙ্গলময় বিধাতার করুণার কথা ও মঙ্গল ভাব ভুলিলে চলিবে না! মাতৃগর্ভে অবস্থান অবধি আমরণ যাহার করুণা প্রতিপদে উপভোগ করিবার অবসর পাই, যাঁহার মঙ্গল হস্তের লিখন প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে, বায়ুর প্রতি হিল্লোলে, স্রোতস্বতীর প্রতি জলবিন্দুতে দৃষ্ট হয়, সময়ে সময়ে দুঃখবিপদের তাড়নায় বা পাপতাপের যন্ত্রণায় তাঁহার স্নেহময় মঙ্গলময় ভাব ভুলিলে চলিবে না। প্রত্যক্ষ কর, সমস্ত দুঃখবিপদের মধ্যে তিনি তোমার সম্মুখে পিতৃমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। তোমার দৃষ্টিকে অন্তরে ফিরাইয়া

উপলব্ধি কর, সমস্ত পাপতাপ জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে তিনি করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিয়া তোমার মনে প্রাণে নিত্যই শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। ইহা স্থির জেন যে, সেই পরম পিতামাতা পরমেশ্বর দুঃখবিপদ পাপতাপ সমস্তই তোমার মঙ্গলসাধনেরই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। দুঃখবিপদই বল, বা সুখ-সম্পদই বল, এসমস্তই তাঁহারই স্নেহের দানস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—কিছুই অবজ্ঞা বা উপেক্ষার বিষয় নহে। ইহা সুনিশ্চিত যে এই বিশ্বজগত যাঁহার সৃষ্টি তিনিই যখন তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অনুপম সুন্দর জগতে তোমার আসিবার মূলকারণ যখন তিনিই, তখন তিনি কখনই তোমার প্রকৃত বিনাশের কারণ হইতে পারেন না—তিনি তোমা হইতে দূরে থাকিতে পারেন না, মুহূর্ত্তেরও জন্য তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সংসারের সকলেই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি তুমি তাঁহার অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত থাকিতে পারিবে না। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া আলোচনা কর—করিলেই দেখিতে পাইবে যে অতীতে তুমি কতবার বিপদসাগরে ডুবিতে ডুবিতে বা পাপতাপের দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে কাতর প্রাণে সেই বিপদকাণ্ডারী ও পাপ-নিসূদন ভগবানকে যখনই রক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়াছ, তখনই তিনি তোমার বিপদজাল মুহূর্ত্ত-কাল মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া এবং তোমার পাপদগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। লক্ষ-কোটী যুগযুগান্তর ধরিয়া জগতে লক্ষ কোটী জীব তাঁহারই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়াছে ও করিতেছে এবং তাঁহারই জ্ঞানের ও তেজের কণামাত্র লাভ করিয়া জগতের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাই যে আমাদিগকে তাঁহার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে তিনি যেমন অন্নপান দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন সেইরূপ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আজীবন তিনি আমাদিগকে তাঁহার অক্ষয় প্রেমের রক্ষাকবচে নিত্যই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী প্রেমধারায় আমাদের দেহমন আত্মা দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহারই অমৃতরস পান করিয়া এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারিলেও তিনি কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না—করিতে পারেন না।

৫। সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিয়ত হও।

চক্ষের সম্মুখে সামান্য কুটাকাঠি আসিয়া আড়াল করিলে যেমন সমস্ত বিশ্বজগৎ অন্তরালে পড়িয়া যায়, সংসারের ছোটখাট ক্ষণিক সুখদুঃখকে মনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ঈশ্বরকে সেই প্রকার অন্তরালে ফেলিতে দিও না। সংসারের সকল কর্ম্মেই, জগতের প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ কর—প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার চরণে সমুদয় হৃদয়মন অর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়াই নিজের ও পরিবারের, দেশের ও জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলসাধক কার্য্যসমূহে আত্মনিয়োগ কর।

৬। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ।

তাঁহার উপাসনার জন্য বাহ্যাড়ম্বরের ঘনঘটার প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার বাহিরের উপকরণের অপেক্ষা নাই। অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণে শুভকর্ম্ম সম্পাদনই তাঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যটী স্পষ্টতর ভাষায় সুব্যক্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্ররূপে সন্নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতি করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই তাঁহার উপাসনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে উপাসনার মূলতত্ত্ব এমন সংহত আকারে আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

৭। তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই।

তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই। সমস্ত অমঙ্গলের ভিতরেই তাঁহার মঙ্গলহস্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রতি নিমেষের প্রতি ঘটনায়, গাছের প্রতি পত্রে, কুসুমের সুগন্ধে ও আমাদের অন্তরের সদ্ভাবসমূহে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সেই বিশ্বপতি ও বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষকে জানিবার অধিকারে তাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয় অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত দেখা যায়।

৮। তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু নাই।

তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু ও বিনাশ বলিয়া কিছুই নাই। তিনি প্রাণস্বরূপ। তিনি সমস্ত প্রাণের মূলাধার। তাই আমরা কি বাহিরের প্রকৃতিরাজ্যে, কি আমাদের অন্তরের অধ্যাত্মরাজ্যে—কোথাও প্রকৃত মৃত্যু বা বিনাশ দেখিতে পাই না। বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন মৃত্যু বা বিনাশের নামে পরিবর্ত্তনেরই চিরন্তন লীলাখেলা দেখিতে পাই—সেইরূপ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও প্রতিপদে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর নামে পরিবর্ত্তনেরই বিচিত্র লীলার পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই পরিবর্ত্তনসূত্রেই মানবজীবনের পশুত্ব ঘুচিয়া যায় এবং মানুষ আপনাকে দেবতার পদে উন্নীত করিতে সক্ষম হয়। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

৯। তাঁহাতে আত্মসমর্পণই রক্ষার উপায়।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি কখনও দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকি, যদি কখনও অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনি, যদি কখনও মৃত্যু বা বিনাশের অভিমুখে ধাবিত হই, তবে সেই দুঃখবিনাশন কলুষহরণ পরমেশ্বরের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেই আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব—আমাদের সকল দুঃখতাপ, সমুদয় জ্বালা যন্ত্রণা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং আমাদের অন্তরে শান্তিসুধা শতধারে বর্ষিত হইবে। তাঁহার আদেশপালনেই আমাদের সুখ, আমাদের জীবন। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণেই আমাদের দুঃখ, আমাদের মৃত্যু। তিনি আমাদের অন্তরে তাঁহার আদেশপালনের শুভবুদ্ধি নিয়তই প্রেরণ করিতেছেন। সেই শুভবুদ্ধির অনুশাসন অবহেলা করিবার ফলেই আমরা দুঃখলাভ করি এবং মঙ্গলময়ের প্রতি সংশয় পোষণ করিতে থাকি। এই সংশয় দূর করিয়া দাও। ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তাঁহারই প্রেরিত শুভবুদ্ধি যে পথ প্রদর্শন করিবে, সেই পথ ধরিয়া চল—কণ্টকের আঘাতে তোমাকে জীর্ণশীর্ণ হইতে হইবে না, বিষদিগ্ধ বায়ুতে তোমাকে কঙ্কালসার হইতে হইবে না। যাঁহার জ্ঞানের, যাঁহার বলের কণামাত্র লাভ করিয়া সাধুমহাত্মাগণ সংসারের দুঃখবিপদ দূরীকরণে আশ্চর্য্য বল ধারণ করেন, ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল জ্ঞানের উৎস, সকল বলের উৎস সেই পরম পুরুষের চরণস্পর্শ লাভ করিলে

তোমার দুঃখবিপদ শোকতাপ সকলই বিদূরিত হইবে। আজ এই উৎসবের পুণ্য প্রভাতে সেই আত্মদা বলদা পরমেশ্বরের চরণ-বন্দনা করিয়া এস, জীবনকে ধন্য করি।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! হে উৎসবদেবতা! এই মহোৎসবে আমাদের মস্তকে তোমার আশীর্ব্বাদ শতধারে বর্ষণ কর, যাহাতে আমরা আমাদের শরীর মন আত্মাকে বুদ্ধি ও বলে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিয়া তুলিতে পারি; যাহাতে আমরা কি অর্থ ও মানে, কি যশে ও কীর্ত্তিতে, কি জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আসন অধিকার করিতে পারি। আমাদিগকে এমন শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর যাহাতে আমরা অসহায়ের সহায়, এবং দুর্ব্বলের বল হইতে পারি, অনাথ ও আতুর যাহারা তাহাদের অভাব মোচন করিয়া তাহাদের শরীরে বল এবং মনে সুখশান্তি বিধান করিতে পারি। বিপদ আপদ যখন আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আমরা যখন রোগশোকের অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া শক্তিহীন অবস্থায় নিপতিত হই, তখন হে দুঃখবিনাশন ভগবান! তুমিই আমাদিগের বর্ম্মদুর্গ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিও; আমাদের দুঃখ বিপদ, আমাদের রোগশোক সমস্তই বিদূরিত করিয়া আমাদের প্রাণে শান্তি-বারি ঢালিয়া দিও। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, জননীরূপে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছ, ইহা অন্তরে বুঝিবার শক্তি ও বুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি—তুমি আমাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক।

সুখ আসিলে তাহাও যেমন তোমার দান বলিয়া গ্রহণ করি, দুঃখ আসিলে তাহাও যেন তোমার দান বলিয়া মস্তক পাতিয়া লই। দুঃখের ভারে আমরা যেন আপনাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে না দেই। তোমার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যেন সর্ব্বদাই জনহিতকর কার্য্যে নিরত থাকি, স্বার্থের বশীভূত হইয়া কোনপ্রকার অমঙ্গল চিন্তাকে অন্তরে যেন স্থান না দেই বা কোন প্রকার অমঙ্গল কার্য্যে যেন হস্তক্ষেপ না করি। আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকে যেন সর্ব্বদাই বিমল ও পরিশুদ্ধ রাখি। প্রতিদিন প্রভাতে আমরা যেন আমাদের জীবন তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দেই এবং তোমার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া, সেই পথে চলিতে অভ্যাস করি। হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! আমাদের অন্তরে এই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, যাহাতে তোমার প্রতি আমাদের আস্থা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে, যাহাতে তোমার প্রতি আমাদের সকল

আশাভরসা অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারি এবং আমাদের ছোটবড় সকল কার্য্যে ও সকল অবস্থাতে তোমার সহিত অনন্যভাবে একাত্মযোগে যুক্ত থাকিতে পারি। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি সর্ব্বতোভাবে সফল কর।

ওঁতৎসৎ।

বিনামূল্যে দেশীয় ঔষধ।

লেখক—কবিরাজ শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন।

প্রথমে ম্যালেরিয়ার কথাই বলি। 'কুইনাইন, ম্যালেরিয়া, জ্বরের ভাল ঔষধ কি মন্দ ঔষধ তাহা বলিতেছি না। যেখানে লোক ম্যালেরিয়া জ্বরে এক ফোঁটা ঔষধ অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সেখানে যদি আমাদের বাড়ীর আসে-পাশে ম্যালেরিয়ার কোন ঔষধ পাওয়া যায়, তাহা কি সেবন করা উচিত নহে? তাই আজ আমি ম্যালেরিয়া জ্বরের দেশী ঔষধের কথা কিছু বলিব। আমি এই ঔষধের কথা আগেও বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, সকলকেই আমি এই মহৌষধটি প্রস্তুত করিতে বলি!

ম্যালেরিয়ার দেশীয় ঔষধ।

নাটকরঞ্জারগাছ বাঙ্গলাদেশের যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নাটা ফলের বীজশস্য রৌদ্রে শুষ্ক ও চুর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ তিনভাগ ও পিঁপুল চূর্ণ একভাগ একত্র শিউলী ফুলের পাতার রসে ভাবনা দিয়া অর্থাৎ উক্ত দুইচূর্ণ একত্রে শিউলী পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া সাতবার শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে ও পরে শিউলী পাতার রসে মর্দ্দন করিয়া চারি রতি পরিমাণ বড়ি প্রস্তুত করিতে হইবে ইহাকে নাটার বড়ি বলে। এই নাটার বড়ি সকলেই কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়া রাখিলে অনেক উপকার হইবে। জ্বর কমিবার মুখে বা জ্বর ছাড়িলে এই বড়ি শীতল জল দিয়া বা মধু দিয়া মাড়িয়া সেবন করিতে দিতে হয়। একঘণ্টা অন্তর তিনবার সেবন করিতে দেওয়া চলে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কার্য্য করার সুযোগ আমার কয়েকবৎসর ঘটিয়াছে। আমি দাতব্য চিকিৎসালয়েকয়েক বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত রোগীর উপর এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বস্থলেই বিশেষ ফল পাইয়াছি

তাই আমি আমার দেশবাসীকে ম্যালেরিয়ার সময় এই ঔষধটী ব্যবহার করিতে জনুরোধ করিতেছি। এই ঔষধ সেবনে জ্বর বন্ধ হইলেও জ্বর বন্ধের পর সাত আটদিন প্রত্যহ সকালে একটী বড়ি ও বৈকালে একটী বড়ি শীতল জল বা মধু দিয়া সেবন করিলে পুনরায় আর জ্বর আসিবার সম্ভাবনা থাকে না।

আঙুলহাড়ায়।

আঙুলহাড়া হইলে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা হয়, তাহা বলিবার নহে। আঙুল হাড়া হইলে—যজ্ঞডুমুর গাছের ছাল বেশ করিয়া বাটিয়া আঙুলহাড়ায় প্রলেপ দিলে অতি সত্বর আঙুলহাড়া ভাল হইয়া থাকে। প্রলেপ শুকাইয়া যাইলে গরম জল দিয়া উক্ত প্রলেপ ধুইয়া ফেলিয়া পুনরায় যজ্ঞডুমুরের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিতে হয়। এইরূপ ভাবে দিনে দুই তিনবার প্রলেপ দিতে হইবে। যজ্ঞডুমুরের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিয়া প্রলেপের উপর কলার পাতা দিয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ভাল হয়।

অজীর্ণ।

যাঁহারা বহুদিন হইতে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগিতেছেন তাঁহাদিগকে আমি নিম্নলিখিত ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে বলি। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্ল নিবারিত হইবে, ক্ষুধা হইবে ও দাস্তপরিস্কার থাকিবে। নিম্নলিখিত ভাবে এই ঔষধটি প্রস্তুত করিতে হইবে।

হরীতকী (আটি বাদ দিয়া) চূর্ণ চারি ভাগ, যোয়ান চুর্ণ দুই ভাগ, লবঙ্গ চুর্ণ এক ভাগ, বিটলবণের গুড়া একভাগ, একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া লইলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হইবে। প্রত্যহ চারি আনা মাত্রায় এ ঔষধ গরম জল ও কাগজি বা পাতি লেবুর রস সহ সেবন করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যাইবে। দুই বেলা আহারের পর এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

কাস রোগ।

যাঁহারা পুরাতন কাসিতে কষ্ট পাইতেছেন এবং যাহাদের বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধটি নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ চুর্ণ প্রত্যেক একভাগ ও শ্বেত আকন্দ গাছের ফুল ঐ তিনটি দ্রব্যের সমভাগ (অর্থাৎ ঐ তিনটী দ্রব্য যদি এক তোলা করিয়া লওয়া

হয় তাহা হইলে শ্বেত আকন্দের মূল তিন তোলা লইতে হইবে) একত্র জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া এক আনা পরিমাণ বটি করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই বটী সকালে একটী ও বৈকালে একটী মধু সহ মাড়িয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। এই ঔষধ মধু অভাবে চুষিয়া খাইলেও উপকার হইবে। বুকে শ্লেষ্মা বসিয়া থাকিলে আকন্দ পাতার সোজা পিঠে একটু পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া বুকে ও পিঠে উক্ত পাতা বসাইয়া নুণের পুটলির সেক দিলে শ্লেষ্মা সরল হইয়া যাইবে।

বহুমূত্রে।

যাহারা বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা যদি এই ঔষধটি প্রস্তুত করিয়া সেবন করেন তাহা হইলে বিশেষ উপকার পাইবেন। এই ঔষধে প্রস্রাবের পরিমাণ কম হইবে ও ক্রমশঃ শর্করা হ্রাস পাইবে। এই ওষধটী নিম্নলিখিত ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়। যজ্ঞডুমুরের বিচির গুঁড়া ও কালজামের বিচির গুড়া প্রত্যেকসমান ভাগে লইয়া একত্র কলাগাছের এঁটের রসে সাতবার ভাবনা দিবে অর্থাৎ উক্ত দুই গুঁড়া একত্র মিশাইয়া একবার কলার এঁটের রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। পুনরায় ঐ চূর্ণ একত্র কলার এঁটের রসে মর্দ্দন করিতে হইবে ও সাতবার শুষ্ক করিতে হইবে এবং শেষে আর একবার কলার এঁটের রসে মর্দ্দন করিয়া চারি আনা মাত্রায় বটি করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই এই ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই বটি সকালে একটী ও বৈকালে একটী মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিলে সুন্দয় ফল পাওয়া যাইবে। এই ঔষধ মধু অভাবে শীতল জল সহ খাইলে চলিবে। আমি দাতব্য চিকিৎসালয়ের বহুমূত্র রোগীকে এই ঔষধ খাইতে দিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

স্বরভঙ্গ।

কাস জন্য বা ঠাণ্ডা লাগিয়া স্বরভঙ্গ হইলে নিম্নলিখিত যোগটি বিশেষ ফলপ্রদ। বচ, হরীতকী (আটি বাদ), বাসক ছাল, পিঁপুল চূর্ণ প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঐ চূর্ণ দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়। ৭।৮ দিন সেবনে কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন ভিন্ন প্রত্যহ একবার করিয়া এক তোলা ব্রাহ্মী শাকের রস খাইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

সুশিক্ষিত ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়গণের মতে প্রস্তুত বিংশবর্ষকাল সুপ্রচলিত

প্রত্যেক মহৌষধাবলীর নাম ও ট্রেডমার্ক হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্নী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল, দ্বারা আইনানুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে—ক্রেতাগণ ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।



বর্ত্তমানকালে জ্বররোগে যত প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে ডাক্তারি মতের ঔষধই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আশু ফলদায়ক তাহা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার মহাশয়গণের দ্বারা এই "**শম্ভুসুধা**" মহৌষধটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শম্ভুসুধা সেবনে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর, নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ঘুসঘুসে পালাজ্বর, কম্পজ্বর, মেহ ও প্রমেহ ঘটিত জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, বাতজ্বর পিত্তজ্বর কফজ-জীর্ণ জটিল জ্বর, কালজ্বর ও ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বরই **শম্ভুসুধা** সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়, এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। শম্ভুসুধা ২৪ মাত্রা সেবনেই জ্বর বন্ধ হয়, কিছুদিন ব্যবহারে প্লীহা যকৃৎ কমিয়া যায় এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরভাব সর্দ্দি কাশী হইলে শম্ভুসুধা একমাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের জড়তা দূর হইবে। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে টনিকের কার্য্য করে; অতএব শম্ভুসুধা প্রত্যেক গৃহস্থের সর্ব্বদা গৃহে রাখা আবশ্যক, শরীর সামান্য একটু শ্লেষ্মা ভারাক্রান্ত বোধ হইলে একমাত্রা "শম্ভুসুধা" সেবন করিলে শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। মূল্য প্রতি ৮ আট আউন্স শিশি ৸০ আনা ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।



রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্নস্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে "**অমৃত সার সালসা**" সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের **অমৃত সালসা**" সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা। ৬ শিশি ৫।০ টাকা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র, এক ডজন লইলে ১০৲ টাকা।

৺কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন ও কবিরাজ
শিশিকান্ত সেন কবিভূষণ মহাশয়ের—

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

কবিরাজ শ্রীকালীভূষণ সেন কবিরত্ন।

৩ নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কবিরাজ মহাশয়দিগের বংশপরম্পরা হইতে এই ঔষধালয় সুপরিচালিত হইয়া যে সাধারণের মহোপকার সাধিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং ঔষধালয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেবলমাত্র সাধারণের অবগতির জন্য স্বর্গীয় কবিরাজ মহাশয়ের আবিষ্কৃত দুই একটী ঔষধের নাম দেওয়া গেল।



মূল্য প্রতিশিশি ১৷৹ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র। ডজন ১৫৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

উপদংশ পীড়ায় ও তজ্জনিত পারা সেবনের ফলে বা অন্য কোন কারণে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া গাত্রে চুলকানি, দাগপড়া, স্ফোটোৎপত্তি বা কুষ্ঠ হইয়া থাকিলে এই ঔষধ সেবনে তাহা অচিরে নষ্ট হইয়া শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয়।

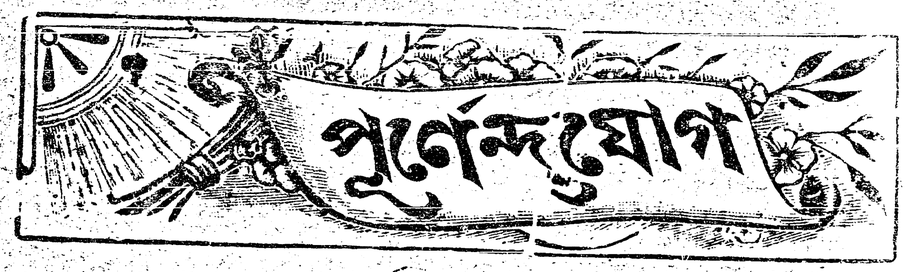

২৪ ঘণ্টায় জ্বালা আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

(সপূঁয মেহ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ।)

ইহা প্রমেহ, শুক্রমেহ, রক্তমেহ, সপূঁজ মেহ রোগের মহৌষধ এবং তজ্জনিত জ্বালা যন্ত্রণাদির পক্ষে আশুফলপ্রদ।

এতদ্ভিন্ন **জরারিষ্ট** বিষম—সর্ব্ববিধ জ্বরনাশক। **কনকাসব**—হাঁপানীকাসের মহৌষধ। **ভৃঙ্গরাজ তৈল**—মহোপকারী কেশতৈল। **শুক্রবল্লভ বটিকা** ধারণাশক্তি-হীনতার ধন্বন্তরি। **বাধকারি বটিকা** বাধক রোগের মহৌষধ।

স্থানাভাবে অন্যান্য ঔষধের তালিকা দেওয়া হইল না। বিস্তারিত ব্যাটলগে দ্রষ্টব্য। ৵০ এক আনার টিকিটসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুব্যবস্থা দেওয়া হয়।

ম্যালেরিয়া।



বটকৃষ্ণ পালের

এডওয়ার্ডস

টনিক

বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেরই মুক্তকণ্ঠে সু-প্রশংসিত ও ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্ত বাটীর অমূল্যনিধি বিশ্ববিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম যাবতীয় চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

বিনা অস্ত্রে ছানি আরোগ্য

N পদ্মমধু D

কে না জানে চক্ষু না থাকিলে অন্যের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়? অতএব চক্ষুপীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্য **পদ্মমধু** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিধ চক্ষুপীড়ায় বিশুদ্ধ **পদ্মমধু** তুল্য মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। একবার ব্যবহার করিলেই তসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইবেন। সাবধান! ক্রয় কালে এন্ দত্ত ব্রাদার্স নাম দেখিয়া লইবেন। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ এক টাকা, ৩ ড্রাম ২৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা। **এন্ দত্ত ব্রাদার্স**

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট।

আহিরীটোলা কলিকাতা।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS

39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শবর্ষ] ১৩৩৮ অগ্রহায়ণ, [৮ম সংখ্যা]

১।	শ্রীমদ্ বালানন্দ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২১৭
২।	হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	...	২৩০
৩।	কয়েকখানি পত্র—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	...	২৩৪
৪।	আওতা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	২৪৩
৫।	অধিকার—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ	...	২৪৫
৬।	সমালোচনা	...	২৪৮

ত্রুটি।—জন্মভূমির বর্ত্তমান অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম ফর্ম্মার পর ২২৫ পৃষ্ঠাস্থলে ভ্রমক্রমে ২৩৩ পৃষ্ঠাছাপা হইয়াছে। ২। হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা ভ্রমণবৃত্তান্তের লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু মহাশয়ের স্থলে শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ, ছাপা হইয়াছে। গ্রাহকমহোদয়গণ উভয় ত্রুটি কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

4-32

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

কাদিনে জ্বরছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৩৭ নং অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

Telegra. GERMLINEG. Telephone No 1388 B, B.

স্থাপিত—১৮৩৩

বিশ্বাস কোং

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারিং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি, সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

বিশ্বাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং বাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত

অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিস্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২॥০ অড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৬৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

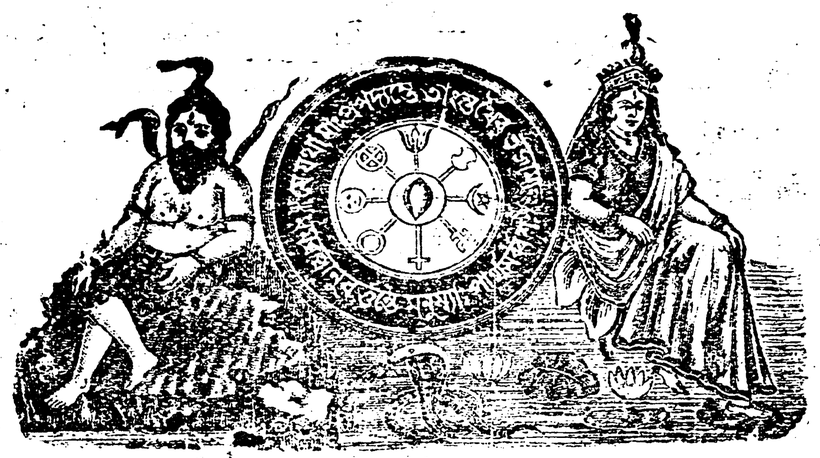

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ } ১৩৩৮ সাল, অগ্রহায়ণ { ৮ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগুরুদেবের শিষ্যগণের প্রতি কিরূপ কৃপা তাহা রামচরণ বসু ও স্বামী মউজ গিরির জীবনীর যৎকিঞ্চিৎ যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতেই অনেকটা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই কৃপা সম্বন্ধে আর একটী জীবনীরও কিয়দংশ পাঠকবর্গকে শুনাইব। ইনি হইতেছেন লেখকের খুল্লতাত ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহারাজ অনেক সময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাম ও কৃষ্ণ তাঁহার ডান ও বামহাত স্বরূপ ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিবেন যে, এই দুই ভক্তকে তিনি অতীব প্রীতির সহিত স্নেহ করিতেন। এই কৃষ্ণ বাবুর বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত দুইটী পুত্রের মধ্যে একটী ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুদেবের সেবা করে। এই দুইটী বালকও বাল্যকালে কে এ ব্রহ্মচারী হইবে বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিত। কৃষ্ণব

Teleza GERMLINED, Telephone No 1308 B, B.

স্থাপিত—১৮৩৩

ঘড়িওয়ালা

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারিং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি, সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত

অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিস্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২৷৷০ অড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৬৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

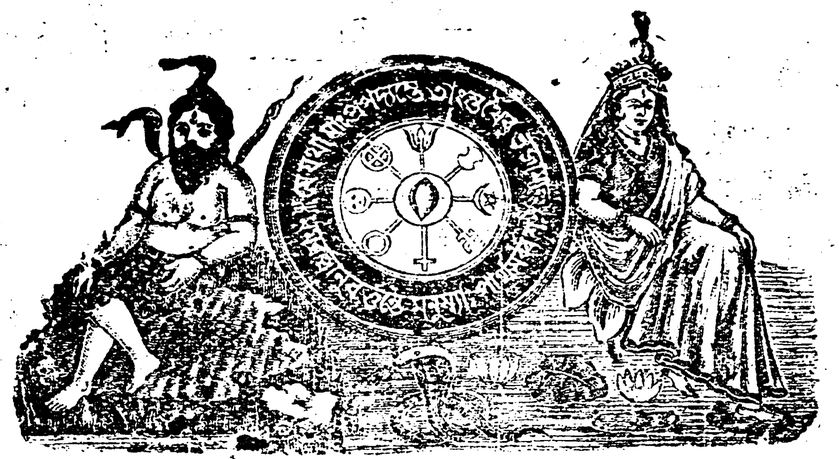

ভারতভূমি

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ } ১৩৩৮ সাল, অগ্রহায়ণ { ৮ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগুরুদেবের শিষ্যগণের প্রতি কিরূপ কৃপা তাহা রামচরণ বসু ও স্বামী মউজ গিরির জীবনীর যৎকিঞ্চিৎ যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতেই অনেকটা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই কৃপা সম্বন্ধে আর একটী জীবনীরও কিয়দংশ পাঠকবর্গকে শুনাইব। ইনি হইতেছেন লেখকের খুল্লতাত ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহারাজ অনেক সময় প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাম ও কৃষ্ণ তাঁহার ডান ও বামহাত স্বরূপ ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিবেন যে, এই দুই ভক্তকে তিনি অতীব প্রীতির সহিত স্নেহ করিতেন। এই কৃষ্ণ মহারাজের বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত দুইটী পুত্রের মধ্যে একটী ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুদেবের সেবা করে। এই দুইটী বালকও বাল্যকালে কে এ ব্রহ্মচারী হইবে বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিত। কৃষ্ণব

Teleza. GERMLINED, Telephone No 1308 B, B.

শঙ্কর সম্মুখে দর্শন দিলেন। প্রথম দিনেই এই যে, এক চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহারই পূর্ণানুভব হইয়াছিল পরে মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের পঞ্চমুণ্ডী মন্দিরে। এ সময়ে উক্ত কৃষ্ণবাবু নাড়াজোল ষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। বরাহনগরে অবস্থান কালে নাড়াজোলের রাজা ৺নরেন্দ্রলাল খাঁ সস্ত্রীক দীক্ষা লইয়াছিলেন। ইহাঁদের উভয়ের কাতর প্রার্থনায় গুরুদেব কিছুদিন যাইয়া কর্ণগড়ে অবস্থান করিয়াছিলেন। এ সুযোগেই এ লেখক সস্ত্রীক শ্রীগুরুদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

উক্ত কৃষ্ণবাবুর সকরুণ আহ্বানে শ্রীগুরুদেব একবার তাঁহার শিব-নিবাসের বাড়ীতে আসন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মধ্যম পুত্রের বিবাহ হইলে, নূতন পুত্রবধূকে কলিকাতার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলেন। বরাহনগরে অবস্থানকালে উক্ত কৃষ্ণবাবুর দুই পুত্র, এক দৌহিত্র ও এক ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়নও গুরুদেব কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

এক্ষণে এই কৃষ্ণবাবুর ৺কাশী-প্রাপ্তির সংবাদ নিবেদন করিতেছি। নাড়াজোল ষ্টেটের ম্যানেজার থাকার অবস্থায় তাঁহার বহুমূত্র রোগ দেখা দিয়াছিল। পরে এ চাকরী হইতে অবসর লইয়া কিছুদিন বৈদ্যনাথে গুরুদেবের সমীপে বাস করেন। পরে কলিকাতায় যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এ সময়ে লেখকও চাকরী উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন। এজন্য খুল্লতাত মহাশয় যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। সাংসারিক সমুদয় কার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি হঠাৎ ৺কাশী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ইহা আর অধিক দিন থাকিবে না। ইহার পর ৺কাশী গমন করিলেন। এখানে পণ্ডিত ৺ শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়কে পাইয়া বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। ইনি খুল্লতাত মহাশয়কে দাদা বলিতেন ও উভয়ের মধ্যে অতিশয় প্রণয় ছিল। ইনি কয়েকবার শিবনিবাসে ও মেদিনীপুরে যাইয়াও অবস্থান করিয়াছিলেন। ৺কাশীতে অবস্থান কালে দুজনে নানারূপ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে দিন অতিবাহিত করিতেন। মাননীয় জষ্টিশ উডরোফ সাহেব ৺হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায্যে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের তন্ত্রতত্ত্ব প্রভৃতি পুস্তক সম্বন্ধে যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন খুল্লতাত মহাশয়ও বহু-বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে বঙ্গবাসী ও বসুমতীতে ধর্ম্মপ্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। খুড়ী মাতাঠাকুরাণী কখন ৺কাশীতে ও কখন আমাদিগের নিকট কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতেন যে, শেষ

সময়ে তাঁহাকে নিকটে থাকিতে দিবেন না। কারণ এ সময়ে সম্মুখে বসিয়া কাঁদাকাটা বড় অনুকূল হইবে না। বাস্তবিক তাহাই করিলেন। কাশীবাসের ৭।৮ মাস পরে ১৯১২ খৃঃ অঃ মাঘ (ইং ফেব্রুয়ারী) মাস আসিল। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বেই কোন একটা বিশেষ কার্য্যের ছলনায় খুড়ীমাতাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। মাঘ মাসের পূর্ণিমার পূর্ব্বে ত্রয়োদশীর দিনও বৈকাল পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর জন্য প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবার জন্য বন্ধ করিয়া রাখেন। সন্ধ্যার পর আহ্নিক করিয়া রাত্রের জলযোগ করিলেন ও ইহার পর কাশীখণ্ড ও উপনিষদ পাঠ করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে প্রায় রাত্রি ১০ টা বাজিল। ইহার পর হঠাৎ শরীরটা ভাল নাই বলিয়া খানিকটা জলের মত বমন ও পাতলা মলত্যাগ করিয়া শয্যায় আসিয়া শুইলেন। নিকটে এ সময়ে একটী বিধবা কন্যা ও ছোট একটি দৌহিত্র ছিল। ইহার পর আর কথা কহিলেন না। ইহা জানিয়াই বিদ্যার্ণব মহাশয় দেখিতে আসিলেন ও অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন ও কলিকাতায় অতিশয় পীড়িত বলিয়া এক তার প্রেরণ করিলেন। ত্রয়োদশী রাত্রি ও পরদিন চতুর্দ্দশী একভাবেই কাটিল। প্রথমে এক পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে চিতভাবে শয়ন করিলেন। মুখে হা হুতাশ বা কোনরূপ যন্ত্রণার প্রকাশ ছিল না। বিদ্যার্ণব মহাশয় ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন ও খুল্লতাত মহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন ধ্যানস্থ রহিলেন। চতুর্দ্দশীর রাত্রি অবসান হইয়া যেমন পূর্ব্বাকাশে পূর্ণিমার সূর্য্য উদয়ের জন্য অরুণালোক দেখা দিল, অমনি এই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ কাশীধামে গঙ্গাগর্ভস্থ ভবনে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন। তার পাইয়া খুড়ীমাতা ও মধ্যমপুত্র বেলা ১০ টার সময় যাইয়া পৌঁছিবার পর, কেবল তাঁহার দেহ যেন যোগনিদ্রায় শয়ান আছে ইহাই দেখিলেন। বিদ্যার্ণব মহাশয় ও অন্যান্য আত্মীয় ও পণ্ডিতগণ উদ্যোগী হইয়া মণিকর্ণিকা ঘাটে অন্ত্যেষ্টি করার আয়োজন করিলেন।

এ সংবাদ গুরুদেব পাইয়াই কাশী গমন করিলেন ও নিজে উপস্থিত থাকিয়া আমাদিগের দ্বারা শ্রাদ্ধাদিকর্ম্ম সুসম্পন্ন করাইলেন ও নিজে বহুতশত মুদ্রা ব্যয় করিয়া ধ্রুবেশ্বর মঠে বহু দণ্ডী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ও সাধুদিগকে এক ভাণ্ডারা দিলেন।

Veleza GERMLINED, Telephone No 1300 B, B.

উপসংহার।

যাঁহার অন্তঃপ্রেরণায় এই জীবনী লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ তাঁহারই প্রেরণায় ইহা বন্ধ করিলাম। এ জীবনীর শেষ অভিনয় এখনও সমাপ্তির সময় আইসে নাই। কারণ এ সাধু মহাত্মার লীলা এখনও প্রকট রহিয়াছে! লেখকের জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দেহ কতদিন বর্ত্তমান থাকিবে স্থির নাই, সুতরাং ইহার শেষ অঙ্ক কাহার দ্বারা লিখিত হইবে তাহা সেই পরমাত্মাদেবই বিদিত আছেন।

এ লেখক অকৃতী ও অজ্ঞানী হইয়াও সাধ্যমত এ জীবনী পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে তাঁহার এ প্রয়াস তিনি আরম্ভ বলিয়াই বিবেচনা করেন। তাঁহার হৃদয়ে এই আশা আছে যে, ভবিষ্যতে কোন সুদৃঢ় ভক্ত ও সুলেখক ইহা অবশ্যই পাঠক সমাজে বিস্তৃত করিবেন।

শিষ্য হইয়া গুরুচরিত্র বর্ণনা করা অসম্ভব ও দুঃসাহসের কার্য্য। কারণ ইহা হইতেছে শ্রীভগবানের সহিত জীবের সংশ্লিষ্ট হইবার প্রয়াস। তবে যদি করুণাময়ের কৃপায় জীবত্বের কালিমা মুক্ত হইয়া অজ্ঞ শিষ্য শ্রীগুরুদেবের আনন্দময় মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ ছায়া দর্শন করিতে পায় তবে তাহার বর্ণনায় হয়ত কিছু সজীবতা আসিতে পারে। এ অধম লেখক সে কৃপা পাইয়াছেন বলিয়া কখনই সাহস করেন না। সুতরাং এ জীবনীর সকল ত্রুটীই তাঁহার অজ্ঞতা ও দুঃসাহসের ফল, ইহা পাঠকগণ বুঝিয়া মার্জ্জনা করিবেন। তবে নিজ সহৃদয়তা বশতঃ যদি কেহ ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের নিকট লেখক আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন; আর করিতেছেন "জন্মভূমির" সম্পাদকের প্রতি, যিনি এ কার্য্যে লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন। সাধুচরিত্র পাঠ ও আলোচনা করিলে পাপরাশি বিধৌত হয়, ইহা ভাবিয়াই এই আলোচনা করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবত শুনাইয়াছেন :—

"তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘং॥

ভাঃ ১১ স্ক ২৬ অঃ ১৯ শ্লো।

যাঁহারা আদর পূর্ব্বক সেই সকল কথা শ্রবণ করেন, গান করেন তাঁহারা মৎপর ও আমাতে শ্রদ্ধাবান হইয়া মদীয় ভক্তি প্রাপ্ত হন।

সাধু-চরিত্র আলোচনা করিলেও সাধুসঙ্গ হয়। এ সাধুসঙ্গের ফল মহৎ। তুলসীদাস কহিয়াছেন—

"এক ঘড়ি আধিঘড়ি আধিসে পুনি আধ,
তুলসী সঙ্গত সাধু হরে কোটী অপরাধ॥"

পূর্ব্বের উক্তিতেই পাঠকগণকে আরও একটু নিবেদন করিবার আছে। এ কলিকালে "কলৌ সর্ব্বে বেদান্তিনঃ", এজন্য যাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতা স্বীকার করেন তাঁহারা জানিয়া রাখিবেন যে, অহং বুদ্ধি জড়িত জীব কোন অবস্থায় "বহূণাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে" হইবার সুকৃতিলাভ করিয়া, যদি কখনও "সোহহং" ভাবের অনুভব হয় হউক কিন্তু ব্যবহার জগতে দেহধারী হইয়া তিনি "অহং" (অস্মদ্) ও "ত্বং" (যুষ্মদ্) শব্দ ব্যবহার করিয়া যতদিন বিচরণ করিবেন, তখন অদ্বৈতচূড়ামণি আচার্য্য শঙ্করের এই উপদেশটী কখনই বিস্মৃত হইবেন না।

"অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণাসহ"

অর্থাৎ ত্রিলোককে অদ্বৈত জ্ঞান করিলেও গুরুদেবের সহিত কখনই অদ্বৈত চিন্তা করিবেন না।

এই সাধু মহাত্মাগণই তীর্থক্ষেত্রের সম্পদ। তাঁহারাই তীর্থস্থল পবিত্র করেন। তাঁহারাই শ্রীভগবানের প্রকট মূর্ত্তি। অনেকস্থলে তাঁহারা তীর্থস্থলে অবস্থান বা তীর্থভ্রমণ ছলে অজ্ঞদিগকে উপদেশ দিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন :—

"তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত।

"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থাভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বন্তঃ স্থেন গঙ্গাভৃতা"

ভাঃ ১। ১০। ১০

এ মহাত্মাগণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সে বংশ ও কুল পবিত্র হয়

Teleza GERMLINEG, Telephone No 1388 B, B.

(১) "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চ তেন"

(২) তৎ কুলং পাবনং দেবী
ধন্যা তজ্জননী স্মৃতা
তৎপিতা চ কৃতার্থঃ স্যাৎ
মুক্তাস্তৎপিতর প্রিয়ে ॥

(৩) আসপ্তমাৎ পুরুষযুগান্ পুণাতি"

অথর্ব্বশির উপনিষৎ

সে ব্যক্তি আপন পিতৃমাতৃপক্ষীয় উভয়কুলের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া থাকেন।

(৪) ত্রি সপ্তভিঃ পিতা পূতা
পিতৃভিঃ সহ তেহনঘ
সা ইস্য কুলে জাতা
ভব মে বৈ কুলপাবনঃ"

এই জীবনীতে যে কয়েকটী বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছি, তাহার একটী হইতেছে ৯ম বৎসর বয়সে মাতৃদেবীকে গৃহে ত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ। ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার। এরূপ অল্প বয়সে জননীর স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, গৃহসুখ পরিত্যাগ অতি অল্পলোকেই করিতে পারে। মহারাজ হাসিতে হাসিতে শুনাইয়াছেন যে, লেখাপড়া শিখাইবার উত্তজেনা তাঁহাকে এরূপ ব্যতি-ব্যস্ত করিয়াছিল যে উহা হইতে অব্যাহতি লাভ করাই তাঁহার গৃহ পরিত্যাগের কারণ হইয়াছিল। লেখা পড়া না শিখিও যে সাধু হওয়া যায় কে যেন মার নিকট হইতে কে যেন ইঙ্গিতে সজাগ করিয়া দিয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ সাধু হইলেই তাঁহার সকলই প্রাপ্তি হইবে ইহা যেন কে বলিয়া দিতে লাগিল। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞ সাধুই সকলের গুরুরূপে বর ণীয়। শ্রুতি যদিচ শুনাইয়াছেন

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুসেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং"

অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য সামান্যমাত্র হোমকাষ্ঠ লইয়া শ্রোত্রিয়

অর্থাৎ বিদ্বান ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে। বাস্তবিক এক শরীরে বিদ্যা ও জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষপ্রাপ্তি হইলে একসঙ্গে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ শিক্ষা পাইবার বেশ সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ না হইয়াও কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষপ্রাপ্তি হইলে শিষ্যের ফলপ্রাপ্তির অভাব হয় না। কারণ শ্রুতিই শুনাইয়াছেন যে "পরম ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন। ইহাতে কি হয়?

"যল্লাভান্ন পরো লাভো যৎ সুখান্ন পরং সুখং।
যজ্ জ্ঞানান্ন পরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ (আত্মবোধ)"
"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" (গীতা)

অর্থাৎ যাহা লাভ হইলে অন্য কোন দ্রব্য লাভ বাঞ্ছনীয় হয় না, যে সুখ উপলব্ধ হইলে অন্য সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অন্য জ্ঞান তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে।

শ্রুতিও এইরূপ প্রশ্ন উঠাইয়া মীমাংসা জানাইয়া দিয়াছেন—যথা "কস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" অর্থাৎ কি জানিলে সমস্তই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়? ইহার উত্তরে শুনাইলেন যে বিদ্যা দুইটী আছে—অপরা ও পরা। ইহার মধ্যে চারিবেদ ও বেদাঙ্গাদির জ্ঞান হইতেছে অপরা। আর যাহা দ্বারা ব্রহ্ম অবগত হওয়া যায় তাহাই পরা অর্থাৎ চিরস্থায়ী।

সাধু মহাত্মাগণ যখন নরদেহ ধারণ করেন, তখন লীলাবশে শ্রীভগবানরূপে বা জন্মার্জ্জিত যোগভ্রষ্টরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। দুষ্কৃতদিগকে দমন, ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও অজ্ঞানীদিগকে জ্ঞানপথে আরোহণ করাইবার জন্য উভয় শরীরেই তাঁহারা পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। গীতাতে শ্রীভগবান এই উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্ম... সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ..পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়", অথবা যোগভ্রষ্টরূপে "শ্রীমতাং গেহে" বা "কুলে ভবতি যোগীনাং"। এই উভয় অবস্থায় তাঁহারা বর্ণ, আশ্রম, শাস্ত্রবিধি আচরণ পূর্ব্বক লোকশিক্ষা দিয়া থাকেন।

"এইমত ভক্ত-ভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার॥" চৈতন্যচরিতামৃত।
"আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥" (ঐ)

এজন্য শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গুরুগৃহে অবস্থানকালে অন্যান্য শিষ্যগণের

Geeta GERMLINED, Telephone No 1388 B, B.

সহিত মস্তকে করিয়া কাষ্ঠাহরণাদি করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রহ্মজ্ঞ হইলে বেদাদি শাস্ত্রেবিদ্বান্ না হইয়াও শাস্ত্রজ্ঞান যে করতলগত আমলকীবৎ হইয়া থাকে, তাহা আধুনিক কালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশাবলী পাঠ করিলেই সকলে বিদিত হইবেন। এ স্থানে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে থাকিতে যাঁহারা মাতা-পিতা, দারাসুত ও বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া এরূপ ভাবে সাধুজীবন গ্রহণ করেন, তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিয়া কেন প্রত্যবায়গ্রস্ত না হইবেন? এ কথার উত্তর আমাদের মত অজ্ঞানীর দেওয়া অসম্ভব। বুদ্ধদেব রাজপুত্র হইয়া কিরূপ যুবাবস্থায় রাজৈশ্বর্য্য, পিতা-মাতা, যুবতী স্ত্রী ও শিশু পুত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধানে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিরূপে শঙ্করাচার্য্য ৮ম বর্ষ বয়সে একমাত্র মাতৃদেবীকে গৃহে রাখিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিরূপে চৈতন্য মহাপ্রভু যুবাবস্থায় মাতা ও যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের মত মমতাবদ্ধ গৃহস্থগণের উপলব্ধি করা সাধ্যাতীত। আমরা সর্ব্বদাই গৃহাশ্রমের আহার বিহার ও ব্যবহারের তৃষ্ণা ও পিপাসায়, দৈহিক ও মানসিক সুখের লিপ্সায় এরূপ ব্যাপৃত আছি যে, ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ সুখ যে আছে তাহা মনে উদয় হয় না। সুতরাং সংসার বৈরাগ্যের কি বুঝিয়া হয়ত সময়ে সময়ে মর্কট বৈরাগ্য দেখাইতে পারি, কিন্তু গৃহসুখ হইতে কিয়দ্দিন অন্তরিত হইলেই, পুনরায় কি প্রকারে উক্তসুখ লাভ হইবে তজ্জন্য ব্যাকুল হই।

"ক্ষুদ্র জীবসব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

বাল্যকালে কিরূপে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয় একবার চিন্তা করা যাউক। শ্রুতিতে আছে "গৃহাদ্বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ তদিবেতরথো ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থও শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে (ইহা সচরাচর বর্ণাশ্রমের সাধারণবিধি) অথবা সম্ভব হইলে ব্রহ্মচর্য্য হইতে, গার্হস্থ্য হইতে কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই সন্ন্যাস লওয়া যাইতে পারে তীব্র সংসার বৈরাগ্য উদয়ের কারণ হইতেছে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার। গীতা শুনাইলেন—

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং";
"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ"

অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট সাধু সদাচারসম্পন্ন ধনী বা কোন যোগীদিগের কুলে জন্মলাভ করে ও পূর্ব্বদেহজাত সংস্কার পুনরায় তাহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক বুদ্ধিতে সংযোগ করে ও পূর্ব্বকৃত অভ্যাস যেন অবশভাবে তাহাকে ঐ পথে সঞ্চালিত করে। অতএব ইহা হইতেই বুঝিবেন কেন বাল্যবয়সেও বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

সাধনার ভিত্তি হইতেছে—শ্রদ্ধাভক্তি ও বৈরাগ্য। সংসারিক বিষয়ে বৈরাগ্য আপনা হইতেই উদয় হইলেই, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সাধুদিগকে প্রধাবিত করে ত্যাগের দিকে। যেমন এই ত্যাগের দিকে আকর্ষণ আইসে, অমনি শ্রীভগবান গুরুরূপে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া নিজ কোলে স্থান প্রদান পূর্ব্বক গন্তব্য পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

এই গুরুরূপী ভগবান্ সর্ব্বদাই জীবের মঙ্গল জন্য উদ্যোগী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। গীতায় স্পষ্টাক্ষরে শ্রীভগবান শুনাইয়াছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥"

শ্রীভগবান সর্ব্বতোভাবে এরূপ ভক্তগণের যোগক্ষেম বহন করেন ও সতত তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

শ্রীভগবানকে অতিদূরে অবস্থিত বোধ করিলেও তিনি অতি নিকটে। শ্রুতি বলিতেছেন,

"তদ্ দূরে তদ্বান্তিকে"
"তদন্তরেহি সর্ব্বস্য তদ্ সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"
"আছেন লুকাইয়া হৃদ্ মাঝারে
দূরে বলে ভাবিস্ না ভাই!
ডাকের মত ডাক্‌লে পরে
সে এক ডাকেতে সাড়া দেয়।"

এ গুরুমূর্ত্তি নিজে আকর্ষণ করিয়া দর্শন অবশ্যই দিবেন। শিষ্য এই আরাধ্যমূর্ত্তি পাইয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবে। তখন তাহাকে করিতে হইবে "প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এবং "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন" এবং "কর্ম্মণা মনসা বাচা" সর্ব্বদা গুরুদেবের আরাধনা। যাঁহারা এই রূপ করিবেন তাঁহারাই আত্মোন্নতিতে অগ্রসর হইবেন।

উক্ত কর্ম্মগুলিই হইল সাধনার কর্ম্ম। সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের স্বরূপ

Telegs. GERMLINED, Telephone No 1300 B. B.

হইলেও তাঁহারই নিজকৃত তম ও রজঃ রূপ মেঘদ্বারা তাঁহার বিশুদ্ধ সত্বরূপ প্রভা মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় যেন আবৃত আছে বোধ করাইয়া দেয়। তবে দেহবিশেষে ইহার উৎকর্ষতাপকর্ষতা থাকে। সর্ব্বস্থানেই ইহা দেহ ও অন্তরের মলমাত্র। ইহারাই কামক্রোধাদি ষড়োর্ম্মি। ইহারাই বিক্ষেপ ও তমোরূপ মল মাত্র। জন্মার্জ্জিত পুণ্যপরায়ণ সাধুদিগের ইহা অল্পমাত্রই থাকে। দেহধারী হইয়া সর্ব্বদা এ মলরাশি মার্জ্জনা আবশ্যক। এই জন্য সাধু হইয়াও শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তির সাধন অতি প্রয়োজন এবং এজন্যই সাধুর বিচরণশীলতা প্রয়োজন। এই পর্য্যটন উক্ত প্রকার সাধনগুলিকে অনায়াসসাধ্য করিয়া থাকে। সাধুকে সর্ব্বদাই

"চুরি নারী কুট বাচা
তিনছে সাধু রওগে সাচা ॥"

এ অবস্থায় আত্মোন্নতি ন্যস্ত রাখিতে হইবে প্রবল পুরুষকারের উপরে ও ব্যবহারিক ব্যাপার ন্যস্ত রাখিতে হইবে প্রারব্ধের উপরে। এইরূপ করিতে করিতে সাধুগণ "সাধক" শ্রেণী হইতে ক্রমে "সিদ্ধ" কোটীতে প্রবিষ্ট হন। যখন এই শেষোক্ত কোটীতে আগমন করেন তখন তাঁহারা "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" হইয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" জ্ঞান লাভ করেন ও তাঁহারা "স্বদেশো ভুবনত্রয়ং" "বসুধৈব কুটুম্বকং" "স্বর্ব্বভূতহিতে রতঃ" "সুহৃদঃ সর্ব্বভূতানাং" হইয়া "সর্ব্বার্থেপরমার্থদৃষ্টি সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা" হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ব্রতী থাকেন। এ সময়ে "সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ" হইয়া "কুর্য্যাদ্, বিদ্বাংস্তথাসক্তঃ চিকির্ষুর্লোকসংগ্রহং" জন্য অর্থাৎ লোকশিক্ষার জন্য অজ্ঞানীদিগকে কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য ব্যবহারিক কর্ম্ম করিয়া থাকেন। মহারাজ এজন্য আমাদিগকে প্রায়ই শুনাইয়া থাকেন

"জিস্‌কা দান্ উস্‌কা পুণ
যোগী-অবধূতকা নেহি পাপ পুণ"

অর্থাৎ যে দান করে তাহারই পুণ্য হয়। যোগী ও অবধূতের পাপ ও পুণ্য নাই। এজন্য আরও শুনাইয়া থাকেন যে গৃহস্থগণের অর্থ অতি প্রিয় ও বহুক্লেশে অর্জ্জিত হয়। এই অর্থের জন্য নানা ক্লেশ সহ্য করে এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নিজ দেহকেও অপরের নিকট দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। এই রূপ প্রিয় পদার্থ তাহারা আমাকে আনন্দ সহকারে প্রদান করে। আমার ইহাতে কি

প্রয়োজন বল। দশ বিশ সের খাইবার বা বহুমূল্য বস্ত্রাদি পরিধানের সামর্থ্যও নাই ও প্রয়োজনও নাই। হাতী ঘোড়ায় চড়িবারও ইচ্ছা নাই। সুতরাং গৃহস্থগণের পুণ্যার্থেই এ টাকার সদ্ব্যয় করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থদিগের পুণ্যকর্ম্ম হইতেছে দেবসেবা, গোসেবা, সাধুসেবা, অতিথিসেবা, বিদ্যাদান অন্নবস্ত্রদান ও ঔষধদান। ইহারই যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। উর্ব্বরক্ষেত্র দেখিয়া যদি বীজ বপন করা যায় তবে উত্তম ফসল অবশ্যই হইবে এবং ইহার ফল অপরে ভোগ করিলে নিশ্চয়ই অর্থদাতাগণ পুণ্য অর্জ্জন করিবেন।

মা জগদম্বে! তোমার লীলা কে বুঝিবে বল।

"বিষ্ণুশরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতো হতস্তাং কঃ স্তোতুংশক্তিমান্ ভবেৎ ॥"
(চণ্ডী)

ব্রহ্মা বিষ্ণু ও ঈশানকেও যখন তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছে, তখন তোমাকে কে স্তব করিতে পারে? কারণ "মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা" এবং তুমিই "সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী"। মা নর্ম্মদেশ্বরী! এজন্যই কি রত্নরূপী পুত্রকে গর্ভ হইতে উন্মুক্ত করিয়া, তাহার বিচরণশীলতার ক্লেশ অনুভব করিতেছিলে! এজন্যই কি সে সুদূর উজ্জয়িনী সহর হইতে একাকিনী আসিয়া পুত্রকে তপোবনে বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গেলে? এজন্যই কি তোমার অন্য মূর্ত্তি—কারণ "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" ৺রামবাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীকে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে "এ পুত্র বড় দুরন্ত" "পশ্যৈতা দুষ্ট" (চণ্ডী) সে "আমাকে বড় কাঁদাইয়াছে, "ইহাকে বন্ধন করিতে হইবে।" এজন্যকি মা কাত্যায়নী! তুমি অগ্রণী হইয়া কেরাণীবাদের যজ্ঞক্ষেত্র উন্মুক্ত করিলে? রামবাবু রূপী ভগীরথ গঙ্গাধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। আর তোমরা মাতৃদ্বয় ইহার কূলে সুসজ্জিত ও সুদৃঢ় স্নানঘাটের পত্তন করিয়া মহাত্মার পীযূষধারা পানের সুবিধা করিয়াদলে। আইস ভক্তবৃন্দ! আমরা বুড়ীমাকে প্রণাম করি ও অপর দুইজনকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

এই উপসংহারে যে কয়েকটী বিষয় আলোচিত হইল, এ মহাত্মার জীবনীতে সেই কয়েকটী প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমে মঙ্গলাচরণ ও অজ্ঞ লেখকের প্রতি তাঁহার কৃপা বিতরণ জানাইয়া, তীর্থস্থান, বৈদ্যনাথধামের প্রতিষ্ঠা ও গুরুতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর বাল্যজীবনের নির্ভীকতা ও

Teleza GERMLINEO. Telephone No 1388 B, B.

সংসারে ঔদাসীন্য ও পরে গৃহত্যাগ ও সদ্‌গুরুকৃপালাভ বর্ণিত আছে। এজন্য মাতৃদেবীর বিবরণ, পরম গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ ও গৌরীশঙ্কর মহারাজের বিবরণ সাধনা ও যোগাভ্যাস ও বহুদেশ ও দিন ব্যাপী ভ্রমণ আলোচিত হইয়াছে। এ বিচরণ সময়ের নানারূপ বিপত্তি, পরমাত্মার সতত দৃষ্টি ও কোন কোন আলৌকিক ব্যাপার বর্ণিত আছে। "এখনও বহুকর্ম্ম কর্ত্তব্য আছে" বলিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ, কেরাণীবাদের ভবিষ্যৎ চিত্র মানসজগতে পরিদর্শন, রামবাবুর সহিত মিলন ও তপোবন ও কেরাণীবাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠা বর্ণিত আছে। এ জীবনীর সহিত সংশ্লিষ্ট কয়েকটী জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমেই বলিয়াছি যে ইহা ধারাবাহিক জীবন চরিত নহে ও তাহা জানিবারও কিছুমাত্র নাই। উপদেশাবলীতে অন্যান্য বিষয় পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস আছে।

শেষ প্রার্থনা—ঠাকুর! সর্ব্বদাই বলে থাক যে পাগলদের সহিত পাগ্‌লা সাজিয়াছ। তবে এ পাগ্‌লা তো ছাড়্‌বে না—"অনায়াসেন মৃত্যুও বিনাদৈন্যেন জীবনং—তৎদেহি কৃপাসিন্ধো মে ভক্তিরে বহি অচলা।

সেবক-শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,।

শুক্রবার ২২ এ আশ্বিন ১৩৩৮ সাল।

টাইম-টেবিলে দেখিলাম হাওড়া হইতে হরিদ্বারের দূরত্ব ৯১২ মাইল; ই-আই রেলে হাওড়া হইতে মোগলসরাই ৪১৮ মাইল, তথা হইতে ও-আর রেলে হরিদ্বার ৫০৪ মাইল। সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা-জনক ট্রেণ দেরাদুন একস্‌প্রেসে; রাত্রি ১০ টায় ছাড়িবে, পরশ্ব প্রাতে ৭ ঘটিকায় হরিদ্বার পৌঁছিবে, মধ্যে কোথাও চেঞ্জ নাই। ভাড়া মধ্যমশ্রেণী ২০॥৵০; তৃতীয়-শ্রেণীতে ঠিক ইহার অর্দ্ধেক।

* * *

হরিদ্বারে যান নাই এমন লোকের সংখ্যা অনেক, কিন্তু এই তীর্থস্থানের

নাম শুনেন নাই এরূপ লোকের সংখ্যা খুব বেশী হইবে বলিয়া বোধ হয় না। স্থানটী যুক্তপ্রদেশের সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী ইতিহাসবিশ্রুত শহর ও হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র।

স্থানটি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে,—হরিদ্বার, হরদ্বার, গঙ্গাদ্বার, কপিল, মায়া। 'হরিদ্বার' ও 'হরদ্বার' নাম লইয়া শৈবওবৈষ্ণবের যে মনোমালিন্য, তাহার আজিও অবসান হয় নাই। বৈষ্ণবগণ বলেন, গঙ্গা ভগবান্ বিষ্ণুর চরণাব্জ হইতে উদ্ভূত হইয়া এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন এই জন্য ইহার নাম হরিদ্বার, আর শৈবগণ বলেন, গঙ্গা দেবাদিদেব মহাদেবের জটাজুট হইতে অবতীর্ণ হইয়া এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, এই জন্য ইহার নাম হরদ্বার হওয়াই উচিত। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের মত সমর্থনের জন্য পদ্ম'১, স্কন্দ২, বিষ্ণু ৩, ভাগবত৪ প্রভৃতি পুরাণ ও অন্যান্য বৈষ্ণব শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে উক্তি উৎকলন করিয়া থাকেন এবং প্রমাণস্বরূপ প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ বিষ্ণুর চরণচিহ্ন দেখাইয়া থাকেন। 'হরিদ্বার,' 'হরদ্বার নাম লইয়া বৃথা কলরব করার ভাবার্থ কি, তাহা আমি বুঝি না। হরি ও হর ভিন্ন না অভিন্ন?

"যো বিষ্ণুঃ স মহাদেবঃ শিবো নারায়ণঃ স্বয়ম্॥
নানয়োর্বিদ্যতে ভেদঃ কদাচিদপি কুত্রচিৎ।"৫

ব্রহ্মপুরাণ ঠিকই বলিয়াছেন,—

"মাহেশ্বরী বৈষ্ণবী চ মৈব ব্রাহ্মী চ পাবনী।
ভাগীরথী দেবনদী হিমবচ্ছিখরাশ্রয়া॥"৬

হরিদ্বার বা হরদ্বার নামটী আধুনিক'৭। পূর্ব্বে ইহা 'কপিল' নামে অভিহিত হইত। অনেকে কল্পনা করেন, মহর্ষি কপিলের তপোবন এখানেই ছিল। তৈমূর তাঁহার আত্মকাহিনীতে এই স্থানটীকে 'কুটিল' বা 'কুপিল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আলবারুণী, রসিদউদ্দিন প্রমুখ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্থানটীকে 'গঙ্গাদ্বার' নামে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। Fuhrer এর অনুমান,

---

১। উত্তরখণ্ড, ২২ অধ্যায়, ১৯ শ্লোক।

২। রেবাখণ্ড, ১৯৪ অঃ, ৭২ শ্লোক; নাগরখণ্ড, ২৪ অঃ, ১২ শ্লোক; ইত্যাদি

৩। ৫ স্কন্ধ, ১৭ অঃ, ১ শ্লোক; ৯ স্কন্ধ, ৯ অঃ, ৯ ও ১৪ শ্লোক।

৪। দ্বিতীয়াংশ, ৮ অঃ, ১০৪ শ্লোক

eleza GERMLINEG, Telephone No 1388 B, B.

হয়ত পূর্ব্বকালে গঙ্গাদ্বার নামে এখানে একটী প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল, তাহা হইতেই স্থানটী গঙ্গাদ্বার অভিধা পাইয়াছিল ৮। হুয়েন-সাঙ্-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে গঙ্গাদ্বারের উল্লেখ আছে। কূর্ম্ম৯, মৎস্য১০, লিঙ্গ১১, ব্রহ্মাণ্ড১২ প্রভৃতি পুরাণে ও মহাভারতের বহুস্থলে স্থানটী গঙ্গাদ্বার বলিয়াই আখ্যাত হইয়াছে। আবুল-ফজল তাঁহার "আইন-ই-অকবরী"তে স্থানটীকে 'মায়া' (ওরফে হরিদ্বার, হরদ্বার) নামে উল্লেখ করিয়াছেন১৩। হুয়েন-সাঙ্-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে ১৪ 'মো য়ু-লো' (বা 'ময়ুর') নামক একটী স্থানের উল্লেখ আছে। কানিং-হাম ইহাকেই 'মায়াপুর' বলিতেছেন১৫। হরিদ্বারের দক্ষিণে অনতিদূরে মায়াপুর নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে বটে কিন্তু ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধি নাই। হুয়েন-সাঙ্-বর্ণিত মো-য়ুলো গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী একটী সহর, কিন্তু মায়াপুর গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। সে হিসাবে, মো-য়ু-লো মায়াপুর হইতে পারে কিনা সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহের অবকাশ আছে। Thomas watters বলেন, হুয়েন-সাঙ্ প্রকৃতপ্রস্তাবে ময়ুর নামক স্থল পরিদর্শন করেন নাই, সম্ভবতঃ অপরের নিকট হইতে অনুসন্ধান লইয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন১৬। কানিংহাম বলেন, স্থানীয় লোকেরা মায়াদেবীর প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন দেখাইয়া স্থানটীর নাম মায়াপুর প্রতিপন্ন করেন। হয়ত শহরটীকে 'ময়ুরপুর' ও ও বলা হইত, কেননা তিনি নিজে তত্রত্য বনপ্রদেশে সহস্র সহস্র ময়ূরের

৫। শ্রীমহাভাগবত, ১০ অঃ, ৬২ ৩ শ্লোক।

৬। ৭৮ অঃ, ৭৫ শ্লোক।

৭। Ptolemy ইহাকে Heorta নামে অভিহিত করিয়াছেন [La Geographie L Ptolemee Indee, 1925 p. 51 (tr bouis Renou)]।

রুদ্রযামলতন্ত্রেও হরিদ্বার নামের উল্লেখ আছে।

"শৃণু দেবি মহাভাগে চণ্ডীপাঠং শৃণোত্যপি।
গয়ায়াঞ্চৈব যৎ পুণ্যং কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরাগ্রতঃ॥
প্রয়াগে মুণ্ডনে চৈব হরিদ্বারে হরের্গৃহে।
তুল্যপুণ্যং ভবেদ্দেবি সত্যং দুর্গে শিবে রমে॥"

(উত্তমাবচ্ছেদ পটল)

৮। Monumental Antiauities & inscriptions, 1891, p. 15

ঝাঁক দেখিয়াছেন ও সকাল-সন্ধ্যা তাহাদের রুক্ষ ডাক শুনিয়াছেন১৭। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে১৮ ভারতের সপ্ততীর্থের যে তালিকা দেখি, তাহার মধ্যে 'মায়া', নামের সন্ধান পাই,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥

১৮। এবং স্কন্দপুরাণে—

"কাশী কাঞ্চী চ মায়াখ্যা ত্বযোধ্যা দ্বারাবত্যপি।
মথুরাবন্তিকাচৈতাঃ সপ্ত পুর্য্যোঽত্র মোক্ষদাঃ॥"

(কাশীখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৬ অঃ, ৬৮ শ্লোক)

পরবর্ত্তী শ্লোকে "মায়া চ কামরূপাখ্যা"-বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পদ্মপুরাণ (উত্তরখণ্ড, ১৯৫ অধ্যায়, ৬ শ্লোক) এ রহিয়াছে,—"গঙ্গাদ্বারসমীপে তু কামদাখ্যং পুরং মহৎ।" এবং স্কন্দপুরাণ (কাশীখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭ অধ্যায়, ১২৪ শ্লোক) এ—

"কেচিদ্বুচ্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং ততঃ পরে।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেঽপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ॥"

* * *

পুণ্যসঞ্চয়েচ্ছু মুমুক্ষু নরনারীর নিকট তীর্থরাজ হরিদ্বারদর্শনের প্রলোভন

৯। পূর্ব্বভাগ, ১৫ অঃ, ৪ শ্লোক

১০। ২২ অঃ, ১০ শ্লোক

১১। পূর্ব্বভাগ, ১০০ অঃ, ৭ শ্লোক

১২। ৩১ অঃ, ৯৫ শ্লোক

১৩। Ayeen Akbery, 1783, p. 787 (tr Francis Baldwin)

১৪। Memoires de Hiouen:Thsang, vol. i, 1857. p. 230 (tr. Stanis ilasjuien)

১৫। Archaeological Reports. vol. ii. 1871 p. 231

১৬। On yuan Chwang. vol. i, 1904, p. 329

১৭। Ach, Rep. vol. ii, p. 233

যাহাই হউক, অপরিতৃপ্ত-অন্তর সৌন্দর্য্যোপাসকের নিনিমের-নয়নসমক্ষে তাহার মর্য্যাদা কিছুমাত্র অল্প নহে। রূপপুরোহিতের সেই চিরলিপ্সু দৃষ্টি লইয়া আজ যাত্রা করিতেছি হরিদ্বারে; সেখানে গিয়া চিত্তে যদি বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের ভাবোদয় হয়, যদি পরম নির্ব্বৃতির মধ্যে মন লীন হইয়া যাইতে চায়, যদি প্রত্নতত্ত্বের অক্লান্ত গবেষণায় প্রগাঢ় আগ্রহের উৎপত্তি হয়, যদি ইতিহাসের অতীত তত্ত্বান্বেষণে মন প্রসক্ত হইয়া উঠে, কিংবা যদি লোকোত্তর নিসর্গশ্রীর অরূপ ইন্দ্রজালে জড়াইয়া আত্মা আত্মহারা হইয়া যায়, তবে তাহা সেই তীর্থবরের নিগূঢ় ভূমিমাহাত্ম্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

১৯। মধ্যখণ্ড, ২৪ অঃ, ৬ শ্লোক।

কয়েকখানি পত্র।

সত্যঘটনা অবলম্বনে—

লেখক—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীশচন্দ্রের পত্র।

কল্যাণেষু—

প্রাণের নলিনি! যথা সময়ে তোমার ভক্তিপূর্ণ মধুমাখা পত্র পাইয়াছি। পাছে আমি প্রাণে কষ্ট পাই, তাই তুমি মরমের মর্ম্মব্যথা অতি সন্তর্পণে চাপিয়া কেবলই প্রেম সম্ভাষণ, আদর আপায়নেরই সমাবেশ করিয়াছ। হায় বালা! যদি অন্তর্য্যামী হইতে, যদি এই ভগ্নহৃদয় দেখাইবার হইত তাহা হইলে বুঝিতে তোমার পত্রের প্রতি ছত্রের এক একটী অক্ষর এক একটী বিষাদপূর্ণ কটাক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া ঘৃণার হাসি হাসিতেছে, তাহা হইলে জানিতে তোমার পত্রের প্রতি পত্র আমার নিকট অব্যক্ত ভাষায় তোমার কি দারুণ বেদনাই জানাইতেছে। হায়! কি অশুভক্ষণে তোমার পিতা সাধ্যাতিরিক্ত অর্থদানে প্রতিশ্রুত হইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন, কি অশুভক্ষণে তিনি দেয় টাকা পরিশোধের জন্য সময় লইয়া তোমাকে প্রতিভূস্বরূপে আমাদের গৃহে রাখিয়া যান। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই ঋণ

পরিশোধের পূর্ব্বেই তাঁহার স্বর্গারোহণ হইল। পিতৃদেব অভীসিত অর্থ না পাইয়া বিনা কারণে তোমায় চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি বৎসর অতীত হইতে চলিল। বেশীদিনের কথা নয়, সে সকল ঘটনা বিন্দুমাত্র ভুলি নাই। সবই দিবানিশি হৃদয়ে জাগিয়া আছে। যেমন সপ্তমীর শশী কয়েক দণ্ডের জন্য নির্ম্মল গগন ক্রোড়ে উদিত হইয়া জগতের দুঃখের কারণ হয়, তুমিও তেমনি আমার হৃদয়ের সুদীর্ঘ জীবনে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য উদিত হইয়া অন্ধকার রাশি ঢালিয়া দিয়াছ।

দুদিন পরে গগন উজ্জ্বল করিয়া পূর্ণশশী জগতের আনন্দদায়ক হইবে, কিন্তু আমার পূর্ণশশী—নলিনী কি আর কখনও এ হতভাগ্যের হৃদয়-গগনে উদিত হইবে? আবার অন্ধকারময় হৃদয় তোমার শান্তিময় কিরণে আবার কি আলোকিত হইবে? কে জানে হইবে কিনা? মানব কল্পনা নেত্রে ভবিষ্যের গাঢ় অন্ধকার পূর্ণ নির্ম্মল সত্যের বিভীষিকা মূর্ত্তি দেখিতে পাইলে ধরায় "দুঃখ" শব্দ অজ্ঞাত থাকিত। ভরসা কেবল "চিরদিন সমান না যায়।"

যদি পূর্ব্ব জন্ম বলিয়া কিছু থাকে, আর যদি আমার সেই পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বা পুণ্য সঞ্চয় থাকে, যদি এ অভাগার উপর ঈশ্বরের দয়া থাকে, হয়ত, এমন দিন আসিবে, যেদিন আমার পিতার কঠোর আদেশ পরিবর্ত্তিত হইবে। আবার আমার গৃহলক্ষ্মী হৃদয়-দেবীকে, হৃদয়ে ধরিয়া চিরসুখী হইতে পারিব। মানব আসার আশায় জগতে বাঁচিয়া থাকে, আমিও বাঁচিয়া আছি। অনিলের পত্রে অবগত হইলাম প্রত্যহ তোমার জ্বর হইতেছে। কেন তুমি আমাকে সে কথা লিখ নাই? কেমন থাক আমাকে অতি অবশ্য অবশ্য লিখিবে।

ইতি—

তোমারই—শ্রীশচন্দ্র।

(নলিনির পত্র)

শ্রীচরণেষু—

হৃদয়-দেবতা!

তোমার স্নেহলিপি পাইলাম। আমার দুঃখ কাহিনী লিখি নাই বলিয়া তুমি বিশেষ অনুযোগ করিয়াছ। ইহার কারণ ত কিছু দেখিতে পাই না। যখন লোকে অজ্ঞাতস্থানবাসী কল্পিতনামা দেবতার প্রসাদ আকাঙ্ক্ষায় সুখ আবা-

Telegs. GERMLINEG, Telephone No 1300 B, B.

হনে আরাধনা-করে, তখন আমি কেমন করিয়া আমার হৃদয়বাসী সহাস্য-বদন চিরসদয় দেবতার আবাহনে দুঃখকাহিনীর অবতারণা করিব? আর আমার দুঃখই বা কিসের? তোমার মত গুণমণি যাহার স্বামী, জগতে তাহার মত সুখী কে? কাহার স্ত্রী আমার অপেক্ষা অধিকতর ভাগ্য-বতী? কোন্ পুণ্যবতী আমার ন্যায় শ্বশুরের আদেশে পরিত্যক্ত হইয়াও স্বামীর এত প্রগাঢ় ভালবাসায় আত্মবিস্মৃত? সমাজের চক্ষে আমি তোমা হইতে দূরে আছি; তোমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তও বটে, কিন্তু আমার মন সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহে না। আমি যে কল্পনায় প্রত্যহই তোমাকে হৃদয়াসনে বসাইয়া পূজা করি, প্রত্যহই মনোমধ্যে পূর্ণরূপে তোমার সত্বা অনুভব করি, তবে কেমন করিয়া পরিত্যক্তা মনে করিব? তবে এক দুঃখ এই যে অভাগিনীর জন্য তুমি সুখী হইতে পারিলে না। তোমার চিন্তাশূন্য প্রফুল্ল হৃদয় এ অভাগিনীর চিন্তায় আর কলুষিত করিও না। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, হইয়াছে। তজ্জন্য তোমার আত্মগ্লানি করা কোন মতে উচিত নহে। মনে রাখিও জগতের সকল পুষ্প দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। অধিকাংশ পুষ্প দেব সেবায় বঞ্চিত হইয়া তাহাদের পুষ্প-জীবন শেষ করে। আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। বেলা গিয়াছে, মাকে গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে যাই। তুমি আমার প্রণাম জানিও। ঠাকুর ঠাকুরাণীর চরণে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি। কিছু মনে করিও না, দাসী বলিয়া ক্ষমা করিও।

ইতি—

চরণাশ্রিতা—নলিনী।

পুঃ

আমার জ্বরের জন্য কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। সংসার করিতে হইলে মাঝে মাঝে সকলেরই এরূপ অসুখ হইয়া থাকে। এরূপ সামান্য কারণে গৃহস্থ লোকের কবিরাজ বৈদ্যের চিকিৎসাধীন হওয়া লজ্জার কারণ বলিয়া মনে হয়। ইতি—

তোমার—নলিনী।

(শ্রীশচন্দ্রের পত্র)

নলিনী!

এতদিনে নিজের রূপ বাহির হইয়া পড়িল। আর সরলা, অবলা সতী সাধ্বীকে প্রেম-চাতুরীতে মুগ্ধ করিয়া প্রেমিকের অভিনয়ে "প্রিয়তমে" সম্ভাষণ করিতে ভরসা হয় না! নলিনি! এত দিন তুমি যাহাকে হৃদয়দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিয়াছ, সে আজ তোমাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিতে যাইতেছে। এতকাল নির্দ্দয় নির্ম্মম হৃদয়ে বিনা অপরাধে সতী সাধ্বীকে ত্যাগ করিয়া তোমার এই নিষ্ঠুর হৃদয়-দেবতার সাধ পূর্ণ হইল না। আর যাহা কিছু বাকী ছিল, তাহা আজ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। চিরদুঃখিনী তুমি, যদি আমার সহিত তোমার বিবাহ না হইত, তাহা হইলেত আজ তোমাকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না, মনের আগুণে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতে হইত না। থাক্, আর ভূমিকার প্রয়োজন নাই, একবারে সমস্ত বলিয়া ফেলি। বেশ সাবধান হও, হৃদয়ে বল কর, জানিনা—আমার মত নির্ম্মম হৃদয় স্বামীর নিকট হইতে এ বজ্রকঠিন সংবাদ একটী সতী সাধ্বী নারীর হৃদয় চুর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অনন্তের অনন্ত গর্ভে মিশিয়া যাইবে কি না? যায় যাক। আর সহ্য করিতে পারি না। মনের বোঝার দারুণ চাপে আমার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইতেছে। শুন তবে বলি—আমার বিবাহ। কেমন সুসংবাদ নলিনি? দেবতার মত কার্য্য কিনা বল দেখি? আবার বরবেশে চেলী পরিয়া হাসিমুখে আর একবার প্রেম খেলা খেলিতে হইবে। আবার এই প্রাণ আর এক চরণে বলি দিতে হইবে। পিতার আদেশ—নিশ্চয়ই বিবাহ করিতেই হইবে। তা আমার ইচ্ছা থাক্ আর না থাক্, আমি সুখী হই আর না হই! কেমন বিধান দেখ দেখি? আমাকে সুখী করিবার জন্য, আমাকে গৃহী করিবার জন্য, আমার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দিবার জন্য এ বিবাহের আয়োজন। ইহাতে আমি শান্তি পাই আর না পাই, তবুও বিবাহ হইবে। যদি প্রিয়তমা সতীর বিরহ আর একজনকে বিবাহ করিলে দূর হইত, যদি এই উচ্ছিষ্ট প্রাণ অপরকে দিয়া শান্তি ও সুখ হইত, তাহা হইলে না হয় আবার বিবাহ করিতাম।

কিন্তু নলিনি, তাহা হয় কই? তাহা যদি হইত তাহা হইলে দেবাদিদেব মহাদেব সতী বিরহে শ্মশানবাসী হইতেন না। কিন্তু তাহা যে হয় না, স্মৃতির

Telegr. GERMLINEN, Telephone No 1300 B, B.

জ্বালা যে বড় জ্বলে, স্মৃতি যে সকল কথা মনে আনাইয়া দেয়। স্মৃতি না মুছিলে যে তোমাকে ভুলিতে পারিব না। বুঝি এ জীবনে ভুলিতে আর পারিব না। তবে একথা নিশ্চয় জানিও, আমি কোন মতে বিবাহ করিব না। জগতের মহা-গুরুও আমাকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারিবেন না। যদি প্রয়োজন হয় দেহ ত্যাগেও কুণ্ঠিত হইব না। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হউক।

শুনিলাম তোমার জ্বর হইতেছে, এখনও আরাম হয় নাই। ভাল করিয়া চিকিৎসা করাইও ইহাই আমার অনুরোধ। আমি অর্থ পাঠাইব। ইতি—

তোমার অযোগ্য স্বামী—
শ্রীশচন্দ্র—

(অনিল কুমারের পত্র)

ভাই শ্রীশ।

আজ কয়দিন হইল তোমার পত্র পাইয়াছি। সংসারের নানা কারণে তোমায় পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই! আশা করি নিজগুণে ক্ষমা করিবে। তোমার পত্রে তোমার বিবাহের সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম বটে, কিন্তু তোমার মতের সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। বুঝিলাম তুমি পিতৃ আদেশ লঙ্ঘনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। দেখিতেছি তুমি কোন মতেই এই বিবাহে সম্মত নও। তুমি উচ্চ শিক্ষিত ধীমান সাধুচরিত! তোমাকে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া আমার বিড়ম্বনা মাত্র। তবু বলি ভাই, পিতৃ-আদেশ সকল অবস্থাতেই সকল সময়েই পালনীয়। সন্তানের পিতৃ-আজ্ঞার গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিবার এবং সময় অসময় নির্দ্দেশ করিবার কোন অধিকার নাই। যিনি চিরপূজ্য, যাঁর দয়াতে আমরা মানব দেহ ধারণ করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞা সৎ অথবা অসৎ বিবেচনা না করিয়া পালন করা উচিত। শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

যাহাদের শাস্ত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পিতৃভক্তির এরূপ জাজ্বল্যমান উপদেশ

বিরাজ করিতেছে তাহাদের কি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করা উচিত? ভাই, একবার পুরাণের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে পিতৃ-আজ্ঞায় কি কঠোর হৃদয়বিদারক কার্য্যাবলী আরব্ধ হইয়াছে। পিতৃ-আজ্ঞায় মহাবীর পরশুরাম নিরপরাধিনী জানিয়াও মাতার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন, পিতৃ-আজ্ঞায় ত্রিলোকপুজ্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাসী হইয়াছিলেন। পিতৃতুষ্টির জন্য যযাতি পুত্র নিজ-রূপ ও যৌবন পিতাকে দান করিয়াছিলেন। পিতৃ আজ্ঞায় পিতামহ ভীষ্মদেব রাজপুত্র হইয়াও চির-সন্ন্যাসী ও চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইহাদের তুলনায় তোমার দুঃখ কত সামান্য একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! নিজে সামান্য স্বার্থত্যাগ করিয়া পিতার আদেশ পালনে উদার হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারিবে না? ভাই, আমরা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমরা হিন্দু ধর্ম্ম না রাখিলে আর কে রাখিবে? তাই বলি, আর সংসারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিও না, কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া দাও, বিধাতার ইচ্ছা, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দাও। সংসারে নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাও। আমরা অদৃষ্ট বাদী এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সংসারের আবর্ত্তে ডুবিয়া যাই। ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হউক। তুমি বিবাহে সম্মত হও। নলিনী আমার পরমাত্মীয়া ভগিনী তুল্যা। তবুও কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলাম। ভগবান অভাগিনীর হৃদয়ে বল দিন। আজ কয়দিন হইতে নলিনী শয্যাশায়ী হইয়া আছে। প্রত্যহই জ্বর হইতেছে। মাঝে ৪।৫ দিন কাসির সহিত মুখে রক্তও দেখা দিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভাল বোধ হইতেছে না। আর আর সব মঙ্গল। ইতি—

অভিন্নহৃদয় তোমার—
অনিল কুমার।

(শ্রীশচন্দ্রের পত্র)

অনিল!

এইমাত্র তোমায় পত্র পাইলাম। তুমি আমাকে উপদেশ প্রদান ছলে অনেকগুলি কঠোর দার্শনিক সত্যের অবতারণা করিয়াছ এবং কতকগুলি শাস্ত্রসঙ্গত উদাহরণও উল্লেখ করিয়াছ। তুমি যে সকল কথা লিখিয়াছ সবগুলিই অনাবিল সত্য। অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এইবার

Teleza GERMLINEU, Telephone No 1388 B, B.

আমি আমার স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তির উল্লেখ করিব। তোমার অবসর মত একটু ভাবিয়া দেখিলে বিশেষ বাধিত হইব। বোধ হয় তুমি এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না যে শাস্ত্রবাক্য মানিতে হইলে তাহার সকলগুলিই মান্য করা উচিত। কাট ছাঁট দিয়া নিজের ইচ্ছামত বিধান গুলিই যে মানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি—যে পবিত্র শাস্ত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পিতৃভক্ত হইতে পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা দিতেছে, সেই শাস্ত্রেরই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর উপর একটা কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ করিতেছে কিনা? পিতৃ আজ্ঞা পালন না করা যেমন পাপ, তেমনি স্ত্রীর উপর কর্ত্তব্যের অবহেলাও পাপ। তবে এখন পাপের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করাই উচিত। সে ভারটাও তোমার উপর দিতেছি। এক পক্ষে পিতার অন্যায় আদেশ পক্ষান্তরে নিরপরাধিনী সতীর এক বিন্দু উষ্ণ সকরুণ অশ্রু। উভয়ের তুলনায় কোনটীর গুরুত্ব অধিক, পর পত্রে আমাকে লিখিও। তুমি যে মনিষীদিগের উপর উদাহরণ দিয়াছ তাঁহাদের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পতঙ্গ। তাঁহারা দেবতা ছিলেন, দেবতার ন্যায় তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্য ছিল, তাই তাঁহারা দেবতার ন্যায় আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাই, আমি ক্ষুদ্র মানব আমার শক্তি সামর্থ্য যে অতি ক্ষুদ্র! তাঁহাদের ন্যায় অদ্ভুত শক্তি, ত্যাগ আশা হইতে কি প্রকারে হইতে পারে? ভাই আমার আসা ভরসা ছাড়িয়া দাও। বুঝি আর অধিক দিন সংসারে থাকিব না। আমার নলিনীও চির তরে ডুবিয়া যাইতে বসিয়াছে। যে হৃদয়-সরোবরে দেববাঞ্ছিত হৃদয়ানন্দদায়িনী শান্তিময়ী, নলিনী ফুটিয়াছিল, সে সরোবর যে নলিনী বিহনে শোভা শূন্য পঙ্কিলময় হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমার অনুরোধ, একবার নলিনীকে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিও। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি তাহার শরীরে দারুণ যক্ষ্মা রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। আমিই তাহার রোগের নিদান। দেখিও ভাই, নলিনী যেন ফাঁকি দিয়া না পালায়। তোমার পুত্র কন্যা কেমন আছে। আমার ভাল থাকা থাকি আর কি? তবে বেঁচে থাকিতে হয় বেঁচে আছি।

হতভাগ্য—
শ্রীশচন্দ্র।

(নলিনীর দ্বিতীয়পত্র)

হৃদয়-বল্লভ!

জগতে আজ আমা অপেক্ষা আর সুখী কে আছে? এতদিনে আমার মনের সাধ পূর্ণ হইল। আজ আমার কত আনন্দ! এই রোগশয্যা আজ আমার স্বর্গ বোধ হইতেছে! ঠাকুর আবার তোমার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা সুখকর আর জগতে কি আছে? আবার তুমি সংসারী হইবে এবং হয়ত সংসারের শত আকর্ষণের মধ্যে সুখী হইবে! তবে দুঃখ এই যে, তাহা দেখা আর আমার দগ্ধ-অদৃষ্টে ঘটিবে না! আবার আমার বাঁচিতে সাধ হইতেছে, আজ আবার জীবনের উপর মমতা হইতেছে! অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য রোগমুক্ত হইয়া তোমার ঘরকন্না, তোমার সুখের সংসার দেখিবার জন্য বাঁচিতে সাধ হইতেছে। আমার সর্ব্বস্ব! কেন তুমি বিবাহে অসম্মত হইতেছ? পাছে আমি মনে কষ্ট পাই, এই ভয়েই হয়ত বিবাহে অসম্মত হইয়াছ। কিন্তু এই ক্ষুদ্র নারী-হৃদয়ের মধ্যে তোমার কষ্টের জন্য কি বিষাদময়ী জ্বালা অহরহ জ্বলিতেছে—তুমি পুরুষ, কি বুঝিবে? আমি ক্ষুদ্রা নারী, আমার জন্য চিন্তা কেন? হয়ত, আমার ক্ষুদ্র প্রাণটী সংসারের বিষম আবর্ত্তে কোথায় চলিয়া যাইবে, কেহই তাহার সন্ধান করিতে পারিবে না। হৃদয়-সর্ব্বস্ব! তুমি কতদিন বলিয়াছ, আমাকে তোমার অদেয় কিছুই নাই। তাই মাত্র ভরসা করিয়া তোমার নিকট একটী প্রার্থনা করিতেছি। দেখো নাথ! আমার অন্তিম প্রার্থনাটী যেন বিফল না হয়। যদি তুমি কখন আমাকে দাসী বলিয়া চরণে স্থান দিয়া থাক, যদি কখন আমাকে অকপটে ভালবাসিয়া থাক, তবে আমার শেষ প্রার্থনা এই যে "তুমি বিবাহ কর।" অন্ততঃ আমার অনুরোধে বিবাহে সম্মতি দান কর। ইহাতে আমার কোন কষ্টই হইবে না। এক পুরুষের দুই স্ত্রী হিন্দুর ঘরে নূতন নহে! তুমি যাহাকে বিবাহ করিবে সে আমার কনিষ্ঠ-ভগ্নীতুল্যা হইবে। আমার দিব্য, বিবাহে অসম্মত হইও না। আমি ক্ষুদ্র রমণী, আমার আবার সুখ দুঃখ কি? সংসারে প্রথম প্রবেশের সঙ্গে যে মহীরুহ আশ্রয় করিয়াছি, তাহার সুখে আমার সুখ, তাহার দুঃখে আমার দুঃখ। আমাদের স্ত্রী-জীবনে অন্য কোন সুখ দুঃখ নাই। তোমার অগাধ

Jeleza HERMUNEU Telephone No 1388 B. B.

ভালবাসায় আমি আত্মহারা, আজও যে তুমি চির-দুঃখিনীর কথা মনে করিয়াছ, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আজও এ অভাগিনীকে তোমার ঐ মহৎ বিশাল হৃদয়ের এক প্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া আমাকে পত্র দাও, ইহা আমার পূর্ব্বপুণ্যফলে। তবে কখন কখন নিমেষের জন্য যখন রোগ যন্ত্রণায় অনিদ্রনয়নে গভীর রাত্রে একাকিনী শয্যাতলে তোমার সেই আদর গুলি মনে পড়ে, সেই অতি অল্প সময়ের জন্য একবার বিধাতার অপূর্ব্ব বিচারের কথা মনে হয়। আমি হৃদয়ের এ দুর্ব্বলতা কিছুতেই পরিহার করিতে পারি না। কখন যে পারিব তাহাও মনে হয় না আর পারি না, বড় কষ্ট হইতেছে, যদি এ সময় একবার আসিতে! না—আসিয়া কাজ নাই, পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলায় কাজ নাই, আমার এই ক্ষুদ্র আশা পূর্ণ না হয় তাও ভাল! আর পারি না—শ্রীচরণে প্রণাম। ইতি—

তোমারই—নলিনী।

(অনিল কুমারের দ্বিতীয় পত্র)

শ্রীশ! এত দিনে ভাই সব ফুরাইল। সংসার তাপ-ক্লিষ্ট স্বর্ণলতা চির-শান্তিময় অমর ধামে চলিয়া গেছে! আর সংসারের সুখ দুঃখ মায়া মোহ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায় আমার চিরদুঃখিনী স্নেহময়ী ভগ্নী নলিনী আর নাই। গত পরশু পূর্ণিমা রাত্রিতে যখন জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতি সতী ধরিত্রীর দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিতেছিল, যখন জগৎসহ জীবগণ পরকুৎসা হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া শান্তিময়ী নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে শায়িত ছিল, যখন সুরবালাগণ তারারূপে নিস্তব্ধ মেদিনীর দিকে চাহিয়া তাপিত মানবের জন্য শিশির ছলে অশ্রুপাত করিতেছিল, ঠিক সেই পূণ্যময়ী গভীর নিশীথে নলিনি এই মরজগত হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ দেখ, ঐ যে—সুধাংশু পার্শ্বে উজ্জ্বল তারা দেখিতে পাইতেছ, উহারই মধ্য হইতে হয়ত নলিনী তোমার দিকে চাহিয়া আছে। চির অভাগিনী চিরদুঃখিনী ভগিনী আমার বড় কষ্টে বড় দুঃখে এই অষ্টাদশ বর্ষ সংসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল। ভগবানের এই পুণ্যময় রাজ্যে এ অবিচার কেন তাহা বুঝিতে পারি না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। যাহাঁর

দ্রব্য তিনিই লইয়াছেন। তাহাতে ক্ষোভ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু এ অবোধ মন বুঝে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনের অজ্ঞাতে মোহের বন্ধনে দুই বিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারে না। মোহান্ধ মানবের এই মধুর ভ্রম আছে বলিয়া জগতের জীব এখনও সমাজে বাস করিতেছে। ভাই পবিত্রতাময়ী সতীশ্রেষ্ঠ নলিনী সম্বন্ধে আর একটু না বলিয়া এ পত্র সমাপ্ত করিতে পারিতেছি না। যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখা শেষ মুহূর্ত্তে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর হয়, সেই রূপ নলিনি মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে সহাস্য বদনে আমার ভগিনীর নিকট একটী অনুরোধ করিয়াছিল। অনুরোধটী এই যে, তাহার মৃত্যুর পর তুমি আবার বিবাহ কর।" হায়! মৃত্যুর পরেও যেন সেই মুখে তোমার অতিত সুখ স্মৃতি গুলি অঙ্কিত ছিল। এ দুর্দ্দিনে ভগবানের উপর বিশ্বাস হারা হইও না। মনে রাখিও জগদীশ্বর সর্ব্বাবস্থায় মঙ্গলময়। ইতি—

অভিন্ন-হৃদয়—অনিল কুমার।

আওতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

দীর্ঘ বনভূমে এক সুবিশাল বট বৃক্ষ
ঊর্দ্ধ শিরে উঠেছে আকাশে।
গর্ব্বে বহু শাখা তার চলিয়াছে বহুদূরে,
শোভে তরু চারু পত্র বাসে॥
অদূরে শালের বন বহু শাল বৃক্ষতথা,
উঠিয়াছে ভেদিয়া গগন।
বটতরুবরে তারা অবজ্ঞা করিয়া যেন
দেখাতেছেবর্দ্ধন কেমন॥

Telegr. GERMLINEU, Telephone No 1388 B, B.

সেই বটবৃক্ষতলে ক্ষীণ এক শাল তরু
বহুদিন করে অবস্থান।
নাইক বর্দ্ধন তার পিঙ্গল পল্লব গুলি
রহে শাল সদা ম্রিয়মাণ॥
হেরিয়া তাহার দশা দুঃখিত সে বট বৃক্ষ
একদিন কহিছে তাহারে।
ওহে শাল কহ শুনি কেন তব হেন দশা-
দুঃখ হয় দেখিয়া তোমারে॥
আমার আশ্রয়ে তুমি রহিয়াছ বহুদিন
শীত বাত আতপ না সহ।
কখন তোমায় মূল নাহি হয় রস হীন,
সব দিন নিরাপদে রহ॥
তথাপি এমন দসা বর্দ্ধন নাহিক তব
দশা তব কাঙ্গালের মত।
ওই দেখ বন মাঝে তব সহোদরগণ
সগৌরবে শোভিতেছে কত॥
কহিছে অধম শাল বট বনস্পতি প্রতি
তোমার আশ্রমে থাকি আমি।
হইয়াছি রসহীন বিকল বিকৃত অঙ্গ,
হইতেছি ক্রমে অধোগামী॥
সতত বঞ্চিত আমি প্রকৃতির দান হতে
বর্দ্ধন উপায় সেই দান।
সুখ বরিষার ধারা নাহি পাই কভু আমি
তোমার উচ্ছিষ্ট করি পান॥
অবাধ সমীর ভোগে নাহি অধিকার মম,
তব ত্যজা সমীর সেবন।
সুখ-দায়ী সৌর কর সম্ভোগ না হয় মোর,
করে কীট সর্ব্বাঙ্গে দংশন॥
তাই কহি বনস্পতি তোমার আশ্রয়ে থাকি
হইয়াছে মম অধোগতি।

প্রকৃতির সব দানে হয়েছি বঞ্চিত আমি
যাহে হয় জীবের উন্নতি॥
বড়র আওতা বড় বিষাক্ত ছোটর প্রতি
হক বড় মহৎ উদার।
তবু তার কাছে থাকি ছোট হয় হয় অতি
বাড়িবার শক্তি মরে তার।

অধিকার।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ।

সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসে,
লজ্জাশীলার যেন আবরণ খানি,
বিশ্ব যেন বিহ্বল ভয়-ত্রাসে,
আপন বুকের আরও কাছে লয় টানি।
আম্রকানন নীরব রয়েছে ধ্যানে,
আঁকাবাঁকা পথ চলে কার সন্ধানে,
নিঝুম নিশিতে জোনাকীর দীপদানে,
ইঙ্গিতে যেন সদা করে কানাকানি।

বাতাস বেড়ায় শ্যামল শস্য পরে,
বেগবতী যেন হারায়েছে তার ভাষা,
বনের আঁধার ঢুকিতে চায়গো ঘরে,
ঘরের আঁধার বনেতে বেঁধেছে বাসা।
নয়নের কোনে নিদ্ তবু আজি নাহি,
ব'সে আছি আমি দিগ দিগন্তে চাহি,
প্রেম-মরীচিকা অবাধে অতিবাহি,
হৃদয়েতে মোর প্রাণভরা ভালবাসা।

সদাই ঘৃণায় রাখ তুমি দূরে মোরে,
সে কথা জেনেছি প্রত্যহ আমি ছলে,

Teleza GERMLINEG, Telephone No 1388 B, B.

হৃদয়ে রেখেছি বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে,
দেহলতা তবু ঘন তিমিরাঞ্চলে।
"ভালবাস তুমি" এই ভাবি আমি যদি,
মুখটী ফিরায়ে থেকো তুমি নিরবধি,
বেদনা মাখান অশ্রু রাখিয়ো রোধি,
ভালবাসা তবু রাখিও হৃদিরতলে।

আগমন-পথে জ্বেলেছি প্রেমের বাতি;
প্রেমিক আমার, একি মোয় অপরাধ ?
ধরণীরে ঘিরে কৃষ্ণ-বরণা রাতি,
অন্তরে মোর সঞ্চিত অবসাদ।
ব'সে আছি আছি আমি বাতায়ন রাখি খুলি,
মাটীর প্রদীপ কম্পিত শিখা তুলি,
দেখাবে তব অভিসার-পথ ধুলি,
কায়ার বিহনে ছায়া দেখিবার সাধ।

জানি গো দয়িত তুমি মোর যাবে চ'লে,
ফিরিয়া না চাবে কভু গো আমার পানে,
প্রেমিকা তোমার কত আছে ধরাতলে,
হৃদয়ের জ্বালা মুছাতে মধুর গানে।
এম্‌নি করিয়া প্রত্যহ পথ-ধারে,
নীরবে আসিয়া দাঁড়াব তোমার দ্বারে,
ভুলিব কেমনে হৃদয়ে রেখেছি যারে,
জীবনে না পাই—লভিব মৃত্যু-ধ্যানে।

কখন করিনি তোমারে পাবার আশা,
হতাশ হয়েছি যে দিন হেরেছি চোখে,
নিষ্প্রাণ নহে এ আমার ভালবাসা,
অন্ধ হয়নি তোমায়-হারানো শোকে।
পরাণ লইয়া ছলনা দিবানিশি,
বুকের রক্তে অশ্রুতে মিশামিশি,

স্বপনেতে পেয়ে খুঁজে মরি দশদিশি,
যামিনী কাটাই আলেয়ার ধ্যানালোকে।

ভাণ ভরে যদি বারেকের তরে,
ক্ষণিক চাহিতে আমার মুখের পানে,
ছল করা প্রেমে অশ্রু পড়িত ঝ'রে,
মিষ্ট মধুর মিথ্যা কহিতে কাণে।
রুদ্ধ দুয়ার ঈষৎ মুক্ত করি,
প্রেমের আবেগে রাখিতে মোরে ধরি,
পোহায়িত তবে বিরহের বিভাবরী,
মিলনের আলো লাগিত আমার প্রাণে।

যদি গো ডাকিতে আমারে আদর ক'রে,
সোহাগ দেখায়ে বসিতে ক্ষণিক কাছে,
তপ্ত ললাট রাখিয়া চরণ পরে,
বলিতাম আমি মরমে গাঁথা যা আছে।
মরণ যখন দাঁড়াবে দুয়ারে আসি,
ভেদিয়া, মথিয়া বাহিরে আঁধার রাশি,
তবু না ঘুচিবে এই ভালবাসা বাসি,
মিথ্যা প্রেমিকা যদি কেহ বলে পাছে।

মরণপ্রান্তে বলিব—ভালবাসি,
যতদূরে থাক-তুমি তো নহ গো পর,
কত আশা ল'য়ে ছুটিয়া চলেছি ভাসি,
প্রিয় নহ শুধু, প্রাণ হ'তে প্রিয়তর।
প্রিয়তম তব ভাঙ্গিবে সুখের মেলা,
চতুর আমার, ঘুচিবে চাতুরী খেলা,
সেই দিন মোরে আর না করিবে হেলা,
বিঁধিবে না আর নিঠুর বিরহ-শর।

নিঠুর মরণ, ক্ষণিক দাঁড়াও দূরে,

Teleza GERMLINEU, Telephone No 1388 B, B.

একবার যদি দেখা পাই আমি তার,
ঐ বুঝি আসে পরিচিত সেই সুরে,
এ জীবনে মম প্রথম প্রণয় হার।
জীবনের মোর শেষ মিনতিটি রাখো,
মরণ শিয়রে "প্রিয়া" ব'লে মোরে ডাকো,
নারীর লজ্জা পুরুষ হইয়া ঢাকো,
হৃদয়-দেবতা, নারী জীবনের সার।
বিজয়ীর বেশে যাবে তুমি স্ফীত বুকে,
সহিতে নারিব সে বেদন নির্ম্মম,
বিজিতা আমি রহিব না কভু দুঃখে,
জগতের চোখে কিসে তোমা হ'তে কম?
আর নাহি কব—"ওগো ভালবাসি—",
তুমি নহ প্রভু, আমি নহি দাসী,
চির দিন নাহি রব উপবাসী,
আমি প্রিয়া—তুমি মম প্রিয়তম।

সমালোচনা।

সনাতনধর্ম্ম ও নব যুগ—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র বেদান্তরত্ন প্রণীত মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতরূপ হিন্দু শাস্ত্রাদি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সারসঙ্কলন করিয়া সুধীসমাজের সমীপে উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছেন, প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম কি, তাহার মর্ম্মার্থ কি, স্বরূপ কি, তাহা পালন বা রক্ষণ করিবার উপায় কি? পুস্তকখানিতে হিন্দু জাতিরও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণের অশেষ কল্যাণকর অনেক সারগর্ভ উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিষয় অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সুশিক্ষিত ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়গণের মতে প্রস্তুত বিংশবর্ষকাল সুপ্রচলিত

প্রত্যেক মহৌষধাবলীর নাম ও ট্রেডমার্ক হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্নী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল, দ্বারা আইনানুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে—ক্রেতাগণ ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।

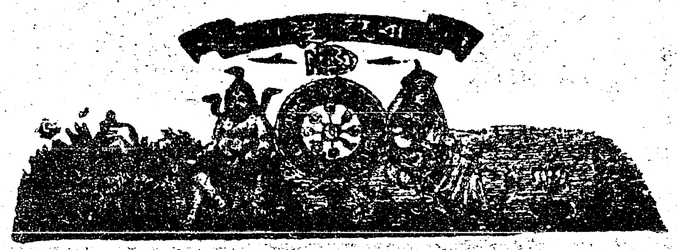

বর্ত্তমানকালে জ্বররোগে যত প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে ডাক্তারি মতের ঔষধই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আশু ফলদায়ক তাহা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার মহাশয়গণের দ্বারা এই "**শম্ভুসুধা**" মহৌষধটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শম্ভুসুধা সেবনে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর, নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ঘুস্‌ঘুসে পালাজ্বর, কম্পজ্বর, মেহ ও প্রমেহ ঘটিত জ্বর, কুইনাইনে আট্‌কান জ্বর, অমাবশ্যা পূর্ণিমার জ্বর, বাতজ্বর পিত্তজ্বর কফজ-জীর্ণ জটিল জ্বর, কালাজ্বর ও ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বরই **শম্ভুসুধা** সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়, এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। শম্ভুসুধা ২।৪ মাত্রা সেবনেই জ্বর বন্ধ হয়, কিছুদিন ব্যবহারে প্লীহা যকৃৎ কমিয়া যায় এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরভাব সর্দ্দি কাশী হইলে শম্ভুসুধা একমাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের জড়তা দূর হইবে। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে টনিকের কার্য্য করে; অতএব শম্ভুসুধা প্রত্যেক গৃহস্থের সর্ব্বদা গৃহে রাখা আবশ্যক, শরীর সামান্য একটু শ্লেষ্মা ভারাক্রান্ত বোধ হইলে একমাত্রা "শম্ভুসুধা" সেবন করিলে শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। মূল্য প্রতি ৮ আট আউন্স শিশি ৸০ আনা ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।



রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্নস্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে "**অমৃত সার সালসা**" সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের "**অমৃত সালসা**" সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা ৬ শিশি ৫।০ টাকা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র, এক ডজন লইলে ১০৲ টাকা।

Teleza GERMLINEG, Telephone No 1388 B, B.

বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেরই মুক্তকণ্ঠে সু-প্রশংসিত ও ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্ত বাটীর অমূল্যনিধি বিশ্ববিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম যাবতীয় চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

বিনা অস্ত্রে ছানি আরোগ্য
পদ্মমধু

কে না জানে চক্ষু না থাকিলে অন্যের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয় ?

অতএব চক্ষুপীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্য **পদ্মমধু** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিধ চক্ষুপীড়ায় বিশুদ্ধ **পদ্মমধু** তুল্য মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। একবার ব্যবহার করিলেই অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইবেন। সাবধান! ক্রয় কালে এন্ দত্ত ব্রাদার্স নাম দেখিয়া লইবেন। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ এক টাকা, ৩ ড্রাম ২৷৹ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা। **এন্ দত্ত ব্রাদার্স**

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট।

আহিরীটোলা কলিকাতা।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শ বর্ষ] ১৩৩৮ পৌষ, [৯ম সংখ্যা]

১। শ্রীমদ্ বালানন্দ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৫৭
২। হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু ... ২৬৬
৩। বহু মূত্র ডাঃ সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এম, ডি, কে, টী। ২৭৩
৪। সিঁথির সিঁদুর শ্রীযুক্ত কমলাকান্তবসু ... ২৭৭
৫। আর্দ্রক বা আদা কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ রসায়ণ শাস্ত্রী ২৭৯
৬। গুরুভক্তির পরিণাম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ২৮১
৭। নারিকেল—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি ২৮২
৮। দশবার দুর্গানাম জপ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ২৮৩
৯। মিত্র সহ রাজার কর্ম্মফল—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ কাব্যরত্নাকর ২৮৬

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়। 3-6-32

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

জ্বরের যম জারমলীন সর্ব্বত্রপ্রাপ্তব্য

এক দিনে জ্বর ছাড়ে ! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৩৭ নং অপারসার্কুলার রোড, কলিকাতা

Telegs. GERMLINEG, Telephone No 1388 B. B.

স্থাপিত—১৮৩৩

চিরায়ুপ্রদ

রাজা, মহারাজা, জমিদার,ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারীং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি, সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত

অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিস্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২॥০ অড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৬৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

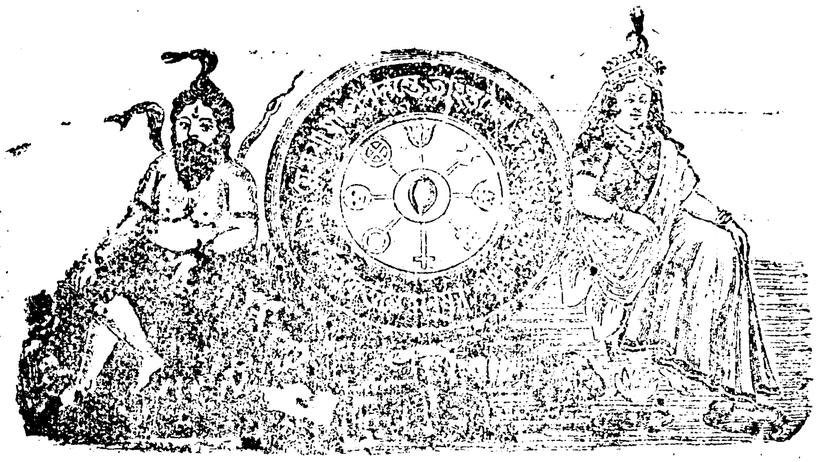

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ	১৩৩৮ সাল, পৌষ	৯ম সংখ্যা।

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড

গুরুমুখ-বিবৃত উপদেশাবলী।

(১)

ঊর্ব্বর ক্ষেত্রে থোরা বপন।
জ্ঞান ফসল ঝট করে প্রকটন॥

উপযুক্ত উত্তম অধিকারীকে অতি সামান্য কথায় একটু উপদেশ দিলেই তাহার অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয় ও তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে রাজর্ষি জনক ও মহামুনি অষ্টাবক্রের উপাখ্যান বিবৃত করিয়া গুরুদেব আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন।

বিদেহাধিপতি রাজর্ষি জনক সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান আমাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এ রাজর্ষি জনক একাধারে পরম জ্ঞানী ও পরম নিষ্কাম যোগী বলিয়া নানাস্থানে উক্ত হইয়াছেন। কর্ম্মযোগের বিষয় বুঝাইতে যাইয়া শ্রীভগবান গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" অর্থাৎ জনক প্রভৃতি রাজর্ষিরা কর্ম্মযোগ দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়াছেন। জ্ঞানী-দিগের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে একটী উক্তি আছে—যথা—

কৃষ্ণঃ ভোগী শুকস্ত্যাগী রাঘবো জনকাদয়ঃ।
বাশিষ্ঠ কর্ম্মকর্ত্তারো পঞ্চৈতে জ্ঞানীনোস্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শুকদেব, রামলক্ষ্মণ, জনক ও বাশিষ্ঠদেব এই পাঁচজন জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত। এ গুলি একসঙ্গে দিবার হেতু এই যে, এক জ্ঞানীর সহিত অপর জ্ঞানীর বাহ্যিক আচরণের মিল দেখা যাইবে না। পুনরায় রাজর্ষি জনক বিদেহভাবে যে কোন্ কালের লোক ইহাও বিচারে পাওয়া যাইবে না। কারণ শ্রুতিতেও এ জনক মহারাজের উল্লেখ আছে—যথা—"জনকো হ বৈদেহঃ কুর্য্যাদুপাবসর্পন্নুবাচ নমস্তেহস্তু যাজ্ঞবল্ক্যানু মাশাষাতি"—অর্থাৎ বিদেহাধিপতি জনক স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া যাজ্ঞ-বল্ক সমীপে গমনপূর্ব্বক নিপতিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে জনক সম্বন্ধে বহুবিষয়ের আলোচনা আছে। সুতরাং এ রাজর্ষি জনক যে, এক পরম জ্ঞানী ছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। দেবীভাগবতে বর্ণিত আছে যে ব্যাস-দেব নিজপুত্র শুকদেবকে উপদেশ লইবার জন্য জনক মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও সেই উপদেশ মত তিনি সংসার আশ্রম গ্রহণ করেন।

অপর দিকে, মহামুনি অষ্টাবক্র যে একজন পরম জ্ঞানী; সে সম্বন্ধেও বহু প্রকারের উক্তি আছে। ইনি উদ্দালক-তনয়া সুজাতারগর্ভে কাহোড় মুনির ঔরসে জন্মলাভ করেন। কথিত আছে যে, ইনি মাতৃগর্ভে থাকিতেই সমুদয় বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, একদিন ইহাঁর পিতা শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন; কিন্তু এ সময়ে এই পিতার অধ্যয়নে ভুল হইতেছিল। এই গর্ভস্থ শিশু অষ্টাবক্র পিতার এই ভ্রম সংশোধন করিতেছিলেন। দুই একবার এইরূপ করিতেই কাহোড় মুনি বিরক্ত হইয়া অভিশাপ দেন যে, এই পুত্র অষ্টস্থলে বক্রহইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। এই অভি-শাপ বশতঃ তিনি অষ্টবক্রশরীরধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ও অষ্টাবক্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। আরও কথিত আছে যে, বিকলাঙ্গ রাজা ভগীরথ এই অষ্টাবক্রের

কৃপায় উত্তমাঙ্গ হন। আরও কথিত আছে যে, ইহাঁর জন্মলাভের পূর্ব্বে কাহোড় মুনি জনকরাজার সভায় বন্দী নামক জনৈক তার্কিক কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ও অষ্টাবক্র যাইয়া সেই বন্দীকে পরাভূত করিয়া পিতাকে উদ্ধার করেন। আরও প্রবাদ আছে, একদা রাজর্ষি জনক স্বপ্নাবস্থায় দেখেন যে, তিনি দরিদ্র হইয়াছেন। পরে জাগরিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ হয় যে, কোনটা যথার্থ—অর্থাৎ জাগরণ অবস্থায় রাজবেশই ঠিক, না স্বপ্নাবস্থার কাঙ্গাল বেশ ঠিক? যাহা হউক রাজর্ষি জনক ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া সকল জ্ঞানী ও পণ্ডিত গণকেই প্রশ্ন করিতে থাকেন যে, "ইহা ঠিক না উহা ঠিক।" কেহ প্রশ্নের যথার্থ সমাধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এজন্য জনক মহারাজ সমুদয় পণ্ডিতগণকেই রাজধানীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। অষ্টাবক্র ইহা শুনিয়া রাজাকে উত্তর দেন, "ইহাও ঠিক নয়, ও উহাও ঠিক নয়"—অর্থাৎ জাগরণ ও স্বপ্ন দুইটীই মিথ্যা। যাহা জাগরণ তাহা একটী দীর্ঘ স্বপ্নাবস্থা মাত্র। মহাভারতেও এই অষ্টাবক্র সম্বন্ধে বহু বিষয় বর্ণিত আছে। সুতরাং উপরোক্ত আখ্যায়িকা হইতে সকলেই বুঝিবেন যে, এই অষ্টাবক্র মুনিও এক পরমজ্ঞানী ছিলেন।

এক সময়ে রাজর্ষি জনক এইরূপ প্রচার করেন যে, তাঁহার গুরু "গদি" বা সিংহাসন তিনি খালি রাখিয়াছেন। যে মহাত্মা এক কথায় তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করিবেন ও পুনরায় আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইবে না। সেই মহাত্মাই তাঁহার গুরুগদি অধিকার করিবেন ও তাঁহার গুরুরূপে বরিত হইবেন। ইহা প্রচার হইবার পর, নির্দ্দিষ্টদিনে রাজসভা আহুত হইল ও তথায় বহু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সমাগম হইল। রাজর্ষি জনক কিরূপ জ্ঞানী ইহা সকলেরই বিদিত ছিল। এজন্য সমবেত ঋষিমণ্ডলী কিরূপে এক কথায় বিদেহ রাজকে জ্ঞান প্রদান করিবেন, ইহাস্থির করিতে না পারিয়া সকলে সভাস্থলে নিজ নিজ আসনে সমাবিষ্ট রহিলেন।

এমন সময়ে, মহামুনি অষ্টাবক্র তাঁহার অঙ্গের বিকৃতিজন্য নানারূপ হেলন দুলনের সহিত চলিতে চলিতে সেই সভায় প্রবেশ করিলেন ও একেবারে সেই শূন্য গুরুগদীতে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তাঁহার এইরূপ সাহস দেখিয়া অন্যান্য ঋষিবর্গ হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহারা এইজন্য হাসিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি বহু বহু ব্রহ্মজ্ঞ গুরুত্ব যে সভায় উপস্থিত থাকিয়াও যে গুরুসিংহাসন লইতে সাহসী হন নাই, তাহা অষ্টাবক্র যাইয়া অনায়াসেই অধিকার করিলেন।

এই মুনির রাজগুরু হইবার সাধ এত প্রবল হইয়াছে যে, এক কথায় রাজর্ষি জনককে জ্ঞান দেওয়া কি প্রকারে কঠিন ব্যাপার তাহার চিন্তা কিছুমাত্র না করিয়াই এরূপ দুঃসাহসের কায্য করিয়া বসিলেন। অপর দিকে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

"হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দ্দোষৈ র্ব্বিমুক্তো যো স গুরুশিষ্যসম্মতঃ॥

অর্থাৎ হীনাঙ্গ, কপটী, রোগী, বহুভোজী ও বহুভাষী ব্যক্তি গুরুর যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি ইহা হইতে মুক্ত তিনিই গুরু বলিয়া শিষ্যের সম্মত।

একটী অঙ্গ যাহার বিকৃত বা হীন তিনি গুরুপদের যোগ্য নহেন। আর এই মুনির আটটী অঙ্গ বিকৃত। এজন্য তিনি কখনই গুরুপদের যোগ্য নহেন। রাজ-গুরুপদলাভের আকাঙ্ক্ষায় ইনি এতই বুভুক্ষু যে এ সকল একবারও মনে করিলেন না। একে তাঁহার অঙ্গবিকৃতি জন্য তাঁহাকে সকলে পরিহাস করে, আর এখনি রাজর্ষির মত ব্যক্তিকে যখন এককথায় জ্ঞানপ্রদানে অক্ষম হইবেন, তখন তিনি আরও পরিহাসের পাত্র হইবেন, এ সকল মনে করিয়াই সকলে হাসিয়া উঠিয়াছিল।

যাহা হউক, উপরোক্ত বিষয়গুলি চিন্তা করিয়া সভাস্থ বহুব্যক্তি যখন হাসিয়া উঠিলেন, তখন বহুব্যক্তি যে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ হাসিতেছে ইহা বুঝিয়া, অষ্টাবক্র সহসা বলিয়া উঠিলেন যে, "যে লোক হাম্‌কো দেখ্‌কে হাস্‌তা হ্যায় ইন লোক হ্যায় চামার (চর্ম্মব্যবসায়ী) আউর না হ্যয় কসাই (মাংস বিক্রয়কারী)।" অষ্টাবক্রের এই বাক্য শুনিয়া অনেকেই যেন নিজেকে অবমানিত বোধ করিলেন ও নিস্তব্ধ হইলেন। ইহার কারণ সে সভাতে যজ্ঞবল্ক প্রভৃতি বড় বড় ব্রহ্মবেত্তাগণ উপস্থিত ছিলেন, এজন্য ঐ রূপ ভাষা প্রয়োগ করায় সকলের ক্ষুণ্ণ হওয়া ও অবমানিত বোধ করা স্বাভাবিক। এজন্য কেহ বলিয়া উঠিলেন যে, মুনিবরের ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ শিষ্টতা বিরুদ্ধ হইয়াছে।

অষ্টাবক্রও তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার উপরোক্ত ভাষা প্রয়োগে বোধ হয় অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তখন তিনি বলিতে লাগিলেন যে তিনি "সচবক্তা" বা সত্যবাক্যই বলিয়াছেন। তিনি হাস্যকারীগণকে "চামার" ও "কসাই" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় যাঁহারা অভিমানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি বুঝাইতেছি যে, আমি উহা কেন বলিয়াছি।

চামার বলিবার কারণ এই যে "চামারেরা" বা চর্ম্ম ব্যবসায়ীরা কোন চর্ম্মটী ভাল বা মন্দ বা কোন্ চর্ম্মটী কিরূপ ইহারই বিচার লইয়া ব্যস্ত থাকে। আর "কসাইয়েরা" বা মাংসবিক্রেতাগণ সর্ব্বদা কোন্ মাংস ভাল্ কোন্ মাংস মন্দ, ইহায় চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকে। এ সভাস্থ যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গবিকৃতি জন্য চর্ম্ম ও মাংসের গুণাগুণ দেখিয়াই হাসিয়াছেন। এজন্যই ঐরূপ শব্দ দুইটী তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন।

অষ্টাবক্রের এইরূপ বাক্য শুনিয়া বাস্তবিকই যাঁহারা তাঁহার অঙ্গের বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই হাসিয়াছিলেন তাঁহারা তখন মনে মনে বড় লজ্জিত হইয়া নীরব রহিলেন।

যখন সভা এরূপে নিস্তব্ধ হইল, তখন অষ্টাবক্র রাজর্ষি জনককে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "হে রাজা! তেরা যো নিজস্ব হ্যায় উ হাম্‌কো গুরুদক্ষিণা দে"। মুনির এই বাক্য শুনিয়াই রাজর্ষি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিজস্ব কি? প্রথমতঃ ভাবিলেন, তাঁহার রাজত্বের বিষয়। কিন্তু বিচারদ্বারা বুঝিলেন যে, এ রাজসম্পদ ত তাঁহার নিজস্ব নয়। এ রাজস্ব পূর্ব্বে অপরের ছিল এবং পরে উহা অপরের অধিকারে যাইবে! ইহার পর জনক ক্রমে ক্রমে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, ধন, রত্ন, অশ্ব, গজ, গাভী প্রভৃতির বিষয় একে একে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিচার দ্বারা বুঝিলেন যে, স্ত্রী পূর্ব্বে অন্যগর্ভে জন্মিয়াছিল, এখন যদিচ তাঁহার নিকট আছে, কিন্তু তাঁহার দেহ ত্যাগের পর ত সঙ্গে যাইবে না। এইরূপে অর্থ, সম্পত্তি, গাড়ী, ঘোড়া, হস্তী প্রভৃতি কোনটীকেই ত তিনি নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পর, নিজের দেহ, ইহাও তো নিজস্ব নয়। ইহাও বিচার দ্বারা দেখিলেন যে, ইহাত পঞ্চভূতের। ইহার পর আরও বিচারে অগ্রসর হইয়া বুঝিলেন যে, অন্তঃকরণ—ইহাও তো নিজের নয়। তখন জনক মহারাজ বুঝিলেন যে, নিজস্ব বলিয়া এ সংসারে তো কিছুই দেখিতেছেন না, যাহা তিনি গুরুদক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করিবেন। এই নিজস্ব বুঝিতে যাইয়াই জনক মহারাজের জ্ঞান লাভ হইল যে, "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ"॥ আমি ত একাকী মাত্র; আমার বলিতে ত কিছুই নাই। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অন্যান্য সমুদয় যাহা আমার বলিতেছি, তাহা ত ভ্রম। যে আত্মা এইরূপ "অসঙ্গ" তাহার আবার অন্যজ্ঞান প্রাপ্তি, কি আছে। মহামুনি অষ্টাবক্রের ঐরূপ একটী বাক্য শুনিয়াই জনক মহারাজের আর কোনরূপ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার

অবসর রহিল না। তিনি বুঝিলেন যে, একই কথায় তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইল। তখন অষ্টাবক্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

এই এক কথায় অষ্টাবক্র জনকমহারাজকে যে জ্ঞান প্রদান করিলেন, তাহাই পরে বিস্তৃত ভাষায় অষ্টাবক্র সংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে—যথা—

"ত্বমেকশ্চেতনঃ শুদ্ধো, জড়ং বিশ্বমসৎতথা।
অবিদ্যাপি ন কিঞ্চিৎসা, কা বুভুৎসা তথাপিতে॥"

অষ্টাবক্র সং। ১০ ম।৫

তুমিই একমাত্র চেতনস্বরূপ (জ্ঞানময়) বিশুদ্ধ ও অদ্বিতীয়। অখিল জগৎ জড়ময় ও মিথ্যা। তোমাতে কিছুমাত্র অবিদ্যা নাই। অতএব তুমি অবিদ্যা নাশের জন্য বাসনা কেন করিতেছ? অর্থাৎ যে লোক আত্মাকেই অদ্বিতীয় ও বিশুদ্ধ ও চিন্ময় বলিয়া জ্ঞাত আছে, সে হইল আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার অন্য-জ্ঞানের বা কি প্রয়োজন?

"ক্বভূতানি স্বদেহো বা ক্বেন্দ্রিয়ানি ক্ব বা মনঃ।
ক্ব-শূন্যং ক্বচ নৈরাশ্যং মৎস্বরূপে নিরঞ্জনে॥"

অঃ সং—২০ শ।১

রাজা তখন বলিতে লাগিলেন যে, আমি আত্মস্বরূপ নিরঞ্জন। সুতরাং আমাতে পঞ্চভূত সমূহ কোথায়, দেহই বা কোথায়, আমাতে নিরাশা, শূন্যতা, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি কোথায়? শ্রীগুরুমুখে উপরোক্ত আখ্যায়িকাটী আমরা প্রাপ্ত হইবার পর, আরও একটু উপদেশ এই সঙ্গে পাইয়াছি। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ ও সুসংস্কৃত উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে গুরুদত্ত যে সামান্য বীজ পতিত হয়, তাহাতে যদি কেহ রীতি-মত-ভাবে জলসিঞ্চন করে, তবে অতি শীঘ্রই সে সুফল লাভ করিয়া থাকে। নিজের দেহ নষ্ট করিতে হইলে, সেই দেহের স্থলবিশেষে যদি একটী সামান্য সুচী দ্বারা বিদ্ধ করা যায়, তবে উহা অনায়াসেই নষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু অপরকে বধ করিতে হইলে, নানারূপ সুতীক্ষ্ণ দৃঢ় শস্ত্রের প্রয়োগ করা আবশ্যক। এইরূপ নিজের সুসংস্কৃত অন্তঃকরণে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য একটী সামান্য গুরুবাক্য বা গুরুদত্ত মন্ত্রের দ্বারাই সর্ব্বোন্নতি ও জ্ঞান লাভ হইতে পারে। অধিক বাগাড়ম্বরের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহার বর্ণনা চৈতন্যামৃতেও এইরূপ আছে:—

"কি বা মন্ত্র দিলা গুরু করিল পাগল
গৃহে থাকিবারে নারে মন সতত চঞ্চল
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন"

বাক্য বিস্তার বা বিতণ্ডা দ্বারা যদি কাহাকেও তর্কে বা বাক্যযুদ্ধে পরাজয় করিবার কেহ ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে নানারূপ শাস্ত্র পাঠ করিয়া তর্ক যুদ্ধের জন্য শস্ত্র সংগ্রহের আবশ্যক হয়। এজন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,

"বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে॥"

এবং

"শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমস্য কারণং।
অতঃ প্রযত্নাৎ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্বমাত্মনঃ॥"

(ঐ) বিবেক চূড়ামণি—৬০

অর্থাৎ বাগবৈখরী ও শব্দঝরী বা তর্কযুদ্ধে সম্মত প্রভূত বাক্যজাল শাস্ত্র-ব্যাখ্যার কৌশল মাত্র। উহা কেবল পণ্ডিত গণের পাণ্ডিত্য প্রকাশের হেতু হইয়া, উহা ভোগবৃদ্ধির জন্যই হইয়া থাকে। উহা মুক্তি-পথের জন্য কিছুমাত্র সহায় হয় না। এইরূপ শাস্ত্রের বাক্যজাল এক চিত্তভ্রান্তিকর অরণ্যমাত্র! আত্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা হইলে, যত্ন পূর্ব্বক কোন তত্ত্বজ্ঞের নিকট হইতে উপদেশ লওয়াই কর্ত্তব্য। আর এই উপদেশ লাভ করিয়া এইরূপে চলিতে হইবে—

"লব্ধং বাথ ন লব্ধং বা স্বল্পং বা বহবস্তথা।
নিষ্কামেনৈব ভোক্তব্যং সদা সন্তুষ্ট-মানসাৎ॥"

এইরূপভাবে চলিতে চলিতে তাহার জ্ঞান হইবে—"নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক।" উহা হইতেই পরে বুঝিতে পারিবে যে—

"ব্রহ্মসত্যং জগান্মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরং।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ॥"

অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর এ জগৎ মিথ্যা। জীবই ব্রহ্ম, অন্য কেহ নহে। ইহাই একমাত্র সৎশাস্ত্র ও ইহাই যাবতীয় বেদান্ত-শাস্ত্রের একমাত্র সিদ্ধান্তঘোষণা। বা "হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ॥

এখানে অনেকেই আর একটী প্রশ্ন উঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, স্বগুরুর নিকট এই কথায় জ্ঞানলাভ হইল; ইহা ত বুঝা গেল; কিন্তু এরূপ

উপদেশ ত অনেকে বহুবার শ্রবণ করিতেছেন তবে তাঁহাদের জ্ঞানলাভ বা আত্মজ্ঞান কেন হয় না? এখানে গুরুউপদেশ কার্য্যকরী কেন হয় না? ইহার উত্তর পূর্ব্বে একটী কথায় প্রকাশ করা হইয়াছে অর্থাৎ "সুসংস্কৃত অন্তঃকরণ" হইলেই ইহা হইয়া থাকে। এ "সুসংস্কৃত অন্তঃকরণ" কিরূপে হয়, ইহা লইয়াই হিন্দু-শাস্ত্রের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া কর্ম্ম ও উপাসনার বিচার হইয়াছে। জ্ঞান সদা সকল হৃদয়েই দেদীপ্যমান আছে। ইহা কেবল অন্তঃকরণের মলিনতায় আচ্ছন্ন আছে মাত্র। আচার্য্য শঙ্কর "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ইহারই আলোচনা করিয়াছেন! শ্রুতিও "আত্মাবারে দ্রষ্টব্য" এই ফলশ্রুতি শুনাইবার পর ইহার উপায় স্বরূপ বলিয়াছেন,শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ মাত্র জ্ঞানলাভ হইলে মনন ও নিদিধ্যাসনের আবশ্যক নাই। এই নিদিধ্যাসন হইতেছে ধ্যান। এই ধ্যান হইতেছে অন্তঃকরণের বিক্ষেপাদি ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বভূমিতে ধ্যেয় বস্তুতে দৃঢ়রূপে অবস্থান! ইহা লাভ করিতে হইলেই শাস্ত্রীয় বিধিমত নিজ নিজ প্রকৃতির অনুযায়ী আচার ব্যবহার, কর্ম্ম ও উপাসনা অবলম্বন করিতে হইবে। আজকাল অনেকেরই ধারণা হিন্দুশাস্ত্র বহুপূর্ব্বে প্রণীত, এজন্য কালানুসারে ইহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। এই কাল সম্বন্ধে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বহুরূপে ভূত ভবিষ্যতের বিচার করিয়াছেন। সত্য-ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগ সম্বন্ধে কালের বহির্গামী ও অন্তর্মুখী গতি স্থির করিয়া এই কলিকালে অধিকাংশ মানবের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে ইহা বহু পুরাণে স্পষ্টরূপে তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এজন্য ইহা নিবারণের উপায়ও বহুবিধ প্রকারে উপদেশ দিয়াছেন। এজন্য শাস্ত্র বলিলেই শাস্ত্র কি উদ্দেশ্যে রচিত ইহা প্রথমতঃই বিবেচনা করিতে হইবে। হিন্দুর শাস্ত্র ৪টী, যথা বেদ, পুরাণ স্মৃতি ও তন্ত্র। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ৩টী হইতেছে বেদমূলক। এ সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্যমূলক গতি একদিকেই ধাবিত হইয়াছে। এই গতি হইতেছে কেন্দ্রাভিমুখী। এই কেন্দ্রাভিগমন হইতেছে জীবের মুক্তি। এ মুক্তি বলিতেই সহজভাবে বুঝিতে হইবে যে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তি। শাস্ত্র যথার্থ রোচক ও ভয়ানক ভাবের উপদেশ দিয়া এই কেন্দ্রাভিগমনের উপায় বলিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় বিধিমত এই উপায় অবলম্বন করিলে যদিচ ইহার ফল লাভ এ জীবনে না হয় তথাপি জীব ক্রমোন্নতি দ্বারা জন্মান্তরেও লাভ করে।

মানুষ সত্ত্ব-রজ ও তম প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে

রজঃ ও তম ভাব হইতেছে বিক্ষেপশক্তি-সম্পন্ন, এজন্য ইহা কেন্দ্র হইতে দূরে অপসরণ। সত্ত্বভূমিতে অবস্থান বা গমন হইতেছে, কেন্দ্রের সমীপবর্ত্তী-স্থানে অবস্থিতি, ইহা যতই কেন্দ্রের সমীপবর্ত্তী হইবে, নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিও সেইরূপ হইবে। কারণ এই কেন্দ্র হইতেছে "জ্ঞান" ও "আনন্দ"। মানুষ নিরতিশয় আনন্দলাভের জন্য লালায়িত। কারণ সকল অবস্থাতেই এ আনন্দের বা জ্ঞানের সংস্পর্শ আছে। রজঃ ও তম ভাব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াও মানুষ সময় সময় ক্ষণিক আনন্দ লাভ করে। কিন্তু ইহা স্থায়ী না হওয়ায় পুনরায় দুঃখসাগরে মগ্ন হয়। কি উপায়ে মানব স্থায়ী সুখলাভ করিবে? কি উপায়ে প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিমার্গে যাইবে? কি উপায়ে উপরোক্ত কেন্দ্রাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হইবে তাহারই উপায় হিন্দুশাস্ত্রে নানারূপ ক্রিয়া কৌশল, আচার-ব্যবহার আহারের ভেদাভেদ কর্ম্ম ও উপাসনার প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র শব্দের অর্থ যাহা দ্বারা সকলে শাসিত হয়, সংযমিত হয়, নিবৃত্তিমার্গে গতিলাভ করে ও কেন্দ্রাভিমুখী গতি লাভ করিয়া অজ্ঞানতিমির ও দুঃখসাগর হইতে মুক্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভের পথে অগ্রসর হয়। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ও অভ্যাসগুণে যখন বহির্মুখী গতি সংযমিত হয়, তখন ইহা মন্থরতালাভ করিয়া ক্ষীণতা-লাভ করে ও তাহার পর সত্ত্বভূমির দিকে ঊর্দ্ধাভিমুখিনীগতি প্রাপ্ত হয়। দেশ কাল পাত্র বা জাতি গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী কিরূপে উক্ত উপায় লাভ হইবে তাহা হিন্দুশাস্ত্রে ঋষিগণ নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত লক্ষ্যকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে আহারভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ, ক্রিয়াভেদ, মন্ত্রভেদ ও দেবতাভেদের প্রতি উপাসনাভেদ জনিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তজ্জন্য তিথি নক্ষত্রভেদে আহারভেদ, তিথিভেদানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠানভেদ রাত্রিদিনের মধ্যে সময়-ভেদে সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠানভেদের বিচার আছে। ইহা ভিন্ন গুরুবিচার শিষ্যবিচার, জাতিবিচার, আশ্রমবিচার প্রভৃতি আছে। এরূপ শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে চলিলেই ইহার ফললাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য-পালন করিলে কি ফল লাভ হয়, ইহা যে করে সেই জানে। বেদ অভ্যাস করিলে কি ফললাভ হয়, ইহা যে করে, সেই জানে। মন্ত্রজপ, দেবতার পূজা ও উপাসনা, যোগানুষ্ঠান যিনি গুরুপ্রদর্শিত পথে করেন; তিনিই ইহার উপকারিতা জানেন। এ কলিকালে বেদোক্ত সন্ধ্যা বন্দনাদির যেরূপ উপদেশ আছে, সেরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনাও আশুফলপ্রদ ইহাও উক্ত হইয়াছে। "কলৌনাস্ত্যেব কেবলং কলৌ

দানৈব কেবলং," এরূপ অধিকারীগণের জন্য সহজ পন্থাও বিবৃত আছে। সুতরাং যাঁহারা কলিকালের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা যে কলিকালের জীবের হিত-সাধন করেন নাই, ইহা মনে করা মহাভ্রম। এজন্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য মনে না করিয়া, শাস্ত্রীয় বিধিমতে অনুষ্ঠান না করিয়া নিজের প্রবৃত্তি মার্গের অনুকুল শাস্ত্র গঠন করিতে ইচ্ছা যাহারা করেন তাঁহারা মহাভ্রান্ত। শাস্ত্র প্রণয়ন হইয়াছে জনসাধারণের কি উপায়ে উন্নতিলাভ হইবে ইহা হৃদয়ে লইয়া। ঋষিরা Highestgoodl of the highest order ইহা যতদূর ভাবিয়াছেন এরূপ আর কেহ ভাবিতে পারে নাই। জনক-রাজার পরিশুদ্ধচিত্ততার জন্যই একটী বাক্য শ্রবণমাত্রই তাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। আমরাও সাধনা করিলে নিশ্চয়ই ঐরূপ হইব।

হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

রবিবার ২৪ এ আশ্বিন ১৩৩৮

কাল দিনমানে যেরূপ দুসহ উত্তাপে দগ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, কিন্তু রাত্রির প্রহর যত বাড়িতেছিল, শৈত্যের বহরও তত অনুভব হইতেছিল। আজ এখন মনে হইতেছে যে, কাল দ্বন্দ্ববশতঃ রৌদ্র ও বায়ুর আত্মশক্তি-পরীক্ষার অভিনয় হইতেছিল। Esop's Fables এ The sun and the wind গল্পে বর্ণিত পথিকের চিত্রটী যাঁহাদের হুবহু স্মরণ আছে, তাঁহারা আমাদের পূর্ব্বদিনের অবস্থা ধারণা করিতে পারিবেন।

* * * *

লক্সার জংসনে গাড়ী থামিলে সাগ্রহে যৎকিঞ্চিৎ পানভোজন করিয়া লইলাম। আর ১৭ মাইল উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই 'তীর্থানাং প্রবরং তীর্থং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্' হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিব, তখন এই সাগ্রহ প্রতীক্ষাতেই সকলের চিত্ত উল্লসিত ছিল। আজ মহালয়া। কেহ কেহ ইতিমধ্যেই জল্পনা কল্পনা করিয়া মনস্থ করিলেন যে, হরিদ্বারে নামিয়াই গঙ্গাস্নানের পর পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ করিবেন, কেননা এরূপ স্থানকালের সুসংযোগ

সচরাচর সুলভ নহে। সমাজ সংস্কারের দ্বারা গঠিত Morris Read এর এ কথায় মূল্য বুঝিতেছি। এই সংস্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। আমাদের দেশে মানুষ অপেক্ষা শাস্ত্রই বড়, শাস্ত্রকে বড় করিয়া দেখি বলিয়াই শাস্ত্র আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহে।

প্রায় ৭টার সময় গাড়ী হরিদ্বারে আসিয়া থামিল। প্লাটফরমের বাহিরে আসিয়া টাঙ্গায় মালপত্র বোঝাই করিতেছি, এমন সময় উপর্য্যুপরি কতিপয় পাণ্ডাঠাকুরের পাল্লায় পড়িতে হইল। তাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্য প্রস্রবণ এরূপ তুমুলধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, তাহার গতিবেগ ধারণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল! কিন্তু ক্রমশঃ ভগ্নমনোরথ হইয়া আর সকলে বিদায় লইলেও অল্পবয়স্ক একটী পাণ্ডা নাছোড়বান্দা হইয়া অবশেষে আমাদের গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল। তবে তাহাকে আর বেশীদূর দৌড়াইতে হইল না, অনুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের মধ্যে একজন তাহাকে গাড়ীর ভিতর উঠাইয়া লইলেন। কথোপকথনে তাহাকে বেশ ভদ্র, বিনীত ও সন্তোষী বলিয়াই বোধ হইল। ঠাকুরের নাম গন্নালাল কুম্ভকরণ, ঠিকানা সরবনাথ ঘাট, চরণপাদুকা হরিদ্বার।

মহারাজ ভোলানন্দ গিরির ধর্ম্মশালায় আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দুইটী ধর্ম্মশালা আছে; একটী গঙ্গার তীরোপরি, অপরটী ইহার সম্মুখবর্ত্তী,—মধ্যে একটী রাস্তার ব্যবধান মাত্র। অতি সন্নিকটেই হাটবাজার ও ডাকঘর এবং অনতিদূরেই তাঁহার যোগাশ্রম। ভোলানন্দ গিরি অনেকদিন হইল সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, এখন তৎশিষ্য মহারাজ মহাদেবানন্দ গিরিই আশ্রমের অধ্যক্ষ। সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎপরিচয় হইল। নানা কথার মধ্যে তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, বেদ-অধ্যয়নের জন্য তিনি দুই-তিনজন ছাত্র ভিন্ন অধিক সংখ্যক ছাত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কেননা স্থানীয় শিশুদিগের অভিভাবকেরা এখনও বেদের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে শিখেন নাই। বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞ এখানে নিত্য নিয়মিতই হয়। আশ্রম-মধ্যস্থ যজ্ঞকুণ্ড দেখিয়া মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। গঙ্গাতীরস্থ এই উটজপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আমার বৈদিক যুগের তপোবনচ্ছবি চিত্তপটে উদ্ভাসিত হইল; মনে হইল, কালের গতি সহসা যেন অযুতবর্ষ পিছাইয়া গিয়াছে :—

জ্বলে সান্দ্র সায়াহ্নে হোমের বহ্নি,
স্বর্ণচূড় ধূমপুঞ্জ,
যেন গোত্র-সানুতে স্থানুর নেত্র—
ফুল্ল কুসুমকুঞ্জ।
ঐ উটজাঙ্গণে মৌনী ধেনু,
আশ্রম-মৃগ মন্থর ;
রাজে কুশ-আসনে ধ্যানমগ্ন
তাপসী শুভ্র-অম্বর।
তথা কম্প্রকণ্ঠে সূক্ত গাহে
মহর্ষিরা হেমতনু ;
শোভে বিশদ ভালে তপোভর্গ—
অব্জ-আঁখি প্রেমধনু।
ঐ যজ্ঞ হইতে বারিবর্ষ,
জন্মে তাহে ক্ষুধার অন্ন ;
পুনঃ অন্ন হইতে জীবোৎপন্ন—
আর্য্যঋষি উদার ধন্য।

অতঃপর ব্রহ্মকুণ্ডে (১) গিয়া স্নান হইল। এই ঘাটটীর একটুকু ইতিহাস আছে। যাত্রিগণের বিশ্বাস, এই ঘাটে অবগাহন করিলে পুনর্জন্ম হয় না। (২) ঘাটটী 'হরি-কি-পৈড়ী, 'ব্রহ্মকুণ্ড' ও 'গঙ্গাদ্বার' বলিয়াই খ্যাত।

(১) ঘাটটীর নাম ব্রহ্মকুণ্ড কেন হইল, সে সম্বন্ধে কোনও জনশ্রুতি প্রচলিত নাই। পৌরাণিক যুগে গঙ্গা যে ব্রহ্মাকমণ্ডলু মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, হয়ত সেই আখ্যান চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য উক্ত নামকরণ হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে, ইহাই ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড।

(২) মহাভারত পাঠে জানিতে পাদি,—কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গাদ্বারে স্নান ধ্যান করেন (আশ্রমবাসিক পর্ব্ব, ৩৭ অঃ, ১০ শ্লোক)। গঙ্গাদ্বারবাসী মহর্ষি ভরদ্বাজ একদিন গঙ্গাস্নানে আসিয়া অপ্সরা ঘৃতাচীর রূপযৌবনে প্রমুগ্ধ হন (আদি, ১৩১ অঃ, ৯-১১ শ্লোক, ঐ, ১৬৭ অঃ, ১-৩ শ্লোক)। বনবাসী অর্জ্জুন গঙ্গাদ্বারে স্নানার্থ আসিয়া নাগরাজ কৌরব্যের কুমারী কন্যা উলুপীর মনো বাঞ্ছা পূর্ণ করেন (আদি, ২১৫ অঃ, ৬শ্লোক)। রাজা প্রতীপ বহুকাল গঙ্গা দ্বারে থাকিয়া জপতপ করেন (আদি ৯৭ অঃ, ১ শ্লোক)। অগস্ত্য ঋষি ভার্য্যাসহ গঙ্গাদ্বারে আসিয়া তপস্যা করেন (বন, ৯৭ অঃ, ১১ শ্লোক)। জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে আসিয়া মহাদেবের বরলাভার্থ কঠোর তপস্যা করেন (বন, ২৭২ অঃ, ২৫ শ্লোক)। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রার পথে একবার গঙ্গাদ্বার অতিক্রম করেন (বন, ১৫৬ অঃ, ৯ শ্লোক)। পাণ্ডুপুত্রগণ কৈলাসগমনের পথে গঙ্গাদ্বার পরিদর্শন করিয়া যান [বন, ১৪২ অঃ, ৯-১১ শ্লোক]।

পদ্মপুরাণে আছে—

"গঙ্গাদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
স্নাত্বা কনখলে তীর্থে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" [৩]

আবার শ্রীমহাভাগবত বলেন,—

"হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসিন্ধুসমাগমে।
মহাফলপ্রদা গঙ্গা তস্মাত্তত্র বিশেষতঃ॥
যত্নতঃ স্নানদানাদীন্ কুর্য্যান্মর্ত্ত্যো ...।" (৪)

মহাভারতকার বলেন—

"স্বর্গদ্বারেণ যত্তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ॥" (৫)

আবার কুম্ভযোগে স্নান করিতে পারিলে, স্নায়ী হয়ত সশরীরে স্বর্গলাভ করিবেন। (৬) শাস্ত্রে আছে,—

"পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভরাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেৎ যোগঃ কুম্ভনাম্না তদোত্তমঃ॥

অর্থাৎ—সূর্য্য মেষরাশিতে এবং বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে সংক্রমণকালে হরিদ্বারে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

এই কুম্ভমেলা প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর হইয়া থাকে। তখন যে এখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয় তাহা না বলিলেও চলে। (৭) সেই দুর্গম লোকারণ্যের মধ্যে কত নিরীহ প্রাণীই যে পদদলিত ও শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করে করিয়াছে? কিন্তু সেই জনসঙ্কুলঘাটের দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে সহজে প্রত্যয় হইবে না। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে প্রথম স্নানের অধিকার লইয়া গোস্বামী ও বৈরাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দারুণ দাঙ্গা হয়, তাহাতে অন্যূন ১৮,০০০ লোকে নিহত হইয়া ছিল (৮) ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে শিখযাত্রীদিগের হস্তে প্রায় ৫০০ গোস্বামীর গঙ্গাপ্রাপ্তি

ঘটে (৯) পুলিশ কর্ম্মচারিগণ তদবধি শান্তি-সংস্থাপনে কখনও শিথিল প্রযত্ন হন নাই, কিন্তু সেই উদ্দাম জনপ্রবাহকে শাসন-সংযত রাখিতে গিয়া তাঁহাদের মধ্যে কতজন যে সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছেন তাহার ঠিকানা নাই। (১০) ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবেও কত তীর্থযাত্রীর যে প্রাণহানি ঘটিয়াছে তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। কিন্তু সহৃদয় সরকার-বাহাদুরের কৃপা-কটাক্ষের ফলে ১৮৯২ সাল হইতে অনেক স্বাস্থ্যানুকূল পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই ঘাটের ১০০ ফুট লম্বা ৬০টী সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া সরকার-বাহাদুর পুণ্যার্থী যাত্রিবর্গের অশেষ ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন।

কুম্ভমেলা ব্যতীত প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে সূর্য্য যখন মেষ-রাশিতে অবস্থিত হন তখন এখানে একটী সাধারণ মেলা হইয়া থাকে। তাহাতেও লক্ষ লোকের ভীড় হয়। স্নানার্থীরা ভাগীরথীর পূতপ্রবাহে স্নান করিয়া উঠিয়া মনে করেন তাঁহারা যথার্থ যোগস্নান করিয়াছেন, কিন্তু আসল কথা বলিতে কি, "this day no longer corresponds with the vernal solstice. as the Hindu calendar ignores any correc tion for the precession of the eyuinoxes Their new year's day has accordingly gradually receded from the true period, until thc differenee is now as much as 21 days." (১১)

(৩) উত্তরখণ্ড, ৮১ অঃ, ৪০ শ্লোক।

(৪) ৭৩ অঃ ৩৭-৮ শ্লোক।

(৫) বনপর্ব্ব, ৮৪ অঃ, ২৭ শ্লোক।

(৬) হুয়েন-সাঙ্ এই সময়ের গঙ্গাকে 'মহাভদ্র' বলিয়াছেন।

(৭) এইসময়ে নানা দিগ্‌দেশাগত শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, সাধু, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, পরমহংস, নাগা, অবধূত, রামাৎ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ইতিহাস গবেষণার বিষয়।

(৮ Asiatic Researches, vol. xvii. P. 209.

(৯) Asiatic Researches, vol. vi, P. 318.

(১০) ১৯২৮ সালের কুম্ভমেলার সময় একটা অবরোধ ধসিয়া যাওয়ায় বিস্তরলোকের অপমৃত্যু হয় (Murray's Handlook for India, Burma & Ceylon, 1929, P. 421)।

বহু দূরদিগ্দেশ হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে সমাগত হইত তাহা হুয়েন-সাঙ্ও তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১২) হরিচরণ দাসের "চহার গুলজার শুজাই" গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ১১৯৮ হিঃ (১৭৮৪ খৃঃ) বৈশাখী মেলায় দারুণ দৈবদুর্য্যোগের ফলে ১,৫০০ নরনারী প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় (১৩)।

স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা, গঙ্গাদেবীর জাগতিক জন্মবার্ষিক উৎসব উপলক্ষেই প্রতি বৎসর এই মহামেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি,—

"বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং দিনার্দ্ধকে।
গঙ্গা সমভবৎ শুক্লা সুচারুমুখপঙ্কজা॥" (১৪)

অথবা

"বৈশাখে মাসি শুক্লায়াং তৃতীয়ায়াং দিনার্দ্ধকে।
বভূব দেবী সা গঙ্গা শুক্লা সত্যযুগাকৃতঃ॥" (১৫)

Atkinson লিখিয়াছেন, এই মেলায় পঞ্জাব ও রাজপুতানার দূর দিগ্দেশ হইতে স্নানার্থ বহুযাত্রীর সমাগম হয় (১৬)। গুজরাটী শৈবদের তো কথাই নাই (১৭)। Captain Skinner তাঁহার Excursions in India গ্রন্থে হরদ্বার-মেলার একটী সুন্দর বিবৃতি দিয়াছেন। যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর "তীর্থভ্রমণ" গ্রন্থের বর্ণনাও উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সমাপন করিয়া তাহার দক্ষিণে কুশাবর্ত্ত ঘাটে (১৮) যাত্রীদিগকে দলে দলে উপনীত হইতে দেখিলাম। ঐ স্থানে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান শাস্ত্রমতে মহাপুণ্যকর। কোন্ কোন্ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ বহুফলপ্রদ হয়, মৎস্যপুরাণে তাহার নিম্নলিখিত উল্লেখ আছে,—

(১১) Cunningham, Archaeologieal Report vcl. ii, p. 235

(১২) মামুদ এবং তৈমুরের যুগেও যে কুম্ভমেলা হইত তাহা আল-উতবী ও সরফউদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন! "আইন-ই-অকবরী"তেও কুম্ভমেলার উল্লেখ আছে।

(১৩) Elliot's Histary of India vol. viii 1877 p. 230 (ed. john Dowson)

(১৪) শ্রীমদ্ভাগবত, ১৩ অঃ, ৭ শ্লোক।

(১৫) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ১৫ অঃ, ৪ শ্লোক।

(১৬) N. W, P. of India, 1875 vol .ii pt. i, p. 284.

(১৭) Bombay Gazetteer, vol. ixpt. i, p. 549.

"দশাশ্বমেধিকং পুণ্যং গঙ্গাদ্বারং তথৈব চ।
নন্দাথ ললিতা তদ্বৎ তীর্থং মায়াপুরী শুভা॥
তথা মিত্রপদং নাম ততঃ কেদারমুত্তমম্।
গঙ্গাসাগর থিত্যাহুঃ সর্ব্বতীর্থময়ং শুভম্॥" (১৯)

অধিক কি, পদ্মপুরাণে বলেন,—

গঙ্গায়াংয়াং পিণ্ডদানেন পিতৃণাং বৈ তিলোদকৈঃ।
নরকস্থা দিবং যান্তি স্বর্গস্থা মোক্ষমাপ্নুয়ুঃ॥" (২০)

স্নানদান করিতে করিতে বেলা অনেক হইয়াছে। মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপে তথা সর্ব্বগ্রাসী লেলিহান উদরানলের জ্বালায় আমি আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলাম না। এ বেলায় রন্ধন ভোজনের কিছু ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে না পারায় অগত্যা আমাদিগকে গিরি মহারাজের লাল-তারাবাগ আশ্রমের আতিথ্যস্বীকার করিতে হইল। তত্রত্য পরমান্ন-ভোজনের সুস্বাদ জীবনে কখনও ভুলিব না। আশ্রমাদিগের বিনয়নম্র বাক্যালাপ চিত্তে যে বিমল আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল তাহা লেখনীমুখে প্রকাশ করিবার নহে। যাহাহউক, অতঃপর জঠর বৈশ্বানরকে পরিতৃপ্ত করিয়া আশ্রম সম্মুখস্থ গঙ্গাতটে বৃক্ষশ্রেণীর সুশীতল ছায়ায় বসিয়া চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যসুধা আকণ্ঠ পান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া পড়িলাম। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন—

"ঢুলে অপরাহ্ণ-কায়া, আছে রৌদ্র-আবছায়া,
গিরিবন অন্তরালে কাঁপে দিনকর;
বনেতে কলিকা ফুটে, সমীর আবেগে ছুটে,
হৃদয় উথলি উঠে সৌরভে সুন্দর!
বনতুলসীর গন্ধ, লভিয়ে ভ্রমর অন্ধ,
আশে পাশে চারিধারে করে গুঞ্জরণ;
স্তব্ধতা নামিয়া আসে, তেয়াগি বিমান-বাসে,
স্তিমিত সাঁজের ছায়ে প্রশান্ত ভুবন।"

(১৮) কুশাবর্ত্ত ঘাটের একটা কিংবদন্তী এই যে, পিতৃতর্পণ কালে মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের হস্তস্থিত কুশ গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া যায়। অতঃপর মুনিবর যোগ-বলে গঙ্গার ধারাকে আবর্ত্তন করাইয়া কুশ পুনরানয়ন করান। তদবধি ঘাটটীর নাম 'কুশাবর্ত্ত' হইয়াছে।

শিবপুরাণের মতে মহর্ষি গৌতম গঙ্গাদেবীর আদেশক্রমে গঙ্গাদ্বারের নিম্নভাগে কুশাবর্ত্ত তীর্থ রচনা করেন। এই অনুত্তম তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্যের মোক্ষ লাভ হয়,—

"কুশাবর্ত্তঞ্চ বিখ্যাতং তীর্থমাসীদনুত্তমম্।
তত্র স্নাতো নরো যস্তু মোক্ষায় পরিকল্পতে॥"
(জ্ঞানসংহিতা, ৫৪ অঃ, ৪০ শ্লোক)

(১৯) ২২ অ, ১০-১১ শ্লোক। (২০) সৃষ্টিখণ্ড, ৬২ অঃ, ৩৪ শ্লোক।

(ক্রমশঃ।

বহুমূত্র।

ডাঃ সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এম, ডি, কে, টী,।

যদি কেহ আমায় জিজ্ঞাসা করেন,—বঙ্গদেশের অধঃপতন হইল কিসে? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব,—ম্যালেরিয়া আর বহুমূত্র-রোগে। এই দুইটী ব্যাধি আমাদের দেশের প্রবল শত্রু। কিন্তু ম্যালেরিয়া অপেক্ষাও বহুমূত্র আমাদের প্রবল শত্রু। ম্যালেরিয়ায় ছোট, বড়, ভদ্র, অভদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত,—কত রকম লোক মরে, আর বহুমূত্র রোগে যাঁরা মরেন তাঁরা এদেশের গণ্যমান্য লোক। যে সকল মহাত্মা দীর্ঘজীবী হইলে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল হইত, বাঙ্গালার সমাজ শ্রীসম্পন্ন হইত, এই কালোপম কঠোর বহুমূত্র রোগ দেশের সেই অমূল্য রত্নগুলিকে একে একে আত্মসাৎ করিতেছে। বহুমূত্রের আক্রমণে বঙ্গ-জননীর ক্রোড় শূন্য হইয়া পড়িতেছে, সমাজের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঘরে ঘরে আর্ত্তনাদ ও মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিতেছে।

যাঁহাদের লইয়া দেশের গৌরব, যাঁহাদের ভরসায় বিদেশীয়কে আমরা প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করি, তাঁহাদের অকালমৃত্যুর কারণ প্রধানতঃ এই ভয়ঙ্কর বহু-মূত্র রোগ। বহুমূত্র রোগ যে শুধু দেশের ক্ষতি করিতেছে—তাহা নহে, বহুমূত্র রোগ আমাদের মাতৃভাষারও মহা অনিষ্ট করিতেছে। আমাদের "ভূদেব" "বঙ্কিম" প্রভৃতি মনীষীগণ বহুমূত্র রোগেই প্রাণ হারাইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, জানিয়া শুনিয়াও এ বিষয়ের জন্য কাহাকেও চিন্তিত দেখিতেছি না। কেহই এ সর্ব্বনাশের প্রতিকার চেষ্টা করিতেছে না। যাহারা সাহিত্যসেবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে এই ভীষণ শত্রুর করাল কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন, এই প্রবন্ধ সেইজন্য লিখিত হইল।

বহুদিন হইতে আমি দেখিয়া আসিতেছি, যাহারা সাহিত্যসেবী, হাকিম, উকীল, অথবা চিকিৎসা-ব্যবসায়ী অর্থাৎ অধিক পরিমাণে যাঁহাদিগকে মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, তাঁহারাই এই রোগে আক্রান্ত হন। ইহার কারণ, তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন না। দেশহিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হইলে দীর্ঘ জীবনের আবশ্যকতা আছে, দীর্ঘ জীবন না হইলে ব্রতধারণ সফল হয় না।

এইজন্য সাহিত্যব্রতগ্রহণকারীদিগের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁহারা যেমন মানসিক পরিশ্রম করিবেন, সেই সঙ্গে কিছু কিছু করিয়া শারীরিক পরিশ্রমেও

অভ্যস্ত হইবেন। তাহা হইলে আর বহুমূত্রজনিত ভাবী অমঙ্গলের কোনও আশঙ্কা থাকিবে না।

বহুমূত্র প্রতিযোধযোগ্য রোগ, যিনি মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন এবং পথ্যের সুব্যবস্থা ও তদনুসারিক অন্যান্য স্বাস্থ্যকর নিয়ম প্রতিপালন করেন, এ রোগ কখনই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ যে রোগ একবার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার প্রতিকার সন্দেহস্থল, সে রোগ যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি সাধারণের তীব্র দৃষ্টি রাখা উচিত নয় কি?

ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্যের সুব্যবস্থায় বহুমূত্র রোগ উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু একথা বলিবার পূর্ব্বে বহুমূত্র রোগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাহ। রোগের প্রকৃতি না বুঝিতে পারিলে তাহাকে উন্মূলিত করা বড় কঠিন সমস্যা।

কেবল বেশী মাত্রায় বা বেশীবার প্রস্রাব হইলেই তাহাকে বহুমূত্র রোগ ভাবিয়া ভয় করিও না। অথবা প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে চিনি দেখিতে পাইলেই ভীত হইও না। যাহারা অতিরিক্ত মিষ্টান্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের মূত্র পরীক্ষা করিলে প্রায়ই শর্করার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়। তবে বহুমূত্র রোগের লক্ষণ কি?

১। প্রস্রাবের পরিমাণ বেশী
২। প্রস্রাবে শর্করা
৩। শরীরের বলক্ষয়
৪। মাংস ক্ষয়
৫। গাত্র দাহ
৬। অত্যন্ত পিপাসা।

এই ছয়টি লক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হইলেই তাহাকে মারাত্মক বহুমূত্র বলিয়া স্থির করিবে। এই রোগে আক্রান্ত হইয়া যদি তাহার প্রতিকার করা না যায়, তাহা হইলে পরিণামে যক্ষ্মা, ব্রণ রোগ (পৃষ্ঠব্রণ, উরুস্তম্ভ প্রভৃতি?) বিসর্প, মূত্রগ্রন্থির পীড়া প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগে মৃত্যু ঘটে।

আমাদের দেহে যকৃৎ নামে যে যন্ত্রটী আছে, কেবল পিত্ত নিঃসারণ ও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক তাহার কার্য্য নহে। আমরা আলু গম, চাউল প্রভৃতি শ্বেতসারময় দ্রব্য ভোজন করি, তাহাদের সারাংশ শর্করায় পরিণত হইয়া যকৃতের কাছে সঞ্চিত থাকে। রক্তাদিতে যখন প্রয়োজন হয়, যকৃৎ তাহা বাহির করিয়া দেয়।

কোন রকমে যকৃৎ বিকৃত হইলে সে আর প্রয়োজন মত শর্করা যোগাইতে পারে না,—কেননা সে শর্করা আপনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখিতে পারে না। সুতরাং আহার্য্যজাত শর্করা সমস্তই রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। শর্করার গুণ মূত্রকারক, এইজন্যই মূত্রের ভাগ বৃদ্ধি হয়, এবং তাহা হইতে পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। খাদ্যদ্রব্যের যে যে অংশ শরীর পোষণের সাহায্য করে, যদি প্রস্রাবের দ্বার দিয়া তাহাই বহির্গত হইয়া যায়, তাহা হইলে, বস্তুতঃ মাংস-ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী।

এই রোগের বলবৎ কারণ মানসিক আঘাত। সর্ব্বশরীরব্যাপী স্নায়ুমণ্ডলের আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তিতে Deppresion এবং শোকমোহাদিতে রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। যে কোন প্রকারে হউক, স্নায়ুমণ্ডল আঘাত প্রাপ্ত হইলেই—এ রোগ হয়। যিনি কেবল অন্নাদি শ্বেতসারময় দ্রব্য আহার করেন অথচ কায়িক শ্রমবিমুখ, যে কোন কারণে হউক তাঁহার বহুমূত্র রোগ জন্মিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের লেখকগণ যদি পুষ্টি কর খাদ্য ভোজন করেন, এবং মানসিক ও শারীরিক শ্রমের সামঞ্জস্য রক্ষা করেন তাহা হইলে আর ভুগিতে হয় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বহুমূত্র রোগ ঔষধের চেয়ে পথ্যের ব্যবস্থায় সারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এ রোগে কোন্ কোন্ দ্রব্য পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে? ইহার উত্তর, যে রোগে প্রস্রাবে চিনি জন্মে, সে রোগে যাহাতে চিনি উৎপন্ন—হয়—তেমন দ্রব্য ভোজন করা উচিত নহে। চাউল, চিনি, শ্বেতসারময় দ্রব্য এ রোগে সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আপনারা হয় তো বলিবেন, তবে কি খাইয়া অন্নগতপ্রাণ বঙ্গবাসীর প্রাণ রক্ষা হইবে? কিন্তু অন্নের মায়া না ছাড়িলে প্রাণের মায়া যে ছাড়িতে হয়।

যাঁহারা বহুমূত্র রোগের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্নের ব্যবস্থা গুলি যথাসাধ্য পালন করিবেন। ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।

১। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিতে হইবে। যিনি ব্যায়াম করিতে পারিবেন না, তাঁহাকে প্রত্যহ অন্ততঃ ৪ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইবে।

২। মেদোময় ও যবক্ষারজানময় দ্রব্য অর্থাৎ মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ঘৃত, মাখন শাকসব্জী, পটোল, ডুমুর, কুমড়া, শশা, মোচা, থোড় প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন। ফলের মধ্যে ঈষৎ অম্লরসযুক্ত ফল ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু মিষ্ট ফল একেবারেই নিষিদ্ধ।

৩। কেহ কেহ দুগ্ধ ব্যবহার করিতে বলেন, আমি কিন্তু এ মত সমর্থন

করি না। আমার আপত্তির কারণ, দুগ্ধে শর্করা আছে। তবে যিনি অত্যন্ত শ্রমশীল, তিনি অল্প অল্প দুগ্ধ পান করিতে পারেন। বহুমূত্র রোগে কেবলমাত্র দুগ্ধ পথ্য দিয়া এক প্রকার চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত আছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির নাম Skimmed milk treatment। নবনীতশূন্য দুগ্ধ দ্বারা এই চিকিৎসা করিতে হয়। দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিতে গেলে তাহার শর্করাংশ Lactic Acid এ পরিণত হয়, এই এসিড বহুমূত্র রোগে উপকারী।

৪। ছোলাকে জাঁতায় ভাঙ্গিয়া আটা প্রস্তুত করিয়া সেই আটার রুটি কিম্বা লুচি ভক্ষণ করিবেন। এমন উপকারী পথ্য খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। প্রত্যহ প্রাতে ৪ আউন্স আন্দাজ জলে ১০।১৫ ফোঁটা লেবুর রস দিয়া পান করিবেন।

৬। প্রত্যহ একবার মেরুদণ্ডের উপর শীতল জল মাখাইবেন।

৭। যে দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, অথচ পুষ্টিকর, তাহাই ভক্ষণ করা উচিত। যাহাতে পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত না হয়—সে বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই।

৮। লবণসংযুক্ত ঘোল পান করিলে অনেক সময় উপকার হয়।

৯। চিন্তার কার্য্য বাড়িলে সঙ্গে সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইতে হইবে।

এই নিয়ম গুলি পালন করিলে যাহারা এ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের দেহ নিরাময় হইবে; যাহারা আক্রান্ত হন নাই, ভবিষ্যতে তাঁহাদের আর আক্রান্ত হইবার ভয় থাকিবে না।

হাকিম, উকীল, চিকিৎসক প্রভৃতির চেয়ে লেখক সম্প্রদায়ই এ রোগে বেশী আক্রান্ত হন। কারণ, সরস্বতীর বরপুত্রগণের প্রতি কমলার সাপত্ন্যদ্বেষ চির প্রসিদ্ধ। সুতরাং লেখক সম্প্রদায় প্রায়ই দরিদ্র হইয়া থাকেন। দরিদ্রের পক্ষে পুষ্টিকর আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ নহে। এই জন্য দরিদ্র লোকগণকে আমি মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিবার পরামর্শ দিই। পরিশ্রমের প্রতি তাঁহারা যেন শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। দেশের মুখ চাহিতে গেলে দীর্ঘজীবনের যতটা প্রয়োজন, অকালমৃত্যু ততটা বাঞ্ছনীয় নহে।

সিঁথির সিঁদুর।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু

নাম রেখেছিলুম উল্কা। ক্রমশঃই বিয়ের বয়েস এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, এদিকে আমার চক্ষু ছানাবড়া। আইবড় মেয়ে চিরকাল পুষে রাখা লোকভয়ের অনুলোম, সাধারণ সমক্ষে মুখ দেখান লজ্জাকর,—তাই বে' দিতে হ'লো অনেক করে'গলবস্ত্র হ'য়ে বেহাই-মশায়ের বৈঠকে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে'! আজকাল বরপণপ্রথা যে ভগ্ন সমাজের কতখানি ধ্বংসোন্মুখী ব্যবস্থা, সে যাঁরা আমার মত সমঅবস্থাসম্পন্ন—ন যযৌ ন তস্থৌ—তাঁরাই হাড়ে-মাসে বুঝ্‌ছেন, কেমন করে' ভিটে-মাটী চাটি করে' বরপক্ষের শ্রীশ্রীপদপল্লবমুদারমে ডালি দিতে হয়, কেমন ক'রে বার মাসে তের পার্ব্বণোপলক্ষে জামাইবাড়ী রকমফের তত্ত্ব-তাবাস ক'রতে হয়, কাণা কপর্দ্দকটী অবধি পুঁজিখালি করে'—ইত্যাদি। ওঃ সে উপমা দিয়ে বোঝান যায় না—এ গরীবের অর্থসিন্ধুশোষণ যেন জহ্নুমুনির গণ্ডুষ! বিদুরের সামান্য ক্ষুদকুঁড়াতেই গোলোকের নারায়ণ তুষ্ট, কিন্তু এ বুভুক্ষু রাক্ষসরূপী বর-পাত্রের ভুখা যেন অসঙ্গতরূপে সর্ব্বভুক্ বৈশ্বানরের জঠরাগ্নি—কিছুতে আর মিটবার নয়!

মা-হারা এই মেয়েটীকে দেখ্‌লে যে অতি পাষাণের প্রাণেও শোকের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়, এ কথা তার বাপকেও স্বীকার ক'রতে হ'বে! আহা, উল্কা, অভাগী কন্যা আমার, অযত্নপালিতা অনাদৃতা,... তার কথা কি আর বল্‌ব—অশ্রুর উৎস যে রুদ্ধ রাখা যায় না কোনরকমে! সেই তার সুন্দর যৌবনসুলভ কমনীয় কান্তি, সেই তার টানা-টানা কাজল-চক্ষুর ব্যথামাখা করুণ চাউনি, ভ্রমর-কালো কোঁকড়া-কোঁকড়া চুলের গোছা, কচি অধরের প্রেম-তৃষা, তরুণ প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মিলন-ঝঙ্কৃতির পূর্ব্বরাগ,—কে বল দেখে-শুনেও নিশ্চিন্ত রইতে পারে? বিশেষতঃ পিতা হ'য়ে আমিই বা কেমনে থাকি? তাই বিয়ে দিলুম লালচলোলুপ বরপণ চরিতার্থ করে সঙ্গে-সঙ্গে!

সর্ব্বস্ব-ছাড়া কাঙাল হ'লুম, তবু দুঃখের মাঝেও একটা আনন্দ সময়ে সময়ে পাই, আর সেইটেই আমার অনন্ত সান্ত্বনা যে, আজ আমি আমার নিঃসঙ্গিনী মেয়েটীর জীবনে সুখের সরিতের সন্ধান দিয়েচি, তার পথপ্রদর্শক বিধান করেচি, কামনার কামধেনু—সুখের কল্পতরুর কল্যাণ-কলি প্রদান করেচি, অমর

রূপে-গুণে সোনারচাঁদ স্বামী পেয়েচে সে, অমন হর্ম্ম্য-অট্টালিকার মাঝে শুভ্র-ফেননিভ শয্যার শান্তিমহল, সর্ব্বোপরি স্বামীর অফুরন্ত প্রেম সোহাগ—এর চেয়ে সে আর কি সৌভাগ্যের কল্পনা ক'র্‌তে পারে ?

কিন্তু না—তার ভাগ্যচক্রবালের আব্‌ডালে বসে' কে যেন স্বপ্ন-সূত্রে বিলোম অভিসন্ধি সৃজন ক'র্‌ছিল—প্রাচীতে উষার আকাশে অরুণোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই রাহুকেতুর উপস্থিতি—কি বিষম !

—নবমন্ত্রে নবতন্ত্রে দীক্ষিত শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ে আজকাল প্রতীচ্যের রঙ্গিল আলোক নেশায় পিতৃমাতৃভক্তি বলে' একটা অভিধানের একান্ত অভাব দাঁড়িয়েচে ! এটাও যে সমাজে উদ্দাম ধূমকেতুর অবারিত উৎপাত—কে না স্বীকার ক'র্‌বে ?

বাড়ীর সঙ্গে সকল সংস্রব চুকিয়ে দিয়ে কোন্ চুলায় চলে' গেল জামাই আদরিণী স্ত্রীকে পায়ে ঠেলে ! উল্কা স্বামীর দু'টী পদ জড়িয়ে ধরে' কত চেষ্টা করেছিল, বসদ্বাটীতেই আটকে রাখ্‌তে, কিন্তু হায়—বনের বাঘকে কোমল কিরাত হ'য়ে কেমনে বন্দী ক'র্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে সে ?

তারপর উল্কার সে কি কঠিন পীড়ার উপসর্গ ! শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী ফির্‌ল সে—চার্ব্বঙ্গী তন্বী সে মুকুলে মজেছে—জীবনের প্রত্যাশা বড় কম—তার ওপর কত ভাবনা কত চিন্তা—স্বামীর উদ্দেশে উতলা আকুলি-বিকুলি তার—ঘুম নেই, নিদ্রা, নেই—সে কি নিঝুম ভাব সবক্ষণ মর্ম্মান্তিক মুমূর্ষু যন্ত্রণা—

এর উপশম কোথায় ? চম্‌কে উঠ্‌ল সে—প্রলাপ ব'ক্‌ছে "এসেচ, এসেচ, এই যে যাই, যাই, একটু দেরী, তিনি তিনি—" কি ঘোরতর বিভীষিকার ঘনঘটা ঘরময় ভূতের মত লাফালাফি বাড়িয়ে তুললে—ঐ যেন সে স্বপ্ন দেখ্‌চে "ঈশ্বরের এজলাসে আগাগোড়া বিচার হচ্ছে, চিত্রগুপ্ত তাঁর অসীম জোড়া রোজনামচা খুলে বসেচেন, অনন্ত নক্ষত্রপুঞ্জ সাক্ষ্য দিচ্চে, তেত্রিশ কোটী দেব-দেবতার একত্র সমাগম হয়েচে,—উল্কা আর "সে" কানাকানি দাঁড়িয়ে ! সমাধিক্ষেত্রের মত নিথর নিবিড়তা বিস্তৃত সেখানে সত্য-মিথ্যার তরাযু-তৌল—একরতি কমবেশী নেই—এতই ন্যায্য এতই ঠিক !"

যাক্ ! তার শেষ-স্মৃতি পড়ে' আছে আজও তার স্বামীর দেরাজে—সেই তার চুলবাঁধা-বাক্সে আর্শি, চিরুণী, লোহা, শাঁখা, কাঁটা, ফিতে, সিঁদুর-কৌটা, পাউডার, আল্‌তা, আতর, কুঙ্কুম, তেলমাখা ইত্যাদি···;—ফির্‌লে "সে" দেখ্‌তে পাবে...পরিতাপ বিনা অন্য প্রায়শ্চিত্ত দেখি না !

আর্দ্রক বা আদা ।

লেখক,—কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ রসায়নশাস্ত্রী ।

আর্দ্রকের বাংলা নাম আদা, হিন্দি-ভাষায় ইহাকে আদ্‌রক, গুজরাটে আদু এবং ডাক্তারী জিঞ্জারুট বলে। ইহা একপ্রকার চারা জাতীয় গাছের কন্দ। শরৎকালে ইহার প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে। আদা, শঠী, হল্‌দী, এরা-রুট প্রভৃতির গাছ ও কন্দ প্রায় একই রূপ, রঙ্গে কিছু তারতম্য লক্ষ্য হয়। জলাস্থানাপেক্ষা উচু স্থানীয় পুরাণ আদার গুণই বেশী। গুণে, গন্ধে ও স্বাদে ইহা উপাদেয়, এজন্য দেশে দেশে আদা বিবিধ প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণজ্বর, দাহ প্রভৃতি রোগে আর্দ্রক ব্যবহার্য্য। সাধারণতঃ ইহা রুচিকারক, মৃদুবিরেচক, সামান্য ভারী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, আগ্নেয়, কটু (পরিপাক হইলে মধুর), অল্পরুক্ষ, বাত ও কফ নাশক।

কবিরাজগণ বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ও নানাপ্রকারে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ গৃহস্থগণও ইহা বহু রকমে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কফ বা বাত-জৈষ্মিক অরুচি হইলে লবণের সঙ্গে আদার টুক্‌রা চিবাইলে অবিলম্বে তাহা দূর হয়। পাতি বা কাগজী লেবুর রস, আদার রস ও সৈন্ধব লবণ একত্রে প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে অরুচি অগ্নিমান্দ্য রোগ দূর হয়। কতকগুলি আদার টুক্‌রা লেবুর রসে সিক্ত করিয়া তাহাতে সমস্তের দ্বিগুণসৈন্ধবচুর্ণ মিলাইয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিবে, পরে উহা ঘন হইলে বোতলে পুরিয়া রাখিবে। ইহাকে আদার আচার বলে। অরুচি, অগ্নিমান্দ্যে ইহা প্রাতে, অজীর্ণে ভোজনাগ্রে, মধ্যে ও অন্তে উত্তম রূপে চিবাইয়া খাইলে বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিলে ঐ আচার নষ্ট হয় না। গুরুপাক দ্রব্যে রান্নার সময় আদা বাঁটা দেওয়ার যে প্রথা আছে, উহা অতি উত্তম। সোডাওয়াটারের সঙ্গে আদার রস দিয়া যেজিঞ্জার প্রস্তুত হয় উহা সোডাওয়াটারের চেয়ে উত্তম, কেননা সোডা স্নিগ্ধ, উহার সঙ্গে আদা থাকিলে বেশী স্নিগ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং জ্বরাদি শৈত্য রোগেও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নূতন পুরাতন জ্বরে আদার রস ও মধু খুব উপকারী। নিউমোনিয়া বা কাসিতে আদার রস বিশেষ ফল প্রদান করে। কফ নিঃসরণ না হইলে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব সহ আদার রস সেবন করাইলে কফ সহজে উঠিতে থাকে; আর মধুসহ প্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মা জন্মিতে পারে না। আমাশয় রোগে পেট কামড়ানি থাকিলে আদা বাটিয়া উহা গরম করতঃ নাভি মূলে

উহার প্রলেপ দিলে তখন উপশম বোধ হয়, পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যে রোগও আরোগ্য পথে যাইতে থাকে। শিশু ও বালক দিগের পেটকামড়ানিতে যোয়ান ও সৈন্ধব সমভাগে আদার রস সহ বাঁটিয়া আগুণে কিঞ্চিৎ ফুটাইয়া শিশুকে এক হইতে দুইরতি বালককে ২—৬ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে মল শোধন, পাকক্রিয়া ও ঐ রোগ নিরাময় হয়। মাত্রা বিশেষে যুবক বৃদ্ধগণও ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। সান্নিপাত জ্বরে মস্তকে পান ও আদা বাঁটার প্রলেপ বরফ বা জল হইতে উপকারী।

প্রত্যহ আদার ব্যবহার যে ম্যালেরিয়ার দোষ নাশক ইহা অনেকেরই মত। আদাও ছোলাভিজা বা আদা মুড়কি খই প্রাতের উত্তম জলপানীয়।

শুণ্ঠী। শুষ্ক আদাকে শুণ্ঠী বলে। শুণ্ঠীর গুণ প্রায় আদারই মত। বিশেষ এই যে উহা মল বা শরীরের জলীয়াংশ শোষণ করে, মলরাশিকে স্থানান্তর হইতে একত্র করে এবং অগ্নিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মল নিঃসারণ করে। এজন্য আমাশয়, আতসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য রোগে শুণ্ঠী উত্তম ঔষধ। কিন্তু পিত্ত প্রধানাবস্থায় উহা অব্যবহার্য্য। শুণ্ঠী মধু সহ উষ্ণবোধ হইলে মিশ্রার রস সহ ব্যবহার করিবে। যাঁহাদের দুগ্ধ সহ্য না হয়, তাঁহারা দুগ্ধে শুঁঠ চুর্ণ বা শুঁঠ সহ দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কোন অপকার বোধ করিবেন না।

আদ্রকে ঔষধ ও পথ্য উভয়ই আছে, এই বিবেচনায় আজকাল আদার বাতাসা নামক একপ্রকার খাদ্য বাহির হইয়াছে। উহা প্রায় রোগেই পথ্য রূপে ব্যবহার হইতে পারে। উহা বলকারক অথচ লঘু। এজন্য জ্বর, কাস, আমগ্রহণী, ক্লাম, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে উত্তম ফল দর্শাইয়া থাকে। নিত্যব্যবহার করিলে ঐসব রোগের কোনও ভয় থাকে না। উহা সুগন্ধি ও সুস্বাদু; সেবনেও কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না। বালক বালিকা গণের ইন-ফ্যাণ্টাইল, লিভার, ক্রিমি, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগে ইহা নিসন্দেহে ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুগ্ধের সঙ্গে ব্যবহার করিলে দুগ্ধ হজম ও সুস্বাদু হইবে।

গুরুভক্তির পরিণাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় **কাব্যরত্নাকর।**

গজেন্দ্র ঠাকুর অবিবাহিত। তাহার কারণ তাঁহার ন্যায় সুপাত্র সকলের ভাগ্যে ঘটে না। শুনা যায়, একবার নাকি তাঁহাকে দর্শন করিতে একটি কন্যাদায় গ্রস্ত ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। গজেন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি কত দূর তাহা জানিবার জন্য মুগ্ধ-বোধ ব্যাকরণের "সহনে র্বঃ" সূত্রটি সাধিতে বলেন। গজেন্দ্র মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়াই বলিয়াছিল, "কেস্পো জা স্পানে" (কে জানে)। ভদ্রলোক হাসিয়া বলিয়াছিলেন "বেঁচে থাক বাবা বোপদেব।"

লেখাপড়ায় গজেন্দ্রের সমকক্ষ কেহই ছিল না। সহাধ্যায়ী বন্ধুবান্ধবগণ বলিত, "কিহে গজেন্দ্র বদনং" অমনি গজেন্দ্রের আস্যমণ্ডল হাস্যে ভরিয়া যাইত। বলিত, "শেষে সুন্দরং" আছে বাবা, শুধু গজেন্দ্র সেতো "লম্বোদরং" হবার পর আগে কোথা? গজেন্দ্র বলিত—মোটের উপর "সুন্দরং" বলতেই হবে কিন্তু।

গজেন্দ্র এইরূপে মা সরস্বতীর চরণে প্রণাম করিয়া অলক্ষ্মীর প্রিয় গঞ্জিকা ধূমে আসক্ত হইলেন। প্রথম প্রথম ছোট কলিকায় সাজিয়া দুই চারিজনের মধ্যেই চলিত, এখন গুড়ুক খাওয়া কলিকায় বেশ মোটা করিয়া এক ছিলিম না সাজিলে নেশা হয় না। এই গঞ্জিকা দেবীর পূজায় যে পরিমাণে অর্থব্যয় হওয়া সম্ভব, তাহা সংগ্রহ করিতে গজেন্দ্র ঠাকুর "আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু" ভাবিয়া পরের বাক্স খুলিয়া থাকেন।

এ হেন রসিকেন্দ্র চূড়ামণি হরিসাধুর পিতার শ্রাদ্ধের কর্ত্তা হইলেন। দান সাগর শ্রাদ্ধে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ আসিয়া নানাবিধ শাস্ত্রীয় পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তর পক্ষ করিলেন। গজেন্দ্রের গজবুদ্ধি সে সকল "ফাল্‌তো" কথায় প্রবেশ করিল না। সে কেবল সমাগতা নারীগণের রূপ দর্শনার্থ পুনঃ পুনঃ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিল। যেন বিশেষ গুরুতর কর্ম্মেই লিপ্ত রহিয়াছেন।

শ্রাদ্ধাদি সুনির্ব্বাহ হইয়া গেল। আত্মীয়গণ দুই চারিদিন থাকিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। গজেন্দ্র ঠাকুর নড়িতে চায় না। হরি সাধুর ভৃত্য-গণ ঠাকুরের তৈজস পত্রাদি শ্রীঘাটে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, কিন্তু ঠাকুরকে পৌঁছা-ইতে আদেশ পায়নাই। রাজ-সেবায় গজেন্দ্র দিন দিন গজেন্দ্রই হইল।

নারিকেল।

লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি।

বিধির অপূর্ব্ব সৃষ্টি পৃথিবী মাঝারে।
নারিকেল শ্রেষ্ঠ ফল নানা গুণ ধরে॥
এমন সুন্দর বল কিবা আছে ফল।
খাইতে সুস্বাদু অতি পেটভরা জল॥
তৃষিত পথিক যত গ্রীষ্মের সময়।
পরম আনন্দে লয় ইহার আশ্রয়॥
আনন্দে মানবগণ খায় এর শাঁস।
এই ফল উপকার করে বার মাস॥
নারিকেল খোলে করি হুঁকা মনোহর।
সুখেতে তামাক খায় কত শত নর॥
মালা লয়ে পাত্র করে যত নরগণ।
ছোবড়া ও পাতায় করে আহার রন্ধন॥
শাঁস হতে কত শত মিষ্টদ্রব্য হয়।
পাতা থেকে ঝাঁটা করে ঘর ঝাঁট দেয়॥
ফোঁপোল রোগীর পথ্য জানে সর্ব্বজন।
মুড়ি দিয়া শাঁস খাও সুস্বাদু কেমন॥
কাঁচা ফল ডাব, পাকা ঝুনো নাম ধরে।
নানা রূপে মানবের উপকার করে॥
পরম পবিত্র ফল ধরার ভিতরে।
সকল পূজায় লোক ব্যবহার করে॥
ডাক্তার বৈদ্যেরা আহা কত গুণ গায়।
ডাবের সুমিষ্ট জল রোগীকে খাওয়ায়॥
ঝুনোর শাঁসেতে তৈল হয় চমৎকার।
বাংলার স্ত্রীলোক করে নিত্য ব্যবহার॥
উদরের পীড়া সারে এই ফল খেলে।
এই ফল খাও সবে অন্য ফল ফেলে॥

ধন্য ধন্য ধন্য সেই দয়ার সাগর।
সৃজিলেন এই ফল অবনী ভিতর॥
পরম দয়াল তিনি দীনবন্ধু নাম।
ভক্তি ভরে কর সব তাঁহাকে প্রণাম॥

দশবার দুর্গানাম জপ।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রলোকের সহিত আমার পরিচয় হয়। কোন কার্য্য উপলক্ষে তাঁহার সহিত কয়েকদিন বাস করিতে হইয়াছিল। লোকটির একটী মাত্র পুত্র। বিষয়ী না হইলেও তাঁহার সংসার ভরণ-পোষণ উপযোগী জমি যায়গা বেশ ছিল। তাঁহার ক্ষেত্রে সংসারের আবশ্যকীয় প্রায় সমুদয় দ্রব্যই উৎপন্ন হইত। বাজার হইতে অল্প দ্রব্যই ক্রয় করিতে হইত। দুগ্ধবতী অনেকগুলি গাভীও গৃহে ছিল। ফল কথা, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিলে একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ইতিহাস মনে হইত। পুত্রাদি সাবালক ও পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, অতএব সংসার পালনে পটু। ভদ্রলোকটী পুত্র হস্তে সংসারের ভার দিয়া মধ্যে মধ্যে তীর্থপর্য্যটন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে গমন, সৎসঙ্গ ও সদালাপে কালক্ষেপ করিতেন।

লোকটী বহুভাষী ছিলেন না। মৃদু ভাবে অল্প কথা কহিতেন। একদিন বসন্ত বিকালে গ্রামের বাহিরে আমরা ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। আম্র বৃক্ষ সকল মুকুলিত। মধুকর নিকরের সুমধুর শব্দে তরুরাজি মুখরিত। কোকিল-কূজন কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে। দিবসপতি স্নিগ্ধ কিরণে প্রান্তর উজ্জ্বল করিয়া পশ্চিম গগন প্রান্তে হাস্য করিয়া অন্তর্হিত হইতেছেন। ভদ্রলোকটী কখন তরু-রাজি, কখন ক্ষেত্র, কখনওবা সূর্য্য মণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গমন করিতে-ছিলেন। যাইতে যাইতে হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া করে উপবীত ধারণ পূর্ব্বক জপনিরত হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হ'ল?" তিনি বামহস্ত দ্বারা আমাকে কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। আমি ভাবিলাম তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াথাকিবে। আমি পার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান থাকিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে জপ সমাধা করিয়া তিনি বলিলেন "চলুন"। আর একদিন গ্রামের প্রান্তভাগে ভ্রমণ করিয়া একটা প্রকাণ্ড জলশূন্য পুষ্করিণীর নিকট

গিয়া তিনি ঐরূপ জপে নিরত হইলেন। একদিন আহারের সময় যখন দক্ষিণ হস্ত জঠরাগ্নি নিবৃত্তির জন্য ব্যস্ত ছিল তখন বাম হস্তে উপবীত ধারণ করিয়া যোগ-মগ্ন হইলেন। কারণ জানিবার জন্য আমার কৌতূহল জন্মিল। আমি তাঁহাকে একদিন একান্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মধ্যে মধ্যে ওরূপ ভাবে জপ করেন, কারণ কি জান্‌তে ইচ্ছা করি, যদি আপত্তি না থাকে বল্‌বেন কি?" তিনি বলিলেন "আপত্তি কিছু নাই, তবে আমি যা বল্‌বো, আপনি প্রতিবাদ না করে শুনে যাবেন, কারণ আপনার সঙ্গে তর্কে আমি পার্ব্বো না। আমি অশাস্ত্রীয় বল্‌বো না। শাস্ত্র অযথা বিষয়ের বিধান কর্ত্তা নহেন, তাহাত আপনি জানেন।" আমি বলিলাম "আমি তর্ক কর্ব্বো না কিন্তু যা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো তার উত্তর দিবেন ত?" তিনি বলিলেন "অবশ্য"।

একদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে গৃহ মধ্যে সুখাসীন আছি আমি, বলিলাম, "আপনার সহিত এই সুখালাপের সময়। আপনার যখন তখন জপের কারণ প্রকাশ করে সুখী কর্ব্বেন কি?" তিনি বলিলেন "আপনার নিকট যখন প্রতিশ্রুত হয়েছি তখন বল্‌তেই হবে। শুনুন।" ইহা বলিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এই জগৎ ধর্ম্মেই প্রতিষ্ঠিত। ধরুন জগৎটা ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ এই বৃক্ষের মূল সত্যের উপর সংস্থাপিত। পত্র পুষ্প ফলে শাখা প্রশাখায় পাপ নানাবিধ বৈচিত্র্য উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপত্বের বিঘ্ন করিতে পারে না। ধর্ম্ম দশ প্রকার,—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ। প্রথম ধর্ম্ম সকল বিষয়ে অবিচলিত থাকা, লাভালাভ, আত্মীয়বিয়োগ, কিছুতেই বিচলিত না হইলে পরমধর্ম্ম লাভ করা যায়। নবম ধর্ম্ম সত্য, ইহাই সকল ধর্ম্মের সারভূত। বোধ হয় আপনার মহাভারত পড়া আছে; বন পর্ব্বে ধর্ম্ম নিজে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, "যশ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য দান, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার শরীর।" তাঁহার কথা শেষ না হইতেই আমি বলিলাম, "আমাদের মত সংসারীর পক্ষে সকল ধর্ম্মে দৃঢ় থাকা কঠিন।" তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমি পূর্ব্বেই বলেছি আপনার সঙ্গে তর্কে পার্ব্বোনা, আপনি ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তে পারেন না বলে কি কথাগুলি অশাস্ত্রীয় হবে?" আমি বলিলাম, "তা নয়, আমি আপনার নিকট জপের কারণ জান্‌তে চাচ্ছি, আপনি অনেক কথার অবতারণা কর্‌ছেন, শেষে কি বল্‌বেন জানিনা।" তিনি আমার কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠিকই বল্‌বো, ব্যাকুল হবেন না, দেখুন সকল কাজের গৌর চন্দ্রিকা চাই। মহাকবি

কালিদাস কোন কার্য্যেই গৌরচন্দ্রিকা ছাড়েন নাই। দেখুন অভিজ্ঞান শকুন্তলায় প্রথমেই "যস্যষ্টি" ইত্যাদি আরম্ভ করেছেন শেষ শ্লোকেও "পুনর্ভবং" ইত্যাদি প্রার্থনা। আপনিই ত কথানা বই লিখেছেন। দেখ্‌ছি, মঙ্গলাচরণ কোথাও ছাড়েন নাই। থাক, আমার জপের কথা জানবার জন্য আপনার ব্যাকুলতা বড় বেশী হয়েছে. শুনুন। ঐসকল ধর্ম্ম প্রতিপালন কর্‌বার উপায় অনেক, সে সব কথা আমাকে বল্‌তে দিলেন না। আপনার ধৈর্য্য থাক্‌বে না, অতএব আর গৌরচন্দ্রিকার দরকার নাই, সহজ কথায় বল্‌ছি, শুনুন।"

"আমাদের চিন্তা ধর্ম্ম-বহির্ভূত হলে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।" আমি বলিলাম, "ধর্ম্ম বহির্ভূত কর্ম্মেরই প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, কিন্তু কুচিন্তার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি? আমার বোধ হয় কুচিন্তার প্রায়শ্চিত্ত আত্মগ্লানি।" ভদ্র-লোকটী বলিলেন, "মহাশয়! বৃথা তর্ক কর্‌বেন না, প্রথমে চিন্তা পরে কর্ম্ম। কারণ না থাকিলে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত আছে, কারণের প্রায়শ্চিত্ত নাই, একি হয়?" আমি বলিলাম "বলুন, স্বীকার করলাম।" তিনি বলিতে লাগিলেন-"আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার অনেক, কোশাকুশি চাই, উপকরণ চাই, ব্রাহ্মণ চাই, কিছু অর্থও চাই, কিন্তু মানস প্রায়শ্চিত্তের সে সব কিছু প্রয়োজন হয় না। সেই জন্য আমি তমোগুণদূষিত কোন চিন্তা মনোমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশবার দুর্গা নাম জপ করি। এই কার্য্য দ্বারা আমি দেখ্‌ছি আমার চিন্তার ধারা বিপথে যাইবার অল্প অবসর পায়।" আমি বলিলাম "উত্তম করেন। সে দিন গ্রামের প্রান্তভাগে ভ্রমণ কালে মধুপ সকলের আম্রবৃক্ষে গুণগুণ শব্দে কোকিল সকলের কলধ্বনি শুনে, জলশূন্য সেই পুষ্করিণী দেখে এবং আহার সময়ে আপনার কি কুচিন্তা মনোমধ্যে উদয় হয়েছিল, শুন্‌তে পাই কি?" তিনি বলিলেন, "পাবেন না কেন? মধুকরগণের মধু সঞ্চয় ও বিহঙ্গমগণের একত্রে সুখে অবস্থান দেখে মনে হয়েছিল, যে ব্যক্তি সময়ে সঞ্চয় করে, তার অভাব হয় না, সঞ্চয় করে স্ত্রী-পুত্র লয়ে সংসারে বাস ও সঞ্চয় ভোগ করা কর্ত্তব্য পুষ্করিণীটি আমার, মনে হয়েছিল, তার সংস্কার করে চারি ধারে বৃক্ষাদি রোপণ কর্ব্বো। আহারের সময় বাটি-পরিপূর্ণ সুমৎস্যের ঝোল হলে ভাল হ'ত, এইরূপ মনে হয়েছিল। এই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তির জন্য দুর্গানাম মহামন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলাম।" ইহা কহিয়া তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত না করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের উপকারিতা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই ব্যক্তি সত্ত্বগুণে জীবন যাপন করিয়া সজ্ঞানে কাশীধামে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

মিত্রসহ রাজার কর্ম্মফল।

(পৌরাণিক)

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

আচারী হিন্দুগণ প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই যে পুণ্যশ্লোক মহারাজ ঋতুপর্ণের নাম করিয়া থাকেন (১) সেই রাজার বংশে মিত্রসহ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা সুরাস স্বর্গগমন করিলে মিত্রসহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

সৌদাস মিত্রসহ পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন, তথাপি জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলে তাঁহার দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। তিনি একদা মৃগয়ার্থে নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইয়া দুইটি ব্যাঘ্র দেখিলেন। মহারাজ মিত্রসহ নিশিত শরসন্ধান করিয়া একটি ব্যাঘ্রকে বধ করিলেন। মৃত্যুকালে সেই শার্দ্দূল ভীষণ রাক্ষস মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পতিত হইল।

দ্বিতীয় ব্যাঘ্র "তোর প্রতিফল দিব" বলিয়া নিমেষ মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজা ব্যাঘ্রমুখে রাক্ষসী ভাষা শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং চিন্তিত মনে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে ঐ রাজা মাংসাষ্টক শ্রাদ্ধে পিতৃগণকে মাংস দিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন এবং যথাবিধানে মাংস রন্ধন করাইয়া বশিষ্ঠ দেবকে আমন্ত্রণ করিলেন। এ দিকে ব্যাঘ্ররূপী সেই নিশাচর ভ্রাতৃ-বধ প্রতিশোধ-কল্পে পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজাকে বলিল, "শীঘ্র আমার জন্য মাংস সহিত অন্ন আনয়ন কর। আমি সত্বর আসিতেছি।"

এই বলিয়া সেই রাক্ষস অবিলম্বে রাজার পাচক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া

(১) পুণ্য শ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যাঃ নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥

এই ঋতুপর্ণ রাজা বৃক্ষের পত্র পুষ্পফল গণনা করিয়া দিতে পারিতেন। মহারাজা নল স্বীয় অশ্বচালনা বিদ্যার বিনিময়ে উহা শিক্ষা করেন।

(প্রঃ লেঃ)

রাজার নিকট আগমন করিলে, রাজা কহিলেন, "সমাংস অন্নব্যঞ্জন সজ্জিত কর।" পাচকবেশী নিশাচর নরমাংস সংগ্রহ করতঃ তাহাই রন্ধন করিয়া অন্নব্যঞ্জনের পরিবর্ত্তে বশিষ্ঠকে আহার করিতে দিল।

বশিষ্ঠমুনি নিবেদনের সময় নরমাংস বুঝিতে পারিয়া রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "অরে মন্দবুদ্ধে! তুই কোন্ সাহসে আমাকে নরমাংস নিবেদন করিলি? এযে রাক্ষসের খাদ্য! মানুষে কি ইহা ভোজন করে? তুই অতি দুঃশীল; সেইজন্য জানিয়া শুনিয়াও এই অমেধ্য তথাদ্য আমাকে প্রদান করিয়াছিস। অতএব ইহার প্রতিফল ভোগ কর।" এই অভিশাপ দিলেন "তুই জানিয়াও যখন আমাকে নরমাংস প্রদান করিলি তখন তোর নরমাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি হো'ক; তুই রাক্ষস হ।"

রাজা মিত্রসহ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "হে দেব! মাংস ভোজনের অনুমতি আপনিই ত দিয়াছেন। আমি পাচককে মাংস আনিতেই বলিয়াছি, ইহা যে নরমাংস তাহা আমি জানি না।"

বশিষ্ঠ "কি কি আমি বলিয়াছি? কি বলিয়াছি?" বলিয়া ধ্যানস্থ হইয়া সমস্ত ব্যাপারই জানিতে পারিলেন এবং দুঃখের সহিত বলিলেন, "হায়, হায়! কর্ম্মফল কেহই খণ্ডাইতে পারে না। দেখ বাসব ভগাঙ্গ; চন্দ্র কলঙ্কী; ব্রহ্মা চতুরানন। ইহারা স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছেন। তোমারও পূর্ব্ব জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলে এই অভিশাপ ভোগ হইবে। তবে তোমাকে বেশী দিন নরমাংস ভক্ষণ করিতে হইবে না; কারণ তুমি এ বিষয় জান না। দ্বাদশ বৎসর মাত্র নরভোজী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবে।"

তখন রাজার অভিমানে ও ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি তদ্দণ্ডেই অঞ্জলি পুরিয়া বারি গ্রহণ করিলেন এবং বশিষ্ঠদেবকে শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইলেন। রাজার পরম প্রেয়সী মদয়ন্তী-দেবী সকল বিবরণ শুনিয়া অন্তঃপুর হইতে ছুটিয়া আসিলেন। তিনি পরম ভক্তিমতী এবং সুশীলা। রাজা শাপ প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া মদয়ন্তী "কি করেন! কি করেন! ইনি ব্রাহ্মণ, তাহার উপর আমাদের কুলগুরু, ইনি কোন প্রকারেই অভিশাপ যোগ্য নহেন।" এই বলিয়া রাজার চরণ ধরিলেন। পরে বহুবিধ স্তব স্তুতি দ্বারা বশিষ্ঠকেও প্রসন্ন করিলেন।

রাজা তখন অঞ্জলি-স্থিত সেই শাপ-জল কোথায় নিক্ষেপ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। "যদি ইহা আকাশে ফেলি, তাহা হইলে অনাবৃষ্টিবশতঃ শস্য-

নাশ হইবে ; পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলে পৃথিবী কম্পিতা হইবেন। অতএব কোথায় ফেলি ?" ভাবিতে ভাবিতে স্বীয় চরণদ্বয়ে ঐ জল নিক্ষেপ করিলেন।

সেই ক্রোধাগ্নি-প্রতপ্ত জলের সংস্পর্শে তাঁহার গৌরবর্ণ পদদ্বয় তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণপাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। ইহার জন্যই তিনি পুরাণে "কল্মাসপাদ" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

পরে বশিষ্ঠের শাপবশে রাজা রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তাঁহার নরমাংস ভোজনের এতই স্পৃহা হইল যে, সেই বনমধ্যে এক ব্রাহ্মণ দম্পতি সুরতাসক্ত থাকাকালে ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করিলেন। ব্রাহ্মণী ক্রোধে অভিশাপ দিলেন "তুমি লোকচিন্তায় মগ্ন হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে"। এই বলিয়া সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণী জ্বলন্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

অনন্তর দ্বাদশ-বর্ষ অতীত হইলে রাজা শাপমুক্ত হইলেন এবং রাজ্যমধ্যে আগমন করিয়া সুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। রাজা কর্ম্মফলে নিঃসন্তান ছিলেন। সেই অপরিতৃপ্তা ব্রাহ্মণীর অভিশাপ স্মরণ করিয়া নিরন্তর ব্যথিত অন্তরে মদয়ন্তীকে কহিলেন "প্রিয়ে! এ জন্মে আমার গ্রাম্যধর্ম্মসুখ শেষ হইয়াছে। তুমি বশিষ্ঠ দ্বারায় সন্তানবতী হও।" পতিপ্রাণা মদয়ন্তী অসম্মতি প্রকাশ করিলে রাজা বশিষ্ঠকে অশেষবিধ বিনয়বাক্যে মদয়ন্তীর গর্ভাধানের জন্য অনুরোধ করিলেন।

এ যুগে উহা দোষাবহ ছিলনা। সুতরাং রাজ্য রক্ষার্থ মহর্ষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভাধান করিলেন। রাণী সপ্তম বর্ষ অতীত হইলেও গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইল না দেখিয়া গর্ভোপরি প্রস্তরের আঘাত করিলেন।

প্রস্তরের নাম অশ্ম। অশ্মের আঘাত করায় গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইল। বশিষ্ঠ তাহার নাম রাখিলেন "অশ্মক"। এইরূপে মিত্রসহ রাজার ক্ষেত্রে বশিষ্ঠের ঔরসে অশ্মকের জন্ম হইয়াছিল। রাজর্ষি মিত্রসহ বহুদিন তপস্যা করিয়া যোগাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া তনুত্যাগ করেন। মদয়ন্তী তাঁহার বিরহে শোকাকুলা হইয়া অগ্নিমধ্যে দেহ রক্ষা করেন।

স্বর্ণ ঘটিত অমৃত সালসা

এই "স্বর্ণঘটিত অমৃত-সালসা" সেবনে দুষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্তবিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ. সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দুষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের "অমৃত সালসা" সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দুর্ষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা মিশ্রিত সালসা নহে। ইহা কেবল গাছ-গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। **গুণের পরীক্ষা**—"অমৃত সালসা" সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন পূর্ব্বাপেক্ষার ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পর হস্ত পদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে, শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১ শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২॥০ টাকা,মাশুল ১৲ টাকা ৬ শিশি ৪॥০ টাকা,মাশুল ১॥০ টাকা,

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও সতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তি হীনতা, উত্তেজনারাহিত্য পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।৶০ আনা, তিন শিশি ২॥০ টাকা,মাশুল ১৲ টাকা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য, এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রিবেলায় আনন্দ ও ক্ষুধা-বৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যাবেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন, ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে। একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন কৌটা ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা এক সের ৮৲ আট টাকা।

কবিরাজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, পোঃ হাটখোলা কলিকাতা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেরই মুক্তকণ্ঠে সু-প্রশংসিত ও ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্ত বাটীর অমূল্যনিধি বিশ্ববিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম যাবতীয় চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

বিনা অস্ত্রে স্থায়ি আরোগ্য
N পদ্মমধু D

কে না জানে চক্ষু না থাকিলে অন্যের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়?

অতএব চক্ষুপীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিত **পদ্মমধু** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিধ চক্ষুপীড়ায় বিশুদ্ধ **পদ্মমধু** তুল্য মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। একবার ব্যবহার করিলেই অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইবেন। সাবধান! ক্রয় কালে এন্ দত্ত ব্রাদার্স নাম দেখিয়া লইবেন। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ এক টাকা, ৩ ড্রাম ২৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা। **এন্ দত্ত ব্রাদার্স**

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট।

আহিরীটোলা কলিকাতা।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

PRINTED BY N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS

139 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

১২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক - শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শ বর্ষ] ১৩৩৮ মাঘ, [১০ম সংখ্যা]

১।	শ্রীমদ্ বালানন্দ	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২৮৯
২।	ব্লাডপ্রেসার—	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী ...	২৯৮
৩।	বীরবালক—	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (Mrs. Hemans এর Casabianca নামক পদ্যের বঙ্গানুবাদ)	৩০২
৪।	পরীক্ষা—	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৩০৫
৫।	গোবর্দ্ধন জামাই—	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি	৩০৮
৬।	হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা—	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু ...	৩১৩
৭।	চৈত্রের চিতা—	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর	৩১৯

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

21-7-32

জ্বরের যম **জারমলীন** সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য

এক দিনে জ্বর ছাড়ে! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য-৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কলিকাতা।

৩৭ নং অপারসার্কুলার রোড, কলিকাতা

স্থাপিত—১৮৩৩

নিরামিষ

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য, হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারীং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত

অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা। ডাঃ মাঃ ॥০ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২॥০ অড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

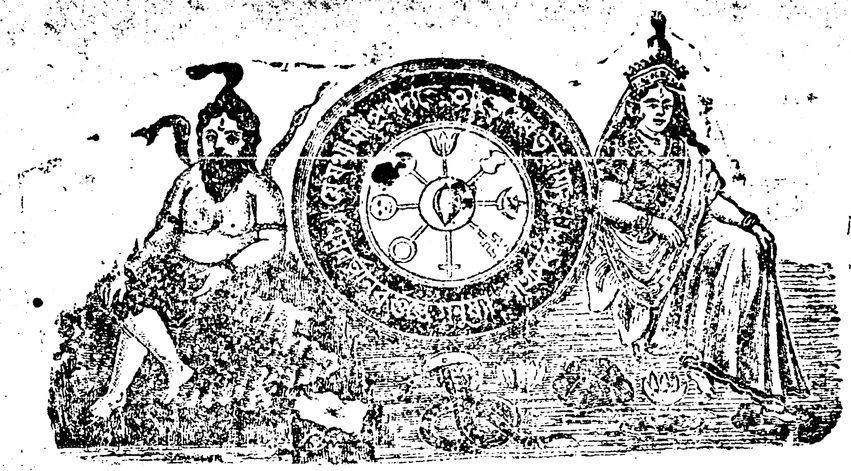

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৫শ বর্ষ | ১৩৩৮ সাল, মাঘ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুমুখবিস্থত উপদেশাবলী।

সাধুকা ইঙ্গিত যব সমঝ মে আয়া।
মুক্তি ফলকা পথিক হো পায়া॥

মহাত্মার ইঙ্গিতে পক্ষীর বন্ধন মুক্তি।

কোন সাধুর একটী জাতিস্মর ময়না পক্ষী ছিল। সেই সাধুর আশ্রমে সে সামান্যরূপ আহার পাইত ও উন্মুক্ত স্থানে এক লৌহ দাঁড়েই আবদ্ধ থাকিত। ক্রমে এ পাখীটি "রাম রাম বল" এই বুলি শিখিল ও সকলকে দেখিলেই সে "রাম রাম বল" বলিয়া সম্বোধন করিত। এক রাজা এ পাখীটির এই গুণ দেখিয়া উহাকে সাধুর নিকটে প্রার্থনা করিলেন এবং ইহাকে পাইয়া নিজের

রাজধানীতে লইয়া গেলেন ও তথায় এক স্বর্ণ পিঞ্জরের ভিতর স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরের এক অংশে অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিলেন। এরূপ অবস্থায় পাখীটীর পূর্ব্বাপেক্ষা যত্ন ও আহারাদি প্রাপ্তি রীতিমত ভাবেই হইতে লাগিল। পাখীটী সকলকে দেখিয়া কেবল "রাম রাম বল" ইহাই বলিতে লাগিল।

এক সাধু মহাত্মা ও তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন। এই মহাত্মা তাঁহার শিষ্যটীকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন যে, সে যেন "গুরুদাতা বন্দিছোড়" এই বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। শিষ্যটী এই উপদেশ মত "গুরুদাতা বন্দিছোড়" বলিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে একদিন সেই রাজপুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। পাখীটীর নিকট কেহ নাই দেখিয়া তাহার নিকট যাইলেন এবং বলিলেন "গুরুদাতা বন্দিছোড়" এবং পাখীটীকে বলিলেন "পাখী! রাম রাম বল"। তখন পাখীটী এই শিষ্যটীকে বলিল যে, "আপনি ত "বন্দিছোড়" বলিয়া সকলকেই উপদেশ দিতেছেন কিন্তু আমি এ বন্দীর জীবন হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইব তাহাত বুঝিতেছি না।" শিষ্যটী তখন পাখীটীকে বলিলেন "তুই রাম রাম বল্"। তখন পাখীটী বলিল যে, "এ উপদেশ তাহার মনে ধরিল না। ইহার কারণ এই যে, সে যখন "রাম রাম বল" এ বুলি বলিতে না শিখিয়াছিল তখন তাহাকে খোলা জায়গায় এক লৌহের দাঁড়ে মাত্র আবদ্ধ রাখিয়াছিল। ইহার পর সে যেমন "রাম রাম বল" ইহা বলিতে শিখিল অমনি তাহাকে এ স্বর্ণ-পিঞ্জরের মধ্যে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া এই রাজবাড়ীর অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিয়াছে। সুতরাং এই "রাম রাম" বলিবার পর তাহার বন্দীর জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠিনই হইয়াছে। এজন্য সে প্রার্থনা করিতেছে যে, তাঁহার গুরুদেব যখন "বন্দীছোড়" বলিয়া সকলকে তাঁহার দ্বারা উপদেশ দেওয়াইতেছেন, তখন একবার তাঁহাকেই যেন তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, কি উপায়ে তাহার এ শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ হইবে।" শিষ্যটী ইহা জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিয়া সে দিন চলিয়া গেলেন কিন্তু পাখীটীর এ কথাটী তিনি জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পুনরায় আর একদিন শিষ্যটী ভিক্ষা করিতে আসিলে পাখীটী জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার বিষয় তাঁহার গুরুকে কি তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন? শিষ্যটী পাখীর এই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন যে, জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার ভুল হইয়াছে, আজ যাইয়া নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবেন। এ দিন ভিক্ষা করিয়া যাইবার পর শিষ্যটী তাহার গুরুকে পাখী

যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিয়া তাহার প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য এই প্রশ্নটী যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন অমনি তাঁহার গুরুদেবের এক মহাবিকৃতিভাব উপস্থিত হইল। তিনি হাত পা নাড়িতে লাগিলেন। চক্ষু দুইটী তাঁহার উল্‌টাইয়া গেল। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া গেলে ও তিনি মৃতবৎ ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। সেই শিষ্য ও তাহার অন্যান্য সঙ্গীরা অকস্মাৎ গুরুদেবের এই অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ভীত হইল। তাহারা হতভম্ব হইয়া চক্ষু-মস্তকে জলসিঞ্চন ও পাখার দ্বারা বাতাস প্রদান ও অন্যান্য শুশ্রূষা করিতে লাগিল! এইরূপ অনেকক্ষণ করিবার পর, তবে গুরুদেব সুস্থ হইলেন। গুরুদেবের এইরূপে সংজ্ঞালাভের পর, পাখীটীর প্রশ্ন সম্বন্ধে আর কোনরূপ বার্ত্তালাপ করিতে শিষ্যটী সাহস করিলেন না। কয়েকদিন পরে, সেই শিষ্যটী পুনরায় ভিক্ষায় বাহির হইয়া পাখীটীর নিকট যাইলে, পক্ষী পুনরায় জানিতে চাহিল যে তাহার বিষয় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি না। তখন শিষ্যটী বলিলেন যে, তাহার প্রশ্নের তো উত্তর তিনি পান নাই। বরং উক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যাইবামাত্র, তাঁহার গুরুদেবের প্রাণ যাইবার মত হইয়াছিল। ইহা বলিয়া গুরুদেবের অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল তাহা পাখীটিকে আগাগোড়া শুনাইল। পাখীটি ইহা শুনিয়া আর কিছু বলিল না। ইহার দুই একদিন পরে, রাজা পাখীটির নিকট আসিয়া যেমন তাহাকে "রাম রাম বল" বলিলেন, অমনি পাখীটি খাচার ভিতর তাহার পক্ষগুলি নাড়িতে আরম্ভ করিল; ছটপট করিতে লাগিল; তাহার চক্ষু দুইটি উল্‌টাইয়া ফেলিল এবং শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সে যেন মৃতবৎ পতিত হইল। এ প্রিয় পাখীটীর হঠাৎ এরূপ অবস্থা দেখিয়া রাজা অতিশয় ভীত হইলেন ও সকলকে ডাকাডাকি করিলেন। বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইল ও পাখীর অবস্থা দেখিয়া মনে করিল যে, পাখীটি হয়ত এখনই মরিয়া যাইবে। এজন্য তাহাকে খাঁচা হইতে বাহিরে আনিল ও পায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া দিল। ইহার পর কেহ পাখীর মুখে চোখে জলসিঞ্চন এবং কেহ বা পাখার বাতাস দিতে লাগিল। কিন্তু এ সব করিয়াও পাখীর কিছুই হইল না, সে মৃতবৎ মাটিতে পড়িয়া গেল! অনেকক্ষণ এরূপ করিবার পরও পাখীটি যখন বাঁচিয়া উঠিল না, অগত্যা তখন উহা মরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া একে একে সেখান হইতে সকলে চলিয়া গেল। যখন পাখী দেখিল যে, তাহার আশে পাশে বা নিকটে কেহ নাই তখন "ফুরুৎ" করিয়া সকলের সম্মুখ হইতে আকাশ-পথে সে উড়িয়া পলাইল।

এই গল্পটি বলিয়া শ্রীগুরুদেব ব্যক্ত করিলেন যে, সময়ে সময়ে মহাত্মাগণ এইরূপ ইঙ্গিতেই উপদেশ দেন। যাহার চিত্ত-শুদ্ধি হইয়াছে বা প্রাক্তন-সংস্কার প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে সহজেই গুরুজনের এ ইঙ্গিত হৃদয়ে ধারণা করিয়া লইলেই বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকা আছে। ইহাও তিনি শুনাইয়াছেন।

কোন শিষ্য তাঁহার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ?" গুরুদেব ইহার কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। শিষ্য মনে করিল যে, গুরুদেব বুঝি তাহার প্রশ্ন শুনিতে পান নাই; এজন্য পুনরায় প্রশ্ন করিল। গুরুদেব পুনরায় তুষ্টিম্ভাব অবলম্বন করিলেন। শিষ্য ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পাইয়া, পুনরায় প্রশ্ন করিলে গুরুদেব বলিলেন, "আমি তুইবারই তোমার প্রশ্নের উত্তর তো দিয়াছি, কিন্তু তুমি বুঝিতে পার নাই। তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর মৌনাবলম্বন। "ত্বন্তু ন বিজানাস্য পশ্যন্তোহয়মাত্মা" (শাঃভা-৩অঃ ২পা ১৭ সূঃ) তুমি কি জানিতেছ না যে এই আত্মা উপশান্ত কারণ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।"

অর্থাৎ বাক্য ও মন যাহাকে না পাইয়া বা প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, তাহাই ব্রহ্মানন্দরূপ আনন্দ। ইহা যিনি জানেন তাঁহার কোনরূপ জন্মমরণ ভয় থাকে না। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায় ২য় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি) উক্ত হইয়াছে যে, এক সময়ে দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপতি সমীপে বাস করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকে প্রজাপতির নিকট উপদেশ পাইবার প্রার্থনা করিলেন। প্রজাপতি প্রত্যেকের জন্যকিছু না বলিয়া কেবল "দ" "দ" "দ" এই রূপ একটি শব্দ-মাত্র ব্যবহার করিয়া উপদেশ দিলেন। সকলেই বলিল "ভগবন্! আমরা ঠিক উপদেশ পাইয়াছি।" প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপদেশ পাইয়াছ বল দেখি?" ইহাতেদেবগণ বলিলেন যে, "আমরা স্বভাবতঃ অদান্ত এজন্য আমাদিগকে "দান্ত" হইবার উপদেশ দিয়াছেন।" প্রজাপতি বলিলেন যে, "হাঁ তোমরা যথার্থ আমার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিয়াছ।" মনুষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "আমরা অতি লুব্ধ প্রকৃতি, এজন্য "দ" শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।" অসুরগণ বলিল যে "দ" শব্দ দ্বারা আমাদিগকে দয়াশীল হইতে উপদেশ দিয়াছেন।" প্রজাপতি ইহা শুনিয়া

বলিলেন যে, "তোমরা সকলে ঠিক উপদেশ গ্রহণ করিয়াছ।"

কথিত আছে, পাইক-পাড়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার লালাবাবু একদিন কোন নৌকার মাঝিকে বলিতে শুনিলেন "বেলা যে গেল, কবে পারে যাবি?" এই শব্দ কয়েকটি শুনিয়াই লালাবাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রতি যথার্থ উপদেশ হইয়াছে। ইহা শুনিবার পরই, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া পরম বৈরাগ্যাবলম্বন করেন ও পরিশেষে বৃন্দাবনে "মাধুকরী" বৃত্তি গ্রহণ করেন। তিনি মাঝির শব্দ কয়েকটি শুনিয়া মনে করিলেন যে, মৃত্যুর সময় তো নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, কখন যাইবার জন্য তৈয়ার হইবি অর্থাৎ কখন ঐশ্বর্য্যাদি ত্যাগ করিয়া সেই পরপারে যাইবার জন্য আত্মজ্ঞানের সম্বল সংগ্রহ করিবি? বাস্তবিক এ সংসারে গুরুরূপী শ্রীভগবান অজ্ঞানীদিগকে জ্ঞান প্রদান করিবার জন্য কত রূপ যে ইঙ্গিত করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমরা অজ্ঞানান্ধকারে এরূপ মোহগ্রস্ত যে ইহার একটিও আমরা দৃঢ়রূপে ধরিয়া লইতে পারি না। যদি ইহার একটিরও সামান্য ইঙ্গিত হৃদয়ে ধরিয়া আমরা সেই মত কার্য্য করিতাম, তবে পাখীর ন্যায় মুক্তি আমাদের করতলগত হইত। শ্রীগুরুদেবের এইরূপ কয়েকটি উপদেশ শুনাইতেছি—"উলট যাও" "মেরা ছোড়ে তেরা বল" "কলৌ নামৈব কেবলং বা দানৈব কেবলং" "ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা", "জপাৎ সিদ্ধি জপাৎ শুদ্ধি নরাণাম" "ত্যজ মায়া অভিমান", "ভজ সাধু সমাগমং" "স্মর নিত্যমনিত্যতাং "সেবিতব্য মহাবৃক্ষ"; "বিষয় বিষ হ্যায়"; "কমখানা গমখানা"; "শরীরমে চাযা মনমে রাজা" "অন্তর্নিবৃত্তি বহিঃপ্রবৃত্তি"—এ সমুদয় ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইবে।

---

(৩)

দেশ কাল অরু পাত্রমে একহি অমৃত বোল।
সব মানবকো ভেদসে দেতা নেত্র হি খোল॥

কোন দেশের এক রাজা বড় কৃপণ ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এজন্য ভালরূপে রাজকার্য্য দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। যুবরাজ উপযুক্ত হইয়াছিলেন এজন্য তিনি ভালরূপে রাজকার্য্য দেখিতেও পারিতেন, কিন্তু পাছে তাঁহার হাতে রাজকার্য্য সমর্পণ করিলে তিনি অমিতব্যয়ী হইয়া অধিক অর্থনষ্ট করেন, এই ভাবিয়া পুত্রকে কোন বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে দিতেন না। রাজকুমারী

বয়:স্থা হইয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহ দিলে বহু অর্থব্যয় হইবে এই ভাবিয়া রাজা কন্যার বিবাহে উদাসীন ছিলেন। এই রাজার রাজধানীতে কোন সময়ে এক নট ও এক নটী আসিয়া ভালরূপ রং-তামাসা ও নাচগান দেখাইবে এই বলিয়া রাজ সকাশে প্রার্থনা করিলেন। ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন যে, একদিন তিনি ইহা শুনিবেন। নটী ও নট রাজার নিকট হইতে এই আশা পাইয়া, আজ বা কাল তামাসা দেখাইবার বন্দোবস্ত হইবে মনে করিয়া, রাজধানীতে বাস করিতে লাগিল এবং প্রতিদিন যাইয়া এক একবার প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। এই রূপে কয়েকদিন গেল এবং রাজা আজকাল হইবে বলিয়া ক্রমেই দিন পিছাইতে লাগিলেন। ইহা কেবল রাজার কৃপণ স্বভাবের জন্যই হইতে লাগিল। তাঁহার অন্তরের ভাব এই ছিল যে, তামাসা দেখিলেই নট নটিকে বিদায় দিতে হইবে ও তজ্জন্য অর্থব্যয় করিতে হইবে। অভিনয়ের আয়োজন জন্যও খরচ আছে। এদিকে নটনটী সহরবাসের খরচ চালাইতে চালাইতে বিরক্ত হইয়া গেল। রাজা যদি এক কথায় বলিতেন যে, তিনি দেখিবেন না তবে অনায়াসেই তাহারা চলিয়া যাইতে পারিত। এদিকে রাজার একটা রাজকীয় অভিমান আছে, এজন্য তামাসা দেখিবেন না এরূপও বলিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় রাজার বিনানুমতিতে তামাসা না দেখাইয়া চলিয়া যাওয়াও অকর্ত্তব্য। কি করিবে ইহা স্থির করিতে না পারিয়া, নট ও নটী মন্ত্রীর শরণাপন্ন হইল। মন্ত্রী রাজার স্বভাব জানিতেন ও কি জন্য তামাসা দেখিতেছিলেন না, তাহাও বুঝিয়াছিলেন। নট ও নটীর কষ্টের কথা শুনিয়া মন্ত্রী গিয়া রাজাকে বুঝাইলেন যে, এ তামাসা দেখিবার জন্য রাজসরকারের কোনরূপ ব্যয় হইবে না। আর সামান্য যদিই বা কিছু ব্যয় হয়, তবে সে বন্দোবস্ত তিনি নিজেই করিবেন। ইহা শুনিয়াই রাজা হুকুম দিলেন যে, তবে সেই রাত্রেই অভিনয় দর্শন করিবার বন্দোবস্ত হউক। ইহা শুনিয়াই মন্ত্রী সমুদয় বন্দোবস্ত করিলেন ও সহরে ইহার ঘোষণা করিয়া দিলেন। যথা সময়ে রাত্রিতে অভিনয় আরম্ভ হইল ও বহুলোকের সমাগম হইল। নট নটী পরম উৎসাহ ও নিপুণতার সহিত অভিনয় আরম্ভ করিল ও মনে করিল যে, তাহাদের সে দিন বহু অর্থ প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা যে বৃথা, ক্রমে এই ধারণাই হইতে লাগিল। রাত্রি এক প্রহর গেল, ক্রমে দ্বি-প্রহর অতীত হইয়া শেষ প্রহরে যাইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও একটি পয়সাও তাহারা কাহারও নিকট হইতে পাইল না। নটী নানারূপ অভিনয় করিতে লাগিল ও শেষে নিজেকে ক্লান্তবোধ করিল। তথাপি নট সমান তালে

নটীর সহিত তাল বাজাইয়া চলিতে লাগিল। এরূপ সময়ে নটী—তাহার নটকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

"রাত দোঘড়ী বহে গেয়া থাক পিঞ্জর আজো নটি কহে শুন বামদেও মিছে তাল বাজাও" অর্থাৎ নটী কহিল হে বামদেও বাহে নট! রাত্রির দুই প্রহর ত চলিয়া গেল। অভিনয় করিতে করিতে তাহার শরীর ও ক্লান্ত হইয়া গেল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একটি পয়সা মিলিল না, অতএব তোমার তাল বাজান কেবল মিছাই হইতেছে।

নটী যেমন ঐরূপ বাক্য বলিল, অমনি নট বলিয়া উঠিল "বহুৎ গেয়ি থোরী রহী, থোরি বী আবি যায়, নট কহে দয়িতাকো, তালে ভঙ্গ নাহি পায়।"

অর্থাৎ নট উত্তর করিল যে, সে বেশ বুঝিয়াছে যে রাত্রির বহুৎ ভাগই চলিয়া গিয়াছে, আর অল্প মাত্রই বাকী আছে। তাহাদের কিছু অর্থলাভ হয় নাই ইহাও ঠিক। কিন্তু তাহারা যেরূপভাবে অভিনয় করিতেছে অল্পরাত্রির জন্য উহা বন্ধ না রাখিয়া, সমানভাবেই চলিতে দেওয়া যাউক। এ সময়ে তাল ভঙ্গ করিয়া কায নাই। ইহা করিলে সমুদয় রাত্রির পরিশ্রমটাই অনর্থক হইবে। ইহা সংস্কৃত কাব্যে ব্যাকুলাবৃত্তি অলঙ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

নটের এইরূপ উত্তর হইবার পর দেখাগেল যে রাজসভায় এক ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে সভায় এক সাধুফকির বসিয়া অভিনয় শুনিতেছিল। তাহার একখানি কম্বল মাত্রই সম্পত্তি ছিল। সে নটের সেই "বহুৎ গেয়ী থোরী হ্যায়," ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও তাহার কম্বলখানি নটকে পুরস্কার দিল। এই সাধুটী এইরূপ করিবার পর দেখা গেল রাজার পার্শ্বে যে যুবরাজ বসিয়াছিলেন, তিনি নিজ হস্ত হইতে বহুমূল্য এক তাগা খুলিয়া তখনই নটকে উপহার দিলেন। রাজকুমার এইরূপ করিতেই রাজকুমারী গলা হইতে বহুমূল্য হীরকখচিত একছড়া হার খুলিয়া নটকে পারিতোষিক দিলেন! রাজা পর পর তিন জনের এই ব্যবহার দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। তখনই অভিনয় বন্ধ করিতে বলিয়া প্রথমতঃ সেই সাধুটীকে ডাকিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে ত বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া অভিনয় শুনিতেছিল, কিন্তু নটের কথা শুনিয়া তাহার এমন কি ভাবের উদয় হইল যে, তাহার মূল্যবান সম্পত্তির মধ্যে যে এক খানি কম্বল ছিল তাহাই দিয়া ফেলিল। রাজার এই প্রশ্ন শুনিয়া সাধুটী বলিলেন, "মহারাজ! নট বলিল যে "বহুৎ গেয়ী থোরী হ্যায়, থোরী বি আবি যায় তালভঙ্গি নাহি পায়" ইহাতে আমি এক পরম উপদেশ লাভ করিয়াছি।

এ উপদেশ আমি এই ভাবে গ্রহণ করিয়াছি। আমি বাল্যকাল হইতে সাধু ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। এজন্য কত কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াছি। কিন্তু কিছুদিন হইতে মনে করিতেছি যে, এই কষ্টকর সাধুজীবন ভাল নয়। ইহা হইতে অর্থশালী গৃহস্থজীবন লাভ করিলে ভাল হইত। কিন্তু নটের বাক্য কয়েকটী শুনিয়াই আমার জ্ঞান হইল যে, এত দিন তিতিক্ষার সহিত যে সাধুজীবন কাটাইতেছি তাহার বহুৎ অংশই ত চলিয়া গিয়াছে; বাকী আছে "থোরা" বা অল্প অংশ, তাহাও শীঘ্র চলিয়া যাইবে। সুতরাং এতদিনের সাধনার উপার্জ্জিত জ্ঞান এক্ষণে এই অল্প সময়ের জন্য "তালভঙ্গ" দিব কেন মনে করিতেছি? কেন মনে করিতেছি যে, অর্থশালী গৃহস্থজীবন ভাল? এইরূপ চেষ্টা যে করিতে যাইবে তাহার একুল ওকুল দুই নষ্ট হইবে। এ বয়সে গার্হস্থজীবনে আর কি ভাল হইবে? বরং সাধুভাবেই জীবনের অবশিষ্ট কয়েকদিন অতিবাহিত করা উচিত। মহারাজ! নটের কথায় এই জ্ঞান লাভ করিবার পর, আমার এত আনন্দ হইল যে, গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ তাহাকে এই উপঢৌকন দিলাম।

রাজা এ কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। পরে পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "সাধুর বিষয় ত শুনা হইল। কিন্তু তুমি কি জন্য তোমার হাতের বহুমূল্য তাগা (কড়া) খুলিয়া দিলে?" এই প্রশ্ন শুনিয়া যুবরাজ বলিলেন যে, "মহারাজ! নটের কথাগুলি শুনিয়া আমার এক পরম জ্ঞানলাভ হইয়াছে। ইহা আমি খুলিয়াই বলিতেছি। বয়ঃস্থ ও উপযুক্ত হইয়াছি। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় মহারাজের কর্ত্তব্য যে, আমার হাতে সমুদয় রাজকার্য্য সমর্পণ করেন। কিন্তু হে মহারাজ! আপনার সে ইচ্ছা দেখা যায় না। এজন্য এক এক বার আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে আপনাকে গোপনে হত্যা করিয়া আমি নিজে রাজা হই। কিন্তু নট বলিল "বহুৎ গেয়ী থোরী হ্যায়, থোরী বি আবি যায়—কিন্তু তালভঙ্গ নাহি পায়।" ইহা শুনিয়াই আমার মনে আসিল যে, বৃদ্ধ-রাজার অধিক বয়সই তো কাটিয়া গিয়াছে; অল্পমাত্রই বাকী আছে। ইহাও পরে যাইবে। সুতরাং এই অল্প কাল আর তালভঙ্গ না দিয়া একভাবেই যাইতে দিই। নতুবা এই অল্পসময়ের জন্য আমি পিতৃহত্যা করিলে মহাপাতকী হইব। সুতরাং নটের এই বাক্যগুলি আমাকে যে পরমজ্ঞান দিয়াছে তাহারই পুরস্কার বা গুরুপ্রণামীস্বরূপ আমি ঐ তাগা খুলিয়া প্রদান করিয়াছি। রাজকুমারের অকপট হৃদয়ের এই ভাব প্রকাশ শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন।

ইহার পর, রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমার গলার বহুমূল্য হীরকখচিত হার তুমি কেন দিলে?" রাজার বাক্য শুনিয়া রাজকুমারীও বলিলেন যে, এ নট তাঁহাকে এক মহান্ উপদেশ দান করিয়াছে। তিনি বয়স্থা হইয়াছেন এজন্য বিবাহ করিবার ইচ্ছাও হইয়াছে। কিন্তু পাছে বিবাহে অর্থ ব্যয় হয় এই ভয় করিয়া আপনি বিবাহ দিতেছেন না। এজন্য তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে মন্ত্রী-পুত্রের সহিত বাহির হইয়া গিয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। কিন্তু নট বলিল "বহুৎগেয়ী থোরী হ্যায়, থোরী বি আবি যায়—কিন্তু তালভঙ্গ নাহি পায়"—ইহা শুনিয়াই তাঁহার হৃদয়ে এক জ্ঞানের চমক আসিয়া গেল। তিনি মনে করিলেন যে, ইহা ত ঠিক, এ বৃদ্ধ পিতার জীবনের বহুৎ অংশই চলিয়া গিয়াছে। আর যাহা বাকী আছে, তাহাও শীঘ্র যাইবে। এ সময়ে যে ভাবে তাঁহার জীবন যাইতেছে, তাহাতে আর তালে ভঙ্গ দিয়া কায নাই। ঐরূপ ভাবে গোপনে বাহির হইয়া বিবাহ করিলে, এ রাজকুলে এক বিষম কলঙ্ক লেপন করা হইবে ও বৃদ্ধ পিতার হৃদয়ে এক বিষম ক্লেশ দেওয়া হইবে। সুতরাং নটের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হয় ও সেই জন্য এই মহান্ জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি নটকে গলার বহুমূল্য হার উপঢৌকন দিয়াছেন।

রাজা উপরোক্ত সাধু, পরে রাজকুমার ও রাজকুমারীর কথাগুলি শুনিয়া নিজেও এক মহান্ জ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার ভ্রম আচরণ তিনি বুঝিতে পারিলেন। পরদিনই যুবরাজকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। মন্ত্রী পুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। এই সব করিয়া সস্ত্রীক তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন।

দেশ কাল ও পাত্র ভেদে কখন কখন সামান্য কথায় মহাজ্ঞানরূপ ফল উৎপাদন করে। এই গল্পটী ইহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত।

ব্লাডপ্রেসার।

আজকাল সহর মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ব্লাডপ্রেসার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ বিশেষতঃ (নিঃস্বস্য বিশ্বেশ্বর এব দেবঃ) নিঃসহায় গরীবের উপকার হইবে আশায় কলিকাতার ৪ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহাধ্যাপক ভিষগ্‌বাচস্পতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী কবিশেখর সার্ব্বভৌম এল, সি, পি, এস মহাশয়ের মতামত ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী মুষ্টিযোগ দিলাম :—

রোগোৎপত্তি ঃ—অত্যধিক বা অস্বাভাবিক রক্ত চাপ বৃদ্ধিকেই রক্তবিবৃদ্ধি বা ব্লাড প্রেসার বলে (Blood Pressure) ! এই রোগ সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সেই হইয়া থাকে, যৌবন বা বাল্যাবস্থাতে যে হয় না তাহা নহে। সিফিলিস অর্থাৎ ফিরিঙ্গিরোগগ্রস্ত ও মাদকদ্রব্যসেবীর পক্ষে যখন তখন সামান্য কারণেই এই রোগের আক্রমণাশঙ্কা থাকে। ব্লাডপ্রেসারমাত্র স্বহেতু কুপিত স্বপ্রধান রোগ তাহাও নহে, অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষে বা অপ্রত্যক্ষে অন্যরোগের সহিত জটীলভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, খর্ব্বগ্রীব ব্যক্তিরই এই রোগের ভয় বেশী। এই রক্ত বিবৃদ্ধি রোগ বর্ত্তমান নূতন যন্ত্র সাহায্যে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের পক্ষে নির্ণয় অতি সহজ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা চিরকালই ছিল, এখনও আছে, তবে এই নূতন যন্ত্রের সাহায্যে ভয়জনক বা মারাত্মক রূপে অল্পদিনমাত্র সুপরিচিত হইয়াছে। প্রবীণ চিকিৎসকেরা নাড়ী পরীক্ষায় সহজেই এই রোগ নির্ণয় করিতেন ও এখনও করেন, সুচিকিৎসকের পক্ষে যখন তখন ভয়জনক ব্যাধিরূপেও ইহা গণ্য হয় না।

ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধির কারণ ঃ—সাধারণতঃ অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা বা শারীরিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অত্যধিক আহার বা অনাহার, অতি স্বল্পাহার, অত্যধিক রৌদ্র সেবন, পূর্ব্বদিক প্রবাহিত বায়ু অধিক সেবন, অধিকক্ষণ রুদ্ধস্থানে বাস, সর্ব্বদা বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস সেবন, শুক্রাদি ধাতুর অধিক ক্ষয়, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ ইত্যাদি নানা কারণে ও আহার বিহার দোষে এই রোগ বৃদ্ধি পায়। কখন কখন অন্য রোগও ইহার হেতু হয়। এইরূপ নানা অবৈধ কারণেই কোষ্ঠাশ্রিত বিবৃদ্ধ বায়ু পিত্ত সংযোগে ঊর্দ্ধগামী হইয়া এই রোগ জন্মায়।

পেটফাঁপা, মল-মূত্রের অল্পতা, ভ্রম, মস্তক ঘূর্ণন, স্মৃতিশক্তির লোপ, শরীর কম্পন, অযথা ক্রোধ প্রকাশ, ক্ষুধামান্দ্য, নিদ্রাল্পতা, মূর্চ্ছা, চক্ষু লাল হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ সাধারণতঃ দেখা যায়। অত্যন্ত বৃদ্ধি অবস্থায় পক্ষাঘাতাদিও হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকালই এই রোগ বৃদ্ধির সময়।

চিকিৎসা বা প্রতিকার উপায় ঃ—এই রোগাক্রমণের প্রথমাবস্থা হইতে বায়ুর অনুলোমক এই রকম চিকিৎসা ও আহার-বিহারাদির ব্যবস্থাই সুযুক্তিযুক্ত।

আজকাল অনেক স্থলে দেখা যায়, কথায় কথায় যত্র-তত্রই ব্লাডপ্রেসার রোগ বলিয়া ব্যবহার হইতেছে এবং তাহাতে অতিরিক্ত দাস্ত করাইয়া, রক্ত মোক্ষণ করাইয়া, উপবাস বা স্বল্পাহারে রোগীকে দুর্ব্বল করিয়া রাখা হয়। এইভাবে ব্লাডপ্রেসারের বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য মতে বিশেষ চিকিৎসা।

আমার হাতেও এই ভাবে চিকিৎসান্তে পক্ষাঘাতাদি চরমদশা প্রাপ্ত হইয়া অনেক বৃদ্ধ ডাক্তারও চিকিৎসিত হইতে আসিয়া আরোগ্যান্তে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—বর্ত্তমানের অযথা উপবাসাদিই অকাল মৃত্যুর কারণ হইতেছে। বাস্তবিকই যতদিন যন্ত্র ছিল না,—ততদিন ব্লাডপ্রেসারে এত অধিক লোকের মৃত্যুর খবরও শুনা যায় নাই।

প্রকৃতপক্ষে এইরূপ ব্যবহার ফল আশু উপকারী হইলেও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিষ্টদায়ক। এই আসুরিক চিকিৎসায় অতিরিক্ত দাস্তাদির ফলে মন্দাগ্নি হইয়া, উদরাময়াদি নানা জটিল রোগ উৎপন্ন হয়, উপবাসাদি বা রক্তমোক্ষণ ফলেও শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নানা রোগ উৎপাদন করে এবং পরিণামে মৃত্যুই ঘটায়।

এক চিকিৎসা করিতে গিয়া, অন্য রোগ উৎপাদন করা সুচিকিৎসা নহে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

"প্রয়োগঃ শময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ।
নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ॥"

যে চিকিৎসা উপস্থিত ব্যাধির নিবারণ করিয়া অন্য ব্যাধির উৎপাদন করে তাহা সুচিকিৎসা নহে, যে চিকিৎসা উপস্থিত ব্যাধির শান্তি করে, অথচ অন্য রোগের প্রকোপ না জন্মায় তাহাই বিশুদ্ধ চিকিৎসা।

চরকাদি শাস্ত্রকারেরা চিকিৎসার্থে স্পষ্টই উপদেশ দিয়াছেন :—

"তত্র মারুত-ক্ষুত্তৃষ্ণা মুখশোষ ভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে ন বৃদ্ধে ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে।"

অর্থাৎ বায়ুপ্রধান, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষ ও ভ্রমান্বিতকে উপবাসাদি প্রয়োগ কখনই করিবে না। দুঃখের বিষয়, আজ-কাল অনেক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন কবিরাজ ধুরন্ধরেরাও ঐ ভাবে অতি দাস্ত, উপবাস ও রক্তমোক্ষণাদি দ্বারা চিকিৎসা করিয়া চমক লাগাইয়া ঐ ভাবে সর্ব্বনাশ করিতেছেন।

তাঁহারা একবার ভাবেন না, চরকসুশ্রুতাদি ঋষিরা, যাঁহাদের দোহাই দিয়া আমরা চলিতেছি, যাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্র প্রত্যেক চিকিৎসা শাস্ত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, যাহা অব্যয়, তাঁহারাই উপদেশ দিয়াছেন,—

"বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোয়ং ক্রিয়াক্রমঃ"

অর্থাৎ রোগীর যাহাতে বলাধিষ্ঠান হয় তদ্বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে করা উচিত। পূর্ব্বে যতদিন রক্তবিবৃদ্ধিচাপমান যন্ত্র উঠে নাই, প্রবীণ চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করিয়া বলাদি রক্ষাপূর্ব্বক পথ্যাদির ব্যবস্থা ও চিকিৎসা করিতেন; সুফলও যথেষ্ট পাইতেন। এখন এইরূপ আসুরী চিকিৎসায় নানা রোগ সংখ্যা বৃদ্ধি ও অকাল মৃত্যুই বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র। ব্লাডপ্রেসার রোগগ্রস্তকে অতি লঘু সহজপাচ্য অথচ বলকর ও বায়ুর অনুলোমক বা সরলতাকারক পথ্যাদি ব্যবস্থাই শ্রেয়ঃ ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দাদখানি বা অতি সূক্ষ্ম আতপ চাউলের অন্ন, সদ্য উত্থিত মাখন, ঘৈ, মাগুর প্রভৃতি লঘু মাছের ঝোল, পটল, মানকচু, কাঁচকলা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি সহজপাচ্য তরকারী, কাঁচামুগ বা কুলথ কলাইয়ের যূষ, শুষনী শাক, ব্রাহ্মীশাক, বেগুণ প্রভৃতি রুচিমত ব্যঞ্জন করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। রাত্রে ভাত অসহ্য হইলে দুধ খৈ, দুধ শটী প্রভৃতিই প্রশস্ত আহার। যাহাতে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দুধ সহ্য না হইলে সহ্য মত দধি বা ঘোল খাইতে পারেন; ইহা সুস্থের পক্ষেও অমৃত। দাস্ত পরিষ্কারার্থ ১।২ বার মাত্র দাস্ত হয় সেই ভাবে হরিতকি, বহেড়া, আমলকী প্রত্যেকে সমান মোট দুই তোলা চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বরাত্রে গরম জল আধপোয়া সহ ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ঐ ছাঁকা জলপানই যথেষ্ট। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঐ ত্রিফলার জলে নস্য লইলেও অত্যন্ত উপকার হয়, মস্তকস্থিত কুপিত জমা শ্লেষ্মাদি সব নির্গত হইয়া যায়, বায়ু ও পিত্তের সাম্য হয়। প্রাতে ঐ ত্রিফলার জল, বৈকালে শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, প্রত্যেক এক ভরি, সামান্য দুধ চিনি সহ খাইলে সুফল

ফলে, অথবা মৌরী এক ভরি, বড় এলাইচ চারি আনা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া প্রাতে এক ছটাক গরম জলে ভিজাইয়া ঐ ছাঁকা জল বৈকালে পান করিলে ঊর্দ্ধগত বায়ু বমি প্রভৃতি উপসর্গ কমিয়া যায়। স্মরণশক্তির অল্পতাদি ও গলার স্বরের বিকৃতি ঘটিলে, ব্যথাদির উপদ্রবথাকিলে, ব্রাহ্মীশাকের রস দুই ভরি, আলকুশী বীজ চূর্ণ এক আনা, সামান্য দুধ চিনি সহ খাইলে অল্প সময়েই সব উপসর্গ রহিত হয়। যাঁহাদের বহুমূত্র দোষ ও ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি আছে, কদলী মূল বা কন্দের (থোড়ের) রস দুই ভরি আন্দাজ খাইলে, উভয় দোষ নষ্ট হইয়া থাকে রক্তপিত্ত অর্থাৎ রক্ত বমন পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ।

ব্লাডপ্রেসার সহ হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতাদি উপসর্গ থাকিলে আলকুশী বীজ অনন্তমূল, অর্জ্জুনছাল, বেড়েলা, শালপানী, হরিতকী প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ ক্বাথ সামান্য চিনি সহ খাইলে চা সেবীর চা খাওয়ার কাজ হইবে, ব্লাডপ্রেসারের যাবতীয় উপসর্গে ইহা বিশেষ ফল দেখাইবে। পক্ষাঘাতাদি বহুমূত্রাদি অবস্থায়ও ইহা বিশেষ কার্য্যকরী।

অনিদ্রাদিতে মাথায় মানুষ্য স্তনদুগ্ধ তদভাবে পুরাতন ঘৃত, কাঁচা গো-দুগ্ধের পটি ব্রহ্মতালুতে দিলে, অথবা আমলকী কাঁজীসহ বাটিয়া দিলে বা কাঁচা আমলকী বাটা দিলে বিশেষ ফল দর্শে, মাত্র তাহা নহে, বমি প্রভৃতি সহ হৃদযন্ত্রণাদির উপসর্গও কমাইবার ইহা শ্রেষ্ঠ যোগ। ব্লাডপ্রেসার রোগীর পক্ষে অবগাহন স্নানই বিশেষ উপকারক, স্নানের সময় তিলের তৈল বা ফুলের তৈল মাখাই উচিত; তদভাবে নারিকেল তৈল, বাদাম তৈলও মন্দ নহে। স্নানের সময় মাথায়, পেটে ও কোমরের মেরুদণ্ড দেশে জলের নীচের কাদা অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক পুলটিস বা প্রলেপবৎ দিয়া লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার ও শরীর স্নিগ্ধ হয়।

ভয়ঙ্কর প্রাবল্য নানা উপসর্গযুক্ত অবস্থায় চিকিৎসকের অধীন হইতে হইবে। বিশেষ লিখা বাহুল্য। বায়ুপিত্ত যেই খানে বৃদ্ধি থাকে, তথায় ব্লাডপ্রেসার বা নাড়ীর গতি প্রভৃতি বৃদ্ধি থাকেই। মূল রোগের সাম্যে উপসর্গ রক্ত চাপাদি কমিবে, স্বতন্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন নাই বলিলেই চলে।

বীরবালক।

লেখক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১)

জ্বলন্ত গলুয়ে ছেলেটী দাঁড়ায়ে
সাহসে অটল সৈনিকের মত।
তাহারে ফেলিয়া গিয়াছে চলিয়া
সেনাদলে তার লোক ছিল যত॥

(২)

সমর নিভিল, রণ-ভূমে ছিল
শব দেহ পড়ে হাজার হাজার।
আগুণের শিখা ঝলকে উঠিল
দেখায় যুদ্ধের করাল আকার॥

(৩)

বালক তখনো আপনার স্থানে
দাঁড়ায়ে উজ্জ্বল মূরতি অটল।
জন্মাবধি যেন বল ধরে প্রাণে—
স্ববশে রাখিতে ঝটীকা প্রবল॥

(৪)

জনম লভিয়া বীর পিতা হতে
হয়েছে সে বীর প্রতি রক্তকণে।
বালক যদিও, তার দেহ হতে
গরবের তেজ স্ফুরে প্রতিক্ষণে॥

(৫)

আগুণের শিখা আঁকিয়া বাঁকিয়া
বীর বালকেরে বুঝি গিলে ফেলে।
তথাপি বালক যাবে না নড়িয়া
সেনানী পিতার আদেশ না পেলে॥

(৬)

কে দিবে আদেশ? সেনানী হোথায়
শব রাশি মাঝে জাহাজের খোলে।

নিহত হইয়া চিরতরে হায়!
লভিছে বিশ্রাম মরণের কোলে॥

(৭)

সাহসে বালক ফুকারিয়া বলে
হে পিতা আমার ত্বরা করে বল।
যে কাজে আমায় হেথা রেখেছিলে
তা' কি শেষ হল বল পিতা বল॥

(৮)

জানেনাকো আহা বাছারে আমার
সেনানী তাহার নিহত হইয়া।
কেবা আছে কোথা, ছেলে কোথা তার
মরণে সকলি গিয়াছে ভুলিয়া॥

(৯)

বালক আবার প্রাণের কাতর
মর্ম্মভেদী সুরে বলে ওঠে কেঁদে।
হে পিতা আমার বলগো সত্বর
আমার এস্থান পারি ছেড়ে যেতে?

(১০)

উত্তর দিবার কেহ নাহি ছিল
কামানের শব্দ তার কাণে এল—
সুদূর হইতে ভাসিয়া আসিল—
পরক্ষণে সব—সব থেমে গেল।

(১১)

অগ্নিশিখা শত সাপিণীর মত
জিহ্বা লক্ লক্ পরশি আনন।
ধরিবারে ধায়, কেশ ক্রমাগত
করিতে উদ্যত প্রলয় দাহন।

(১২)

শূন্য পানে চাহি দাঁড়ায়ে সে রহে
মরণ ঘাঁটির প্রহরী হইয়া।

হতাশা আগুনে তিলে তিলে দহে
তবু রহে বীর শপথ ধরিয়া ॥

(১৩)

বালক নারিল থাকিতে যে আর
প্রাণের আবেগে বলে ফুকারিয়া।
হে পিতা আমার বল একবার
রব কি এখনো বল ত্বরা করি॥

(১৪)

এদিকে আগুন এগিয়ে আসিল
মালিকা আকারে মাথা' পরে ঘিরি।
রশারশি পাল সব কিছু জ্বালি
খাণ্ডব দহন আকার ধরি ॥

(১৫)

এবারে আগুন খেলিতে লাগিল
এধারে ওধারে ছুটিয়া ছুটিয়া।
দানব তাণ্ডব! পতাকা ধরিল,
সকলের শেষে সর্প জিহ্বা দিয়া ॥

(১৬)

বালক বীরের মাথার উপরে
আগুণের শিখা শত শত শত।
খেলিতে লাগিল শূন্যে বায়ু ভরে
অগ্নি নিরমিত পতাকার মত ॥

(১৭)

একিরে সহসা আকাশ ভাঙ্গিয়া
পাড়ল মাথায় ভীম বজ্ররবে।
বালক সে বীর! পরাণ ফাটিয়া
যায় যে লিখিতে—কোথা তারে পাবে॥

(১৮)

জিজ্ঞাসা করহ পবনের কাছে
সিন্ধু পোতের যে ছড়ায়ে দিয়েছে।

খণ্ড গুলি নিয়া দূরে আর কাছে
জিজ্ঞাস তাহারে কোথা সে গিয়াছে॥

(১৯)

মাস্তুল হালের পতাকার আর
দিছিল উড়ায়ে সে দিন পবন।
এধারে ওধারে দগধ অঙ্গার
মহাবেগ-ভরে আবরি গগন॥

(২০)

শ্রেষ্ঠ সকলের বালক আছিল
মৃত্যুর পায়ে যে বলি আপনারে।
বিশ্বাসে হৃদয় পূরিয়া কিন্তুল
দাঁড়িয়ে পিতার ডাক শুনিবারে॥

পরীক্ষা।

লেখক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

অনুমান ও পরীক্ষা এই উভয় দ্বারা সকল বিষয়ের স্বরূপত্ব নির্ণীত হয়। চির-কালই পরীক্ষা গ্রহণের প্রথা আছে। এই পরীক্ষা গ্রহণ দ্বারা কৃতিত্ব প্রমাণিত হয়। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ দ্বারা ছাত্রমণ্ডলীর কৃতিত্ব নির্ণয় করিয়া প্রশংসা পত্র দেওয়া হয়। সেই তকমার বলে অনেক ছাত্র রাজ-প্রতি-স্থানে প্রবেশের অনুমতি পান, অনেকের তাহারি বলে সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে। ভগবানের বিশ্ব রাজ্যেরও এই নিয়ম। এই সংসার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে কে কে স্বর্গ গমনের অধিকারী, পরমানন্দ ভোগের অধিকারী ভগবান স্বয়ং তাহার পরীক্ষক। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য চরিত বর্ণনে ব্রজবাসি-গণের প্রতি বাল্য-সুলভ নানাবিধ উৎপীড়নের, উপদ্রবের কথা লিখিত আছে। ভগবান কোথাও গোপগণের অজ্ঞাতসারে গো-দোহনের বাধা ঘটাইয়া গো-বৎস সকলকে দুগ্ধ-পান করাইতেছেন। কোথাও কোন ব্রজবাসীর গৃহে ধীরে ধীরে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিয়া নবনী চুরী করিতে-

ছেন। বাহিরে আসিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে নাচিতে ব্রজবাসীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া নিজে নবনী ভক্ষণ করিতেছেন এবং বানরদিগকে ভক্ষণ করাইতেছেন। কোথাও দধিভাণ্ড, দুগ্ধভাণ্ড বিনষ্ট করিতেছেন। কোথাও নিজ মল মূত্র দ্বারা শুচিবাত-গ্রস্ত রমণীর গৃহ-প্রাঙ্গণ দূষিত করিতেছেন। ব্রজবাসীগণ গিয়া মা যশোদার নিকট অভিযোগ করিতেছেন। কেহ বলিতেছেন, "দেখ মা! তোমার গোপাল চুরি করেছে, নিজে খাচ্চে আর বানরদিগকে খাওয়াচ্চে।" কেহ বলিতেছেন, "মা! তোমার গোপাল আজ আমার বড় ক্ষতি করেছে, সব দধি দুগ্ধ নষ্ট করেছে, ভাণ্ডগুলি পর্য্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছে।" কেহ একটু ক্রোধের সহিত বলিতেছেন, "মা! তোমার গোপাল আজ আমার ঘর দুয়ার সব নষ্ট করে দিয়েছে। মা! ছেলে ভাল লাগে তা বলে কি ছেলের গু মূত ভাল লাগ্‌বে?" যশোদা বলিলেন, "দেখ, তোমরা তাকে গাল দিও না, গোপাল তোমাদের যা ক্ষতি করেছে আমি দিব।" সকলে কহিলেন, "ওমা! গালি-গালি দেব কি! তার হাসি দেখ্‌লে, তার মুখ দেখ্‌লে, ভাবভঙ্গি দেখ্‌লে আমরা সব ভুলে যাই। আমাদের কি অনিষ্ট কিছু মনে থাকে মা! গোপালকে ধর্ত্তে যাই গোপাল ধরা দেয় না, পাগলের মত নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর হাত তালি দেয়। মনে হয় যাক, যা করেছে তাই করেছে, গোপালকে একবার বুকে করে নিয়ে বুক ঠাণ্ডা করি।" যশোদা বলিলেন, "আমি এর পর গোপালকে বেঁধে রাখব।" ব্রজ বালকগণ বলিলেন, "মা! তা করোনা, তা হলে আমরা গোপালকে দেখতে পাব না।" ভগবান ব্রজাঙ্গনাগণের তাঁহার প্রতি ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, ত্যাগ আসক্তির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মহাত্মা শ্রীধর স্বামী হইতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত টীকা ও টিপ্পনীকার মহোদয়গণ শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের বাল্য লীলার এই ভাবের ব্যাখা করিয়াছেন। ব্রজ-বাসীগণ সাযুজ্য লাভের অধিকারী কিনা ভগবান বাল্যসুলভ এই অত্যাচার দ্বারা তাহাদের ত্যাগ, ভক্তি ও প্রেমের পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। আসক্তি, প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগের পরীক্ষা ব্যতীত কেহই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন না। এবিষয়ে একটি গল্পশোনা যায়। একদা কোন ব্রাহ্মণ বাজারে মাছ কিনিতে গিয়া ছিলেন, দেখিলেন, কোন মেছুনী একটী কাল প্রস্তর লইয়া মাছ ওজন করিতেছে। ব্রাহ্মণ প্রস্তর খণ্ডের প্রতি যত্নে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিলেন, সেটি শাল-গ্রাম শিলা, চক্রবিশিষ্ট অতএব ব্রহ্ম-শিলা। ব্রাহ্মণ মেছুনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মেয়ে! তুমি এটী কোথায় পেলে?" মেছুনী বলিল, "বাবা এটি আমি নদীতে

কুড়িয়ে পেয়েছি, এর ওজন ঠিক আধপোয়া।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মেয়ে! এটি তুমি আমাকে দাও, এর যা দাম হয় আমি তোমাকে দিচ্ছি।" মেছুনী বলিল, "বাবা! তুমি এটি নিয়ে কি কর্ব্বে? আমি এক ঝাল পড়েনের দাম পেলে দিতে পারি। বাজারে একটি পড়েন কিন্‌তে পাওয়া যায় না।" ব্রাহ্মণ মেছুনীকে দুইটি টাকা দিয়া শালগ্রামটি গৃহে আনিয়া পরম আনন্দে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পূজা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া ভগবান তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ করিলেন। "ব্রাহ্মণ! তুমি আমাকে মেছুনীর নিকট কালই দিয়া এস, নচেৎ তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বো, তোমার এক মাত্র পুত্র মারা যাবে।" ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন; এবং চক্ষের জলে মনে মনে বলিলেন, "বাবা! তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে, আমি তোমাকে ছেড়ে তোমার পূজা না করে থাক্‌তে পার্ব্বো না।" তাহার পরদিন তাহার পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। ব্রাহ্মণ তাহা নির্ম্মমভাবে সহ্য করিলেন, অভিমানে শাল-গ্রাম শিলার নিকট কয়েক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিলেন মাত্র। ব্রাহ্মণের প্রতি আবার স্বপ্ন হইল, "যদি নিজ কল্যাণ চাও মেছুনীর নিকট রেখে এস, নচেৎ তো-মার পত্নী বিয়োগ ও সর্ব্বস্বান্ত হবে।" ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদেবের পূজা করিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা! আমি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্ব্বোনা, তোমার ইচ্ছার উপর কি হাত আছে।" পরদিন অকস্মাৎ তাঁহার পত্নী মূর্চ্ছিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। গ্রামবাসীগণ সেই আটকুড়ো ঠাকুরটিকে গঙ্গাজলে ত্যাগ করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভগবানের প্রতি পরা নিষ্ঠা, ভক্তি বশতঃ কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিছুদিন পরে দৈববশাৎ ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্বান্ত হইল, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশিলাটি গলায় বাঁধিয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, দিবসের ষষ্ঠ ভাগে ভিক্ষালব্ধ-বস্তু শালগ্রামকে ভক্তিভাবে নিবেদন করিয়া ব্রহ্ম-শিলাটী গলায় বাঁধিয়া বৃক্ষতলে শয়ন ও রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। পুনশ্চ তাঁহাকে স্বপ্ন হইল "প্রাহ্মণ এখনও বল্‌ছি আমাকে মেছুনীর কাছে দিয়ে এস, নচেৎ কাল হইতে তোমার ভিক্ষা বন্ধ।" ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ তাঁহার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। ব্রাহ্মণের ভিক্ষা বন্ধ হইল, কেহই ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দেয় না, কেহ বলে হাত যোড়া, কেহ বলে অসুখ। ব্রাহ্মণ সারাদিন ভিক্ষায় ভ্রমণ করিয়া কিছু মাত্র না পাইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃক্ষপত্র ও জল ঠাকু-রকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের এক বস্ত্রও পরিধানের অনুপযুক্ত হইল। ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষতলে উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়া-

ইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই শালগ্রামটী একটী ঝুলিতে গলদেশে লম্বমান। এমন সময় মহাজ্যোতির্ম্ময় জনৈক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে এস, ঐ যে পাহাড় দেখ্‌ছ, উহার উপরে আমার আশ্রম, আমি তোমাকে বস্ত্র ও আহারীয় দেব। তুমি পরমানন্দে ঐ স্থানে থেকে তোমার বিষ্ণুর সেবা কর্ত্তে পার্ব্বে।" ব্রাহ্মণ সানন্দে সেই সন্ন্যাসীর অনুগামী হইলেন। পাহাড়ে কিছু দূর উঠিয়া দুর্ব্বল ব্রাহ্মণের পদস্খলন হইল, গলদেশে বদ্ধ শালগ্রাম শিলা কোথায় পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ উঠিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া শালগ্রামটী খুঁজিয়া পাইলেন না। সন্ন্যাসীও অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ বহুবিধ বিলাপ করিয়া উপাস্য দেবতার অদর্শনে জীবন ধারণ বৃথা বিবেচনা করিয়া প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পর্ব্বতের ক্রমনিম্নপথে ঝম্প প্রদানে উদ্যত হইলে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। তোমার আসক্তি, প্রেম, ভক্তি ও ত্যাগ তোমাকে অনন্ত সুখের অধিকারী করেছে। আমি তোমার অভীষ্ট দেবতা, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল, সাযুজ্য লাভ কর্‌বে।" ব্রাহ্মণ উপাস্য দেবতার দর্শনে তাঁহার শ্রীচরণে পতিত হইয়া তাহার অনুগামী হইলেন। এ সংসার পরীক্ষার স্থল, যে মানব ভগবানের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন তাহার জীবন মধুময় হয়, আত্মার পরমাগতি লাভ হয়। পরীক্ষার সময় একজন্মে উপস্থিত না হইতে পারে, কিন্তু আমরা অদৃষ্ট দেখিতে পাই না, সুকৃতির ফল কখনও বিনষ্ট হয় না, সুকৃতি ফলবান হইবার পূর্ব্বেই ভগবানের প্রতি প্রেম, ভক্তি, ও আত্মত্যাগের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। অতএব সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া পরীক্ষা দিবার জন্য সকলেরই প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

গোবর্দ্ধন জামাই!

লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাচস্পতি।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বিলাসপুর গ্রামে তারাচাঁদ মিত্র বাস করেন। তাঁহার গৃহিনীর নাম মনোরমা। তারাচাঁদ বাবুর পুত্র জন্মায় নাই, চারিটী কন্যা। গোবর্দ্ধন সেজ জামাই; গোবর্দ্ধন ঘরজামাই ছিল। তারাচাঁদ বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা সরলার বিবাহ। তারাচাঁদ বাবু বড় ও মেজ জামাইয়ের

উপর সমুদয় বিবাহের ভার দিলেন। গোবর্দ্ধনকে কিছুই করিতে বলিলেন না। গোবর্দ্ধন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। মনোরমা গোবর্দ্ধনের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁরাচাঁদ বাবুর নিকটে গিয়া বলিলেন, "দেখো কর্ত্তা! সেজ জামাই গোবর্দ্ধন ঘরজামাই হয়ে আছে বলে তুমি তাকে মোটেই দেখ্‌তে পার না। সরলার বিয়েতে তাকে কোন কাজের ভার দিলে না। সে আমার কাছে দুঃখু করে বল্লে, "বাবা আমাকে কোন কাজের ভার দেন না" তুমি তাকে গোব্‌রা বলে ডাকো—তুমি এক চোকো।" তাহা শুনিয়া তারাচাঁদ বাবু বল্লেন, গিন্নি! তুমি জান না—গোব্‌রা দুনিয়ার বোকা, তার মাথায় গোবর পোরা, তাকে যে কাজের ভার দেবো সে কাজটা মাটী হবে। মনে পড়ে কি—সেবারে তাকে একটা বেদানা কিনে আন্‌তে বলেছিলুম, তা সে সমস্ত কলকেতাটী ঘুরে বাড়ী ফিরে এসে বল্লে বেদানা পাওয়া গেলনা। আমি বল্লুম, "বেদানার অভাব কি?" তাতে সে বল্লে, "সব ফলেরই তো দানা আছে, বেদানা ফল কোথাও পেলাম না।" তার নিজের পায়ের এক জোড়া জুতো কিনে আন্‌তে বল্লুম, তা জুতা না কিনে টাকা ফিরিয়ে আন্‌লে, বল্লে কিনা, মাপ নেয়েতে ভুলে গিয়েছিলুম।" তাতে বল্লুম মাপের আবশ্যক কি, তোমার নিজের পায়ের জুতো কিন্‌তে গিয়েছ, মাপ তো কাছেই আছে।" তাতে বল্লে কিনা, "সকলকেই মাপ দিয়ে জুতা কিন্‌তে দেখলুম।" দেখলে গিন্না গোবরার বুদ্ধির দৌড় কেমন—আবার তাকে কাজের ভার দিতে অনুরোধ কর্‌তে এসেছ।" তাহা শুনিয়া গিন্নী আবার বলিলেন, "সে যাহা হউক, আমার মাথা খাও ওকে সরলার বিয়ের একটা সামান্য কাজের ভার দিয়েই দেখনা কেন।" তখন তাঁরাচাঁদ বাবু আর গিন্নীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে। গোবরাকে এবার দৈ ক্ষীরের হিসাব রাখ্‌বার ভার দিলুম। যাও, তাকে বলগে। আমি এখন বিয়ের ফর্দ্দটী ঠিক করিগে।" বলিয়া স্থানান্তরে গেলেন। কন্যা সরলা মায়ের নিকট আসিয়া বলিল, "কার বিয়ে! মা, এই বাবা বলছিলেন?" মনোরমা উত্তর করিলেন, "এই যে তোমার বিয়ে মা।" সরলা বলিল, "আমার যার তার সঙ্গে বিয়ে দিলে হবে না, আমি ভগবানের কৃপায় বি,-এ, পাশ করেছি EQual match হওয়া চাই কিংবা পাত্র আমার চেয়ে Superior হওয়া চাই, তা না হলে বে কর্‌বো না, মা!"—তাহা শুনিয়া মনোরমা বলিলেন, "ছি, ও কথা কি বল্‌তে আছে—আমরা যে বর ঠিক করেছি সেঅতি উত্তম পাত্র, এবার এম্‌, এ, পাশ দেবে, দেখ্‌তে যেন ঠিক কার্ত্তিক। কাল তোমার পাকা দেখা হবে।" তাহা শুনিয়া সরলা বলিল, "পাকা দেখা কি

মা? Ripe visit দেখারও কি আবার কাঁচা পাকা আছে? সে কি গাছের ফল? আমার মতে তোমরা নিজে না দেখে আমাকে পাত্রে দেখ্‌তে পাঠান কি ভাল নয়?" মনোরমা বলিলেন, "সরলা! ও কথা কি বল্‌তে আছে? তুমি যে কুলীনের ঘরের মেয়ে—হিঁদুর মেয়ে—তোমার কি ও সব সাজে? বাপ্, মা যা করবে তাই হবে. তার উপর কথা বলা উচিত নয়। তিনটে পাশ করে বুঝি তোমার এই বিদ্যে হয়েছে?" সরলা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিল, "তবে মা আমি বে করতে চাই না।" মনোরমা বলিলেন, "একি কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম? রাগ ক'রনা মা—ধীর হও, লেখা পড়া শিখেছো" তখন সরলা বলিল—"কিন্তু মা মনের মত স্বামী না হলে Divorce করবো তা তুমি নিশ্চয় জেনো।" মনোরমা সরলার ইংরাজি কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন? "সে কি? কি করবি! ডাভাস্ করবি? সে আবার কি? ভাল করে বুঝিয়ে বল্ মা! আমি ইংরিজি টিংরিজি জানিনে।" বল মা বুঝিয়ে বল সরলা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "Nonsense এই সামান্য কথাটা বোঝো না—divorce মানে ত্যাগ করবো- স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য স্বামী গ্রহণ করবো।" মনোরমা বলিলেন—"ও মা বলিস্ কিরে? কলির মেয়ে তিনটে পাশ করেই এতদূর বিদ্যে হয়েছে। চুপ্ চুপ্, একথা আর কেউ যেন শোনে না, তা হলে এক ঘরে করবে।" তখন সরলা অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিল "তোমার সঙ্গে আর বক্‌তে পারি নে, তুমি আমার মা হবার উপযুক্ত নও—Stupid. যাই, চা বিস্কুট খাবার সময় হয়েছে, যাই।" এই বলিয়া দ্রুত পদে চলিয়া গেল। মনোরমা কন্যার কথা শুনিয়া ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "ওমা হলো কি। পেটের সন্তান তিনটে পাশ করেই দেখ্‌ছি আমাদেরও অগ্রাহ্য করে। ঘোর কলি—ঘোর কলি—যাই ওদিকে কতদূর কি হচ্চে, দেখিগে।" এই বলিয়া মনোরমা বাটীর মধ্যে গেলেন। ঠিক সেই সময় নারাণ ঘটক, পাত্রের পিতা ভোলানাথ ঘোষ ও পুরোহিত হরিচরণ চক্রবর্ত্তী উপস্থিত হইয়া তারাচাঁদ বাবুকে ডাকিতে লাগিলেন। তারাচাঁদবাবু ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন "কাল পাকা দেখার দিন স্থির হয়েছিল, তা আজ এলেন কেন?" তাহাতে পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন "শুভস্য শীঘ্রং—শুভস্য শীঘ্রং, কাল দিনটা ভাল নয়, তাই আজই পাকা দেখা করতে এসেছি—কিছু মনে করবেন না।" তারাচাঁদবাবু বলিলেন, "তা-তা—আচ্ছা, তাই হবে—আমার সবই যোগাড় আছে।" পুরোহিত বলিলেন, "তবে পাত্রীটীকে আনান্—লগ্ন বয়ে যায়; পাকা দেখা করা যাক্।"

তারাচাঁদ বাবু চীৎকার করিয়া শ্যামাঝিকে ডাকিয়া কন্যা সরলাকে আনিতে বলিলেন। শ্যামা ঝি সরলাকে লইয়া উপস্থিত হইল। ঘটক ভোলানাথ বাবুকে আহ্বান করিয়া বলিল "দেখুন ঘোষজা মশাই! যা বলেছিলুম তাই কি না। এইবার আমার ঘটকালির সার্থকতা হল।" ভোলানাথ বাবু সরলাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "আচ্ছা মা! তোমার নাম কি!" সরলা বলিল "আমার নাম মিস্ সরলা বি. এ"। পুরোহিত বলিলেন "কি বল্লে মা, বিয়ে? হাঁ মা তোমার বিয়ে হবে! তবে আর কেন, এই বার ধান দুর্ব্বা দিয়ে আশীর্ব্বাদ করা যাক্।" সরলা বলিল "ধান দুর্ব্বা কি? youfool তাহা শুনিয়া পুরোহিত বলিলেন "পাকা দেখায় ফুলের দরকার নেই মা; বিবাহের সময় ফুলের দরকার; এখন নয় মা।" ভোলানাথ বাবু ধান দুর্ব্বা লইয়া সরলার মাথায় দিলেন, পরে একটী মোহর বাহির করিয়া সরলার হাতে দিয়া বলিলেন "আচ্ছা এস মা!" সরলা শ্যামা ঝিয়ের সঙ্গে চলিয়া গেল। হরি পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া তারাচাঁদ বাবুকে বলিলেন "মেয়েটী একটী প্রণামও কল্লে না—ব্যাপার খানা কি? তারাচাঁদবাবু বলিলেন "আর বলেন কেন? মেয়েটী বি, এ,পাশ করেছে, প্রণাম কর্ত্তে লজ্জা পায়। প্রণাম করা অভ্যাসও নেই। ও সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে আর মাথা গরম করবেন না; ত্রুটী মার্জ্জনা করবেন।"পুরোহিত পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলেন, "আগামী ২রা ভাদ্র শনিবার বিবাহের দিন স্থির হলো; ঐ দিন লগ্নটা সন্ধ্যার পরেই আছে।" তারাচাঁদবাবু বলিলেন "অতি উত্তম—শনিবার হলেই ভাল; আমিও তাই খুঁজিতেছিলাম; কেননা শনিবার হলেই পাঁচটা আফিসের লোক আস্‌তে পারবে।" ভোলানাথ বাবু বলিলেন "তবে অমরা এখন উঠি।" তারাচাঁদ বাবু বলিলেন—"তাকি হয় জলটল্ খান্—চলুন বাড়ীর ভেতর চলুন!" এই বলিয়া সকলকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

তার পর বিবাহ চুকিয়া গেল। পূর্ণ গোয়ালা দই ক্ষীরের দাম লইতে আসিল। পূর্ণ দরজায় আসিয়া তারাচাঁদ বাবুকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। ডাক শুনিয়া তারাচাঁদবাবু বাড়ীর ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন "কে হে বাপু?" পূর্ণ বলিল আজ্ঞে আমি পূর্ণ, দই ক্ষীরের দাম নিতে এসেছি।"তারাচাঁদ বাবু বাহিরে আসিয়া ফর্দ্দ চাহিলেন, পূর্ণ ফর্দ্দ দিল। তারাচাঁদ বাবু পূর্ণকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া গোবর্দ্ধন জামাইকে ডাকিলেন এবং তাহাকে হিসাব আনিতে বলিলেন গোবর্দ্ধন একটী হাঁড়ীর মধ্যে হিসাব রাখিয়া ছিল হিসাবটী শ্বশুর মশাইয়ের হাতে দিয়া চলিয়া গেল। তখন তারাচাঁদ বাবু পূর্ণকে

বলিলেন, "ওহে বাপু গয়লার পো, আজ যাও, কাল এসো আমি হিসাব মিলিয়ে দেখ্‌বো।" এই কথা শুনিয়া পূর্ণ চলিয়া গেল। তারাচাঁদবাবু জামাই গোবর্দ্ধনের হিসাব পরীক্ষা করিয়া রাগে অন্ধ হইয়া গিন্নীকে ডাকিলেন। মনোরমা দ্রুত-বেগে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি হয়েছে অত ডাকাডাকিকেন ?" তাহা শুনিয়া তারাচাঁদ বাবু বলিলেন—"ডাক্‌ছি কেন ? তোর মাথা আর মুণ্ডু, তোর জন্যে কি বাড়ী ছেড়ে যাবো ?" মনোরমা বলিলেন, "বলনা কি হয়েছে, অত চটো কেন ? তারাচাঁদ বাবু বলিলেন, তবে শোন্ মাগী জামাই কেমন ক্ষীর দৈয়ের হিসাব রেখেছে শোন্।" একটি ফর্দ্দ লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন "এই শোন্ দৈ আসিল, ফের দৈ আসিল, আবার দৈ আসিল, পুনরায় দৈ আসিল, ফের আবার দৈ আসিল, পুনরায় আবার দৈ আসিল। "আর একটা ফর্দ্দ লইয়া আবার পাঠ করিতে লাগিলেন "ক্ষীর আসিল ফের ক্ষীর আসিল, আবার ক্ষীর আসিল, পুনরায় ক্ষীর আসিল, ফের আবার ক্ষীর আসিল, পুনরায় ক্ষীর আসিল, পুনরায় আবার ক্ষীর আসিল, কিন্তু কত সের দৈ বা ক্ষীর আসিল কিছুই লেখেনি—এখন উপায় কি, হিসাব কি করে মেলাব। এই নে তোর্ মাথা আর মুণ্ডু—তোর পিণ্ডি—তুই জামাই নিয়ে থাক্‌গে যা—আমি তোদের ত্যাগ কল্লুম।" এই বলিয়া তারাচাঁদবাবু বাড়ীর বাহিরেযাইতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া মনোরমা বলিতে লাগিলেন,আচ্ছা,অত চটো কেন ? না হয় জামাই একটা ভুল করে ফেলেছে তার কি মাপ নেই ?"তারাচাঁদ বাবু বলিলেন," আমি তো আগেই বলেছিলুম গোবরা কোন কাজের নয়। আর এ ভিটায় অন্ন জলস্পর্শ করবো না।" এই বলিয়া তারাচাঁদ বাবু দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন। ঠিক সেই সময়ে গোবর্দ্ধন জামাই শ্বাশুড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল "মা, মা, আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি, বাবা বকেছেন, এই বিষ খাই (বিষপান ও পতন) মনোরমা এই ব্যাপার দেখিয়া করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, "ওগো আমার সর্ব্বনাশ হলো আমার স্বামী জামাই দুই গেলো"।

হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সোমবার ২৫ এ আশ্বিন ১৩৩৮

কলিকাতা হইতে এখানে আসিবার পূর্ব্বে হরিদ্বারে শীতের প্রকোপের যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহা একরাত্রি বাস করিবার পর অমূলক বলিয়াই প্রতি-পন্ন হইয়াছে। শেষরাত্রির দিকে একপ্রকার পর্ব্বত-সঞ্চারী সুষীম বায়ুস্পর্শে হরিদ্বারের বর্ত্তমান আবহাওয়ার কতকটা পরিচয় পাইয়াছিলাম। (১)

অতি প্রত্যূষে আমরা শহর দর্শনে বহির্গত হইলাম। সম্মুখে-পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই নভোন্নত শৈলশ্রেণী যেন পর-স্পর হাতাহাতি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গঙ্গা যেখানে শিবালিক পর্ব্বতের কন্দর হইতে সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহারই নাতিদূরে দক্ষিণতীরে এই শহরটী অবস্থিত। গঙ্গা এখানে খুবই সঙ্কীর্ণ, তাহা বলিয়া স্রোতের প্রখরতা অল্প নহে। তীব্রস্রোতে নামিয়া স্নান করা অসম্ভব বলিয়া সোপান-সংলগ্ন লৌহ-শৃঙ্খল ধরিয়া অবগাহন করিতে হয়। স্থানটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে সমাকীর্ণ। বৃহ-দ্ধর্ম্মপুরাণ ঠিকই বলিয়াছেন,—"হরিদ্বারং ততস্তত্র সপ্তস্রোতঃ প্রকীর্ত্তিতম্।" গঙ্গার বামতটস্থ চণ্ডীপাহাড়ের দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। অক্ষাংশ ২৯°৫৮' উঃ; দ্রাঘিমা ৭৮° ১০' পূঃ। সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা ১,০২৪ ফুট। শহরটী বিশেষ বড় নয় বলিয়া অধিক যাত্রী-সমাগমে স্থানাভাব প্রচুর। জনসংখ্যা অন্যূন ৩০,০০০। অধিবাসীদিগকে ধর্ম্মভীরু ও শান্তিপ্রিয় বলিয়াই বোধ হইল। তাহারা সাত্ত্বিক আহারের যতটা পক্ষপাতী এমন আর কিছুরই নহে। মৎস্য-মাংস এখানে সুদুর্লভ, কারণ এখানকার লোকচক্ষুতে জীবহত্যা মহাপাপ। গঙ্গাজলে মৎস্যের যেরূপ বাহুল্য, এমন আর কোথাও দেখি নাই। মহাপুরুষের পদরজঃ লইতে ইতরসাধারণ যেরূপ জনতার সৃষ্টি করে, এই নির্ভয়ে বিচরণশীল মহাশউল মৎস্যগুলি স্নানরত নরনারীর পদপ্রদক্ষিণ করিতে তদধিক ব্যস্ত! আবার চিড়া, মুড়ি, খই খাওয়াইলে তো কথাই নাই। হরিদ্বারের মৎস্যগুলিকে এত শুভদৃষ্টিতে

(১) বাদশাহ জাহাঙ্গীর যে একসময়ে এখানে স্বাস্থ্যান্বেষণে আসিয়াছিলেন তাহা তাঁহার আত্মচরিত হইতে জানা যায়।

দেখিবার কারণ, ইহারা পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর গর্ভসঞ্জাত। গঙ্গাজল পবিত্র, সুতরাং ইহার অধিবাসীরাও পবিত্র না হইবে কেন! কবি নীলকণ্ঠের পদাবলী মনে পড়িতেছে,—

"তব তীরে হই শরট কমট,
কিম্বা তব নীরে কুম্ভীর কমঠ,
সেও ভাগ্য মানি তট-সন্নিকট
জন্মি যদি আসি কীট পতঙ্গে।" (২)

হরি-কি-পৈড়ী ঘাটে বিষ্ণুর চরণচিহ্ন দেখিলাম এবং Superstition এর অপ্রতিহত প্রভাব উপলব্ধি করিলাম। হিন্দু-সাধারণের বিশ্বাস এই ঘাটে স্নান করিলে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়। এই ঘাটের জল বহু দূরবর্ত্তী দেশে যাত্রীরা লইয়া যান ও ইহার জলে তাঁহাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের ভস্মাস্থি আনিয়া বিসর্জ্জন দেন, ইহাতে নাকি পূর্ব্বাপর পিতৃগণ স্বর্গে গতিলাভ করেন (৩) বেশী কথা কি, সগরসুতগণের কি হইয়াছিল?

"যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গাতোয়ে প্রতিষ্ঠতি।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে॥" (৪)
"যত্র কুত্রস্থিতং মাংসমস্থি গঙ্গাজলং লভেৎ।
মৃতস্য সোঽপি নির্যাতি স্বর্গলোকমনাময়ম্॥ (৫)

সে হিসাবে সুরশৈবলিনীর গর্ভোদ্ভূত মীনদল সৌভাগ্যশালী ও সুপবিত্র বলিয়াই

(২) "তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।"—শঙ্করাচার্য্য

(৩) এ বিশ্বাস যে মহাভারতের যুগেও বলবৎ ছিল তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ আছে। খাণ্ডববনে অগ্নিদাহের ফলে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তী ও গান্ধারীর মৃত্যু হইলে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব গঙ্গাদ্বারে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং তাঁহাদের ভস্মাস্থি মহাসমারোহে গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করেন (আশ্রমবাসিকপর্ব্ব, ৩৯ অঃ, ১৪—২২ শ্লোক)। মহাতেজা শান্তনুর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ভীষ্ম গঙ্গাদ্বারে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিকক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন (অনুশাসনপর্ব্ব, ৮৪ অঃ, ১১ শ্লোক; বনপর্ব্ব, ৮১ অঃ, ১৪-৫ শ্লোক)।

(৪) পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৬২ অঃ, ৬৬ শ্লোক।

(৫) শ্রীমহাভাগবত, ৭৪ অঃ, ৪ শ্লোক।

বা বিবেচিত হইবে না কেন? এখানকার বিস্তৃত বাঁধান সমতল ঘাটটীর উপর সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণ করিতে যেরূপ আরাম তেমন আর কোথাও নহে। একটী বাঁধান স্থান হইতে পৈড়ী ঘাটের সম্মুখের অপর একটী সমতল বাঁধান চত্বরে যাইতে হইলে একটা ছোট সেতু অতিক্রম করিতে হয়। জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি বিনা এই স্থানের চিত্র লওয়া নিষিদ্ধ। সরকারী কর্ম্মচারী ভিন্ন অ-হিন্দুর পক্ষে এই সেতু-ব্যবহার অন্যায়। এই মর্ম্মে এ্যামেল-প্লেটের উপর ঘাটের সন্নিকটে দারুদণ্ড-সংলগ্ন একটী নোটিস্ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই ঘাটের উপর যে ক'একটী দেবমূর্ত্তি বা মন্দিরাদি আছে তাহা সৌন্দর্য্য-গৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধ নহে। তবে প্রাচীন গঙ্গামন্দির পরিদর্শন বোধ হয় প্রত্যহ স্নানকারী সকলেই করিয়া থাকেন। মন্দিরটী ছোট হইলেও বেশ সুসজ্জিত। গঙ্গাজীর মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে ক'একটী দেব-দেবতার মূর্ত্তি বিরাজমান। জরীর কাজকরা পোষাকে মূর্ত্তিগুলি সততই সমুজ্জ্বল। মন্দিরগুলির নাম,—গঙ্গাভাগীরথী, গঙ্গানারায়ণ ও হরিনারায়ণ, বদ্রীনারায়ণ ও সত্যনারায়ণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও হরিনারায়ণ, শ্রীনৃসিংহ অবতার, শ্রীশ্রীগায়ত্রী, শ্রীশ্রীনবগ্রহ, শ্রীশ্রী-লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি। তাহা ছাড়া, শৃঙ্গেরী মঠ, গুরুদ্বার জ্ঞান-গুদ্রী, বয় স্কাউট্স্ আসোসিয়েসন, কংগ্রেস-কমিটী অফিস, অনাথ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম প্রভৃতি গৃহাবলীও গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

এখান হইতে বাজারের পথে চলিলাম। দোকানগুলি বিশেষ বড় না হইলেও শিল্পসামগ্রীতে বেশ সুসজ্জিত। পিতল ও কাঁসার বাসন এখানে সুলভ। কারুকার্য্যখচিত ফুলদানী, ঘট-বাটী-বেকাব ও রকমারি লাঠি দেখিলেই কিনিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। তরি-তরকারী ও খাদ্যদ্রব্যের দোকান এবং হোটেল-সরাই গুলি ঘনসন্নদ্ধ। শুনিলাম এখানে অন্যূন ৪৪টী ধর্ম্মশালা আছে। নবাগতের নিকট তাহাদের অররি সতত অবারিত।

হট্ট-বিপণীর শোভা-সন্দর্শন করিতে করিতে বেলা অনেক হইল, সুতরাং অবিলম্বে গৃহে গিয়া স্নানাহারের আয়োজন করিতে হইল।

* * *

সূর্য্যাস্তে পুনরায় পৈড়ী ঘাটে আসিয়া বসিলাম। এই ঘাটের সায়াহ্ন-দৃশ্য বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের সমতুল্য। কোথাও বালব্রহ্মচারী সমস্বরে বেদ উচ্চারণ করিতেছে, কোথাও ধর্ম্মশাস্ত্রের কথকতা হইতেছে, কোথাও সন্ন্যাসী-দিগের সান্ধ্যভোজ হইতেছে, আবার কোথাও জনৈক কৌপীনধারী তেজো-

দীপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিতেছেন আর তাঁহাকে ঘেরিয়া অসংখ্য শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও সুরতানলয়-সমন্বিত যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে সারা ঘাট মুখরিত হইতেছে; কোথাও কোনও ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা নির্জ্জনপ্রান্তে উপবেশন করিয়া ধ্যানমৌন হইয়াছেন; কোথাও কৌতুকপ্রিয় নরনারী খই-চিড়া খাওয়াইয়া মৎস্যদলের জলকেলি দেখিতেছেন আর দলে দলে লোক আসিয়া সেইখানে জড় হইতেছে। কিন্তু সব চেয়ে বিস্মিত হইলাম শিখ-ভাইদিগের আচরণ দেখিয়া। গুরু অমরদাস শিষ্যদিগকে হরিদ্বার, বারাণসী প্রভৃতি হিন্দু-তীর্থ-পরিদর্শনে প্রতিবন্ধকতা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'হরমন্দোয়ার' শিখদিগের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। এখানকার গুরুদ্বারে বিধিমত গ্রন্থসাহেবের পূজারতি হইয়া থাকে। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী মর্ত্ত্যবাসী সকলকার, তাই বোধ হয় এখানে সর্ব্বসম্প্রদায়ের একত্র সম্মেলন। হরিদ্বারে না আসিলে গঙ্গার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। শাস্ত্রবাণী সত্য হউক মিথ্যা হউক, লোকের সুদৃঢ় বিশ্বাস :—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥" (৬)

এমন কি "দর্শনমাত্রেণ দূরতো যাতি পাতকম্"। কেননা;

"গঙ্গাতীর্থং মহৎ পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
লোকাঃ সর্ব্বে বদন্ত্যেবমেতত্তীর্থোত্তমোত্তমম্ ॥" (৭)

কেননা :—

"দেবানাং প্রবরো বিষ্ণুর্যজ্ঞানাঞ্চাশ্বমেধকঃ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষানাং নদী ভাগীরথী সদা ॥" (৮)

কেননা

"সাক্ষাদ্ধর্ম্মদ্রবৌঘং মুররিপুচরণা-
ম্ভোজপীযূষসারং দুঃখস্যাব্ধেস্তরিত্রং

(৬) পদ্মপুরাণ; সৃষ্টিখণ্ড, ৬২ অঃ, ৭৬ শ্লোক; উত্তরখণ্ড, ২০ অঃ ৮ শ্লোক; ঐ ২২ অঃ, ২ শ্লোক; ঐ, ৮১ অঃ, ৩৬ শ্লোক। বিষ্ণু-পুরাণ, দ্বিতীয়াংশ, ৮ অঃ, ১১৬ শ্লোক।

(৭) পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২০ অঃ, ৭ শ্লোক।

(৮) পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৮১ অঃ, ৪২ শ্লোক।

সুরমনুজনুতং স্বর্গসোপানমার্গম্
সর্ব্বাংহোহারিবারি প্রবরগুণগণং।" (৯)

পদ্মপুরাণ আরও বলেন;—

"সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥" (১০)

আবুল-ফজল লিখিয়াছেন, রাজদরবার পঞ্জাবে অবস্থানকালে পানীয়জল সকল সময় হরিদ্বার হইতেই সরবরাহ হইত। (১১) কবিকঙ্কণের ভাষায় বলিতে গেলে—

"গঙ্গার মহিমা যত, এক মুখে কব কত,
বিস্তারিত অনেক পুরাণে।"

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে দিগ্‌দিগন্ত বিলীন হইল। ঘাটস্থ বিজলী-বাতী একে একে জ্বলিয়া উঠিল। মন্দিরে মন্দিরে সান্ধ্যবন্দনা সুরু হইল। ক্রমশঃ যেন মনে হইল গঙ্গার স্বরতরঙ্গ আমার অন্তরের পবতে পরতে মূর্চ্ছনা জাগাইয়া অন্তরের পথে উধাও হইতেছে। জীবনে এরূপ তন্ময়তা খুব অল্পক্ষণের জন্যই আসিয়াছে। গঙ্গার নির্ম্মল নীল জলে অসংখ্য তারকা-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু, ও কি! ও কি মর্ত্ত্যললনা না দিগঙ্গনাদের একটীর-পর-একটী অযত্ন-স্খলিত শিরোভূষা গঙ্গার খরস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দৃষ্টির অগোচর হইতেছে? আহা, যদি ঐ পুষ্পপূর্ণ পর্ণপুটের মত নিরুদ্বেগে নিরুদ্দেশে যাত্রা করিতে পারিতাম!

মৃদুমন্দগতিতে চলিতে চলিতে অবশেষে সর্ব্বনাথের মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলাম। বহুচূড়ায় সুশোভিত নয়নাভিরাম এই মন্দিরটী একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গন মধ্যে অবস্থিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে দ্বিতল অট্টালিকাসমূহ শোভমান। মন্দির মধ্যে সর্ব্বনাথদেবের মূর্ত্তি ভিন্ন পশুপতিনাথ (লিঙ্গ), গঙ্গাযমুনাসরস্বতী (মর্ম্মরমূর্ত্তি), হনুমান, বলীবর্দ্দ প্রভৃতি বিরাজিত।

(৯) পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ২২ অঃ, ১৯ শ্লোক।

(১০) ক্রিয়াযোগসার ৩ অঃ, ১৪ শ্লোক। শ্লোকটি কূর্ম্মপুরাণেও আছে, পূর্ব্বভাগ ৩৬ অঃ, ৩২ শ্লোক।

(১১) Ayeen Akbery, 1783 p: 48: (tr: Ecladwin)

অতঃপর ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিতে না করিতেই ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধায়ক জনৈক হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল যে, রেজিষ্টারে আমাদের নাম-ধাম লিখান হয় নাই, তাহা এইবার লিখাইয়া দিতে হইবে। তাহার অনুরোধ বিনা বাক্যব্যয়ে রক্ষা করিলাম। প্রশ্নচ্ছলে জানিতে পারিলাম তাহার মাসিক মাহিয়ানা মাত্র ৫৲ টাকা। ধর্ম্মশালার নিম্নতলের একটি প্রকোষ্ঠে সে আজ অনেক দিন আছে। বৎসরে বৎসরে বিভিন্ন জাতীয় বহুল নরনারী এই ধর্ম্মশালায় আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ধর্ম্মশালা বৎসরের কোন সময়েও শূন্য পড়িয়া থাকে না। তবে আমি তাহাকে জানাইলাম যে, তাহার অধীনস্থ ধর্ম্মশালার প্রশস্ত প্রাঙ্গন, দরদালান ও আলোকবায়ুপূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরের অসদ্ভাব না থাকিলেও আমাদের প্রধান অসুবিধা উপরতলে জলের কল এবং রসুইখানা না পাওয়া। সে আমাকে আশ্বস্ত করিল যে, কল ও রসুইঘর শীঘ্রই স্থাপন করা হইবে এবং প্রমাণস্বরূপ পকেট হইতে বাহির করিয়া এক টুক্‌রা রসিদ দেখাইল তাহাতে সাহারাণপুরে চুণ-শুরকি প্রভৃতির অর্ডার দেওয়ার কথা লেখা রহিয়াছে এবং মহা আগ্রহে আমাকে উপরে লইয়া গিয়া এখনও অব্যবহৃত কতকটা জায়গা দেখাইয়া বলিল যে, ঐখানেই কল্পিত কলঘর ও রসুইঘর নির্ম্মিত হইবে। কিন্তু উপরে কলঘর করিলেও জল উঠিবার উপায় নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সারা সহরের জল জ্বালাপুর হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। জ্বালাপুর হরিদ্বার হইতে তিন মাইল দক্ষিণে। এই ধর্ম্মশালায় যে তাড়িত সংযোগ আছে তাহা জনৈক বদান্য ব্যক্তির কীর্ত্তি। তদ্ভিন্ন একপ্রান্তে একটি পাম্পকূপও আছে।

চৈত্রের চিতা।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

আজি এই মধুর সন্ধ্যায়
কার তরে আঁখি ভরে আসে বাষ্প? হায়!
সে পিয়া চলিয়ে গেছে
জনমের মত
তাই ভাগ্যহত কাঁদে অবিরত—
এই খানে।
এই বাপীতীর-সন্নিধানে
কুসুমিত কুঞ্জে বসি জুড়াতাম হিয়া
কত অতীতের কথা
কহিয়া কহিয়া।
আজি এই বসন্ত সন্ধ্যায়
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি-রবে সরঃ কি ব্যথা জানায়?
তপ্ত সমীরণ শ্বাস
বুকভরা হাহাকার আনে
পূরবীর বৈরাগ্য নিশ্বাস
নিয়ে যায় মর্ত্ত ছাড়ি কোন্ অচেনার পথে
কে বা জানে?

অই হেরি নীল নভস্তলে
সান্ধ্যতারা দিশাহারা, শূন্য দিঠি সর্ব্বহারা
বাষ্পভরা আঁখি যেন মরে পলে পলে।
কিন্তু অই অসীমবিহারী,
একদিন ছিল চিত্তহারী
মিলনের অগ্রদূত দেবদূত বলি
হাসিত প্রেয়সী মোর
আজি হায় সে তারাটি
বিষাদের প্রতিমাটি!
নয়নের গুণে নহে চিতের দাহনে
বিপরীত হেরি সবই, হেরি হেরি ফেলি আঁখি লোর।

পরভৃত ! নিভৃতে বসিয়ে
আর কেন গাও ?
কুহু রবে হু হু করে প্রাণ মোর মাথা খাও
চলে যাও নিকুঞ্জ ত্যজিয়ে।
আমার সুখের নিশি
নিশীথে গিয়েছে মিশি
ঘোর অন্ধকারে মগ্ন আলো নাহি পাই গো !
নিদাঘের হাহারব প্রসারিছে মনে
কোথা শান্তি পাই গো ?

ভ্রমর গুঞ্জন আর কোকিল কূজন
একদিন মধুর স্বপন
আনিত চিতের মাঝে
আজি আর ফুলে গন্ধ নাই অন্ধ, শোভা দেখিতে না পাই
যদিও কবির চক্ষে সুন্দরী ধরণী রাজে।
"সুন্দর দেখার আঁখি" আর নাই দেহমাঝে।

(অই) তটিনীর কল তান
কত না করিত দান
সন্তোষ আমায় রে
আজি সেই নদী কূল
হয়েছে আঁখির শূল
আনন্দ না পাই রে।
হে প্রভু ! জীবন-নাট্য-রচয়িতা স্বামি !
আর কত দিন স্মৃতি
জাগায়ে রাখিবে ?
আর যে বহিতে নারি আমি,
কত ভার এ দেহ সহিবে ?
দিন দিন তনু ক্ষীণ
হীনবল চিরদিন
সকলি গিয়েছে, আছে স্মৃতি দীপ্তিমতী
চিতায় দহিবে যবে পাইব নিষ্কৃতি।

স্বর্ণ ঘটিত
অমৃত সালসা

এই "স্বর্ণঘটিত অমৃত-সালসা" সেবনে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল দেহ সবল ও মোটা হয়। পারাজনিত রক্তবিকৃতির পরিণাম কুষ্ঠ, সুতরাং যে কোন প্রকারে রক্ত দূষিত হউক না কেন, পরিষ্কার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সালসা মহর্ষি চরকের আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় সালসা। তোপচিনি, অনন্তমূল প্রভৃতি প্রায় ৮০ প্রকার শোণিত সংশোধক ঔষধ সংযোগে প্রস্তুত। আমাদের "অমৃত সালসা" সেবনে মলমূত্র ও ঘর্ম্মের সহিত শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অন্যান্য হাতুড়ে কবিরাজের পারা-মিশ্রিত সালসা নহে। ইহা কেবল গাছ-গাছড়া ঔষধে স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত। **পরীক্ষা**—"অমৃত সালসা" সেবনের পূর্ব্বে একবার আপনার দেহ মাপিয়া রাখিবেন এবং দুই সপ্তাহ মাত্র সেবনের পর পুনরায় দেহ ওজন করিয়া দেখিবেন, পূর্ব্বাপেক্ষার ওজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, মাত্র সাতদিন এই সালসা সেবনের পর হস্ত পদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন, শরীরে তরল আলতার ন্যায় নূতন রক্তের সঞ্চার হইয়াছে। তখন আশায় বুক ভরিয়া যাইবে, শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে। এ পর্য্যন্ত কোন লোকেরই তিন শিশির বেশী সেবন করিতে হয় নাই। মূল্য ১শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা, ৩ শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ১৲ টাকা ৬ শিশি ৪৷৷০ টাকা, মাশুল ১৷৷০ টাকা,

শ্রীগোপাল তৈল।

মৃগনাভি ঘটিত "শ্রীগোপাল তৈল" ব্যবহারে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শিথিল ইন্দ্রিয় যুবার ন্যায় সুদৃঢ় ও স্বতেজ হয়। ইন্দ্রিয়ের বক্রতা, ক্ষুদ্রতা, শিথিলতা, শক্তি হীনতা, উত্তেজনারাহিত্য, পুরুষত্বহানি এক শিশিতেই আরোগ্য হইবে। মূল্য এক শিশি ১৲ টাকা মাশুল ।৶০ আনা, তিন শিশি ২৷৷০ টাকা, মাশুল ১৲ টাকা।

শ্রীমদনানন্দ মোদক।

মহাদেব লঙ্কেশ্বর রাবণকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দ বৃদ্ধির জন্য, এই শ্রীমদনানন্দ মোদক মহৌষধ দান করিয়াছেন। রাত্রিবেলার আনন্দ ও ক্ষুধা-বৃদ্ধির জন্য সন্ধ্যাবেলা একমাত্রা ঔষধ সেবন করিবেন। প্রাণে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি পাইবেন, ক্ষুধা দ্বিগুণ হইবে। একমাত্রা সেবনে যে কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি তাহা অনির্ব্বচনীয়। মূল্য ২১ মাত্রা পূর্ণ কৌটা ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, তিন কৌটা ২৲ টাকা, মাশুল ।৶০ আনা; এক সের ৮৲ আট টাকা।

কবিরাজ—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, পোঃ হাটখোলা কলিকাতা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেরই মুক্তকণ্ঠে সু-প্রশংসিত ও ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্ত বাটীর অমূল্যনিধি বিশ্ববিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম যাবতীয় চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

বিনা অস্ত্রে ছানি আরোগ্য
পদ্মমধু

কে না জানে চক্ষু না থাকিলে অন্ধের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয় ?

অতএব চক্ষুপীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিত **পদ্মমধু** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিধ্য চক্ষুপীড়ায় বিশুদ্ধ **পদ্মমধু** তুল্য মহৌষধ আর দ্বিতীয়-নাই। একবার ব্যবহার করিলেই অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইবেন। সাবধান! ক্রয় কালে এন্ দত্ত ব্রাদার্স নাম দেখিয়া লইবেন। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ এক টাকা, ৩ ড্রাম ২৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা। **এন্ দত্ত ব্রাদার্স**

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট।

আহিরীটোলা কলিকাতা।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS

39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.

Janmabhumi Registered No C. 284.

২৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি

সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

[৩৭শ বর্ষ] ১৩৩৮ ফাল্গুন, [১১শ সংখ্যা]

১।	শ্রীমদ্ বালানন্দ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৩২১
২।	হারাধনের স্বর্গলাভ—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথভট্টাচার্য্য বাচস্পতি	৩৩৮
৩।	বীরভূমির তীর্থ—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর	৩৪১
৪।	ভিক্ষা ও প্রেম—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনাথ রায় ...	৩৪৪
৫।	জগতে—শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু বি. এ, ...	৩৪৪
৬।	শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতা-প্রকাশিকা—শ্রীযুক্ত তারানন্দ ব্রহ্মচারী	৩৪৫
৭।	কর্ম্মবিপাক——শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪৭
৮।	দেবতার বাহনতত্ত্ব	৩৪৮

জন্মভূমির প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

15-8-32

বেরিয়া জারমলীন ধোলাই

এক দিনে ভরভরাট্ ! পথ্যের বিচার নাই।

মূল্য ৸০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲, পাইকারী দর আরও সুলভ।

জারমলীন লিমিটেড, কাঁসকাণ্ডা।

৩৭ নং ওল্ড রসা রোড, কলিকাতা

Telegs GERMLINEG Telephone No.

স্থাপিত—১৮৩৩

ঘড়িওয়ালা

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য হীরা চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারিং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত

অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ।৵ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৬৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

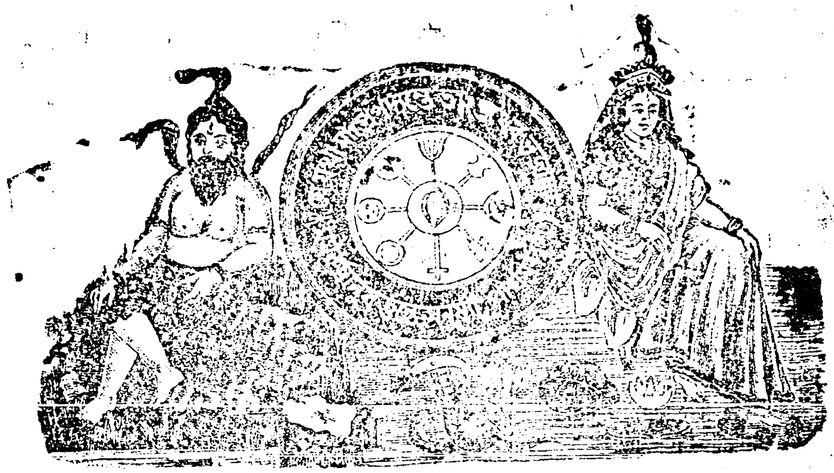

ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ } ১৩৩৮ সাল, ফাল্গুন { ১১শ সংখ্যা

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুমুখনিঃসৃত উপদেশাবলী।

শান্তি মিলনেকো তিনো উপায়।
"বিচার" "অভ্যাস" বৈরাগ্যো সহায়॥

শান্তি লাভ করিতে হইলে তিনটী উপায়-গ্রহণ কর্ত্তব্য—ইহা হইতেছে বিচার, অভ্যাস ও বৈরাগ্যাবলম্বন॥

(১) বিচার—বিচার কা নাম। হয় মনন। কৈছে পূর্ণানন্দ পাওয়ে জন॥

বিচার বিনা শান্তিলাভের অন্য উপায় নাই এজন্য উক্ত হইয়াছে :—

"বিনা বিচারাৎ কুতো শান্তিঃ
বিনা শান্ত্যাঃ কুতো সুখম্" ?

শ্রীভগবানও গীতা-শাস্ত্রে বলিয়াছেন "অশান্তস্য কুতো সুখম্"॥ সুতরাং বুঝিতে হইবে যে এ বিচার কি ?

"কোঽহং কথমিদং জাতং কো বৈ কর্ত্তাস্য বিদ্যতে
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ।"

অর্থাৎ আমি কে, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যাহা দেখিতেছি তাহার কিরূপে উৎপত্তি হইল, কে ইহার কর্ত্তা, কোন্ উপাদানে ইহা সৃষ্ট হইল—এইরূপ এইরূপ নানা অনুসন্ধানকেই বিচার বলে।

এই কয়েকটীই হইল মূল বিচার। এ কয়েকটী ভাল করিয়া বুঝিলেই অন্যান্য বিচার সহজ হইয়া আইসে।

(ক) "আমি" বা "অহং" কে ?

এই বিচারগুলির মধ্যে প্রথমেই বলা হইল "কোঽহং।" বাস্তবিক মনুষ্যমাত্রেরই এই "অহং" বা "আমি" জ্ঞান থাকিলেও বিচার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে না যে "অহং" কি ? প্রথম বিচার আরম্ভ করা যাউক এই শরীর হইতে। দেখা যায় মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইতেছে তাহার নিজ শরীর ; কারণ এই শরীরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া তবে স্ত্রী পুত্র পরিজন ও ধনসম্পদাদি প্রিয় বলিয়া বোধ করে। "আত্মনস্তুকামায়সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি॥" বৃহদারণ্যক। এদিকে বুঝিতেছি যে, যেমন সকলে "আমার স্ত্রী" "আমার পুত্র" ও "আমার ধনৈশ্বর্য্য" বলিয়া নিজের দেহ হইতে ঐ সকলকে পৃথক্ করে, তেমনি বলিয়া থাকে "আমার শরীর" অর্থাৎ "আমি ও শরীর" দুইটি বিভিন্ন। কেবল ইহাই নহে—আরও বলে "আমার মন" "আমার বুদ্ধি"। সুতরাং বুঝা যাইতেছে এই যে, "আমি", ইহা মন ও বুদ্ধি হইতেও পৃথক্। এজন্য, পুনরায় বিচার চলিতেই লাগিল—এই "আমি" কে ? শরীর হইতে যখন আমি পৃথক্, তখন শরীরাদি নষ্ট হইলেও ত আমার নাশের সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ বিচার করিতে যাইয়াই আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন,—

"নাহং জাতো জন্মমৃত্যু কুতো মে না হং প্রাণঃ
ক্ষুৎপিপাসা কুতো মে,
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে নাহং কর্ত্তা
বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে॥"

অর্থাৎ আমার জন্ম নাই, সুতরাং জন্মমৃত্যু কিরূপে হইতে পারে ? আমি প্রাণ নহি, সুতরাং আমার ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কোথা হইতে আসিবে ? আমি চিত্তও নহি, সুতরাং আমার শোক বা মোহই বা কিরূপে জন্মিবে ? আমি কর্ত্তা নহি অর্থাৎ নিজে কিছু কর্ম্ম করি না, সুতরাং আমার বন্ধন বা মোক্ষই বা কিরূপে হইবে ?

তবে এই "অহং" বা আমি কে ? আমিই হইতেছি "আত্মা"। ইহা কিরূপ ?

"স্থূল সূক্ষ্ম কারণশরীরাদ্ব্যতিরিক্ত পঞ্চকোষাতীতঃ সন্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ সন্ যস্তিষ্ঠতি স আত্মা"। ইহা একটীমাত্র পদার্থ—অস্মদ্‌পদবাচী। আর ইহা হইতে পৃথক যুষ্মদ্‌পদবাচী বহু অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর হইতে ভিন্ন। এবং অন্নময়, মনোময়, প্রাণময় বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ হইতে অতিরিক্ত, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অথবা বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই তিন অবস্থায় যিনি সমভাবে সাক্ষীরূপে সাক্ষাৎকারী, তিন শরীর হইতে বাহিরে অথচ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপে ভিতরে সাক্ষীস্বরূপ এবং "সৎ" "চিৎ" ও "আনন্দরূপ" স্বরূপে যিনি সদা বিরাজিত তিনিই তোমার "আমি" বা "আত্মা"। এক্ষণে এ সকল একটু পরিস্ফুট করা যাউক। "আমার গৃহ" বলিলে যখন গৃহ আমা হইতে এক পৃথক্ বস্তু ইহা বোধ হয়, সেইরূপ এই যে অহংরূপী আত্মা, ইহাও আমার অন্নময়রূপী দেহ, আমার মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও আনন্দ এই পঞ্চকোষ হইতে বিভিন্ন। কারণ, সকলেই "আমার দেহ, আমার মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও আনন্দ" (অস্মিতাজ্ঞান) ইহা বলিয়া এই আত্মাকে পৃথক করিয়া থাকে। আবার বিচার করিতে যাইয়া দেখি যে, বাল্যকালে বলিয়াছি "আমি বালক," যৌবনে বলিয়াছি "আমি যুবক" এবং বৃদ্ধাবস্থায় বলিতেছি, "আমি বৃদ্ধ"। সুতরাং দেহের পরিবর্ত্তন হইলেও এই আমি সমানভাবেই আছে। আবার অপরদিকে দেখিতেছি জাগ্রতাবস্থায় বলিতেছি, "আমি দেখিলাম, করিলাম, শুনিলাম ইত্যাদি" ; স্বপ্নাবস্থায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্রব না থাকিলেও, বোধ করি, "আমি দেখিতেছি, করিতেছি, খাইতেছি বা শুনিতেছি" ; "আবার নিদ্রাবস্থার পর বেশ স্মরণ করি যে "আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম" বা "আমি সুখে শায়িত ছিলাম"—এইরূপ তিন অবস্থাভেদেও যিনি সাক্ষীরূপে বিরাজিত—তিনিই আত্মা। যদি বল যে নিদ্রাবস্থায় তো কোনরূপ জ্ঞানই থাকে না, তবে আমি আছি

ইহা কিরূপে বলা যাইবে? জ্ঞানের অভাবই হইতেছে অজ্ঞান. তবে আবার সাক্ষী কিরূপ? ইহার উত্তর—নিদ্রাভঙ্গের পর যাহা জ্ঞান হয় তাহাকে "স্মরণ" বলিতে হইবে। কেহ স্মরণকারী অবশ্যই এ নিদ্রাবস্থায় ছিলেন, নতুবা স্মরণ কিরূপে হইবে? তবে পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় এই যে সাক্ষী, তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি "সৎ" অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় "অস্তিত্বসম্পন্ন" বা "আছেন"। আবার সাক্ষীরূপে জ্ঞানসম্পন্ন বা চৈতন্যময় "চিৎস্বরূপ" এবং সর্ব্বাবস্থায় চিৎস্বরূপ ও "আনন্দময়।" জ্ঞাতা জ্ঞান হইতে ভিন্ন। নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞানের অবশ্যই কেহ জ্ঞাতা আছে। এই জ্ঞাতাই সাক্ষী।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে এই অহংরূপী আত্মার যথার্থস্বরূপ কি কেহ উপলব্ধি করিতে পারে? ইহার উত্তর—"হাঁ, পারে"। একটী কলস যদি মধুপূর্ণ থাকে ও একটী ক্ষুদ্র তৃণের অগ্রভাগ দ্বারা উক্ত মধুর কিঞ্চিৎ উঠাইয়া যদি জিহ্বায় স্পর্শ করান যায়, তবে কলসের ভিতরের অপর্য্যাপ্ত মধুরতা কিঞ্চিন্মাত্রও উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপ মানুষ নিদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, এই আত্মসুখের কিঞ্চিন্মাত্র বোধ করে এবং এজন্যই নিদ্রা হইতে সহসা কেহ জাগরণ ইচ্ছা করে না। জাগিবার পর, জ্ঞান করে, পরম আরামে ছিলাম, এবং এ নিদ্রাসুখ পাইবার জন্য মানুষ-মাত্রেই লালায়িত হয়। নিদ্রায় এ সুখ কি জন্য হয়? না. এ অবস্থায় "এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বিক্তোন বাহ্যং কিঞ্চ বেদ নান্তরং" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্) অর্থাৎ এ অবস্থায় এই পুরুষ (অহংরূপী জীবাত্মা) প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সংমিলিত হইয়া বাহ্য বা আভ্যন্তর কোন বিষয় জানিতে পারে না। এ আত্মা আনন্দময় এজন্য এসময়ে এ আনন্দপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। "আনন্দমেতজ্জীবস্য যৎ-জ্ঞাত্বা মুচ্যতে বুধঃ।"

এই নিদ্রাসুখ হইতেই সকলকে বুঝান যায় যে, প্রবৃত্তিমার্গের ক্ষণিক আনন্দ হইতে এই যে নিদ্রাবস্থার বিশ্রাম, ইহা সকলজীবের সমানভাবে আরামদায়ক। এজন্যই উক্ত হইয়াছে যে, "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং" আর "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

নিদ্রাবস্থার এই অজ্ঞানভাবে উপলব্ধ সুখ হইতে, যোগীগণের জাগ্রতাবস্থায় সমাধিসুখ যে, কিরূপ ইহা বোধগম্য হয়। এখানে "জাগ্রতাবস্থার" আনন্দ এজন্য বলা হইল যে, নিদ্রাবস্থায় তমোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া বা অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া আনন্দানুভব হয়; আর সমাধি-অবস্থায় এক প্রকাশ স্বরূপে বিলীন হইয়া

আনন্দ প্রাপ্তি হয়। তবে এ উভয় অবস্থারই আনন্দ, আনন্দ ভোগকালে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। মানুষ জলে নিমজ্জিত হইয়া একটী বস্তু জলমধ্যে হাতে ধরিয়া আছে। এরূপ অবস্থায় বাহিরের লোক জানে না বা বুঝে না যে, সেই নিমজ্জিত ব্যক্তি কি ধরিয়া আছে এবং সে নিজেও অপরকে জানাইতে পারে না যে সে কি ধরিয়া আছে। বাহিরে ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গেলেও তাহার কোন বোধ থাকে না। জ্ঞানাভাব বা অজ্ঞান থাকে, ইহাতে বিষয় থাকে না বলিয়া যদি অনুমানবলে জ্ঞান করা যায়, তাহাও বলা যাইবে না। কারণ অনুমান করিতে হইলেই পক্ষ ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক।

যোগ সমাধি হইলে সমুদয় চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়—কারণ "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" আর এরূপ হইলে "তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং"। এই চিত্তের বৃত্তি হইতেছে—"মল, আবরণ ও বিক্ষেপ" বা পাতঞ্জলমতে—প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ"। এ সমুদয় নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় লুপ্ত হয়। ইহা যেরূপে হয় তাহাই হইল "অভ্যাস" বা "সাধনা"—যাহা পরে বর্ণিত হইবে।

এতক্ষণে "কোঽহং" বা আমি কে ইহা বুঝাইতে যাইয়া যতটুকুমাত্র বলা হইল তাহা এই যে "অহং রূপী" জীবাত্মাই জীবের "আত্মা" বা পরমাত্মা স্বরূপ। এজন্যই বলা হইল "নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে"। শ্রীভগবান্ গীতাশাস্ত্রে বলিলেন যে, এই আত্মা—

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম ক্লেদ্যোঽ শোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থানুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

অর্থাৎ এই নিত্য সর্ব্বব্যাপী স্থিরস্বভাব ও সদাএকরূপ আত্মা হইতেছেন অদাহ্য অক্লেদ্য ও অশোষ্য। শ্রুতি এই আত্মার স্বরূপ এইভাবে বুঝাইলেন "ওঁ আত্ম বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চনমীষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান পদার্থপুঞ্জ সৃষ্টীর অগ্রে একই আত্ম স্বরূপে অবস্থিত ছিল। অন্য কিছুরই সে সময়ে কোন প্রকার ব্যাপার বা ক্রিয়া ছিল না। ক্ষয়শীল নামরূপাদিবিশিষ্ট কোন পদার্থই সে সময়ে বিদ্যমান ছিল না। তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন বা আলোচনা বা সংকল্প করিয়াছিলেন যে, "এই এক আমি নামরূপ বিশিষ্ট হইয়া বহুরূপে ব্যক্ত হইব বা সৃজন ব্যাপার সম্পাদন করিব। কিন্তু এই ঈক্ষণ যখন হইল তখনই তিনি দ্বৈতভাব গ্রহণ করিলেন বা সগুণ পরমেশ্বর হইলেন। আবার অন্য শ্রুতি বলিলেন—

"সদেব সোম্যেদগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং।; তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েতেতি"।

অর্থাৎ সৃষ্টীর পূর্ব্বে একমাত্র সৎ স্বরূপ পরম পদার্থ বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এক ও দ্বিতীয় রহিত। সৃষ্টী করিবার ইচ্ছায় তিনি সংকল্প করিলেন "আমি বহু রূপে ব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পাইব।" তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও মায়া-সচিব বলিয়া ইহা তাঁহার দ্বারা হইতে পারে।

এইরূপ এইরূপ বহুস্থলে শ্রুতি এই আত্মার বিষয় "স্বরূপ" ও "তটস্থ" লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিচার জনিত অনুভূতি দ্বারা আত্মায় স্বরূপ উপলব্ধি হইলে, আর অন্য কিছু জানিতে বাকী থাকে না। কারণ—

"যল্লাভান্নপরো লাভো যৎসুখান্নপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥"

অর্থাৎ যাহা লাভ হইলে লব্ধব্য বস্তু আর কিছু থাকে না, যে সুখপ্রাপ্তি হইলে তাহা অপেক্ষা সুখপ্রাপ্তির বিষয় আর কিছুই থাকে না, যে জ্ঞানপ্রাপ্তি হইলে অপর জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে না, তাহা হইল ব্রহ্ম ইহাই অবধারণ করিবে। "তস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" মুণ্ডকোপনিষৎ।

এ বিষয় আরম্ভ হইয়াছে এই বলিয়া যে বিচার বিনা শান্তিলাভের উপায় নাই। এক্ষণে এ বিচার কি,?—ইহা হইল শাস্ত্রোক্তি শ্রবণের পর "মনন"। এজন্য শ্রুতি বলিলেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য"। ইহা তবে কিরূপ। যদি দ্রষ্টব্য হইল বা উপলব্ধিই হইল; তবে আবার শ্রোতব্য, মন্তব্য বা নিদিধ্যাসিতব্য বা শ্রবণ মনন বা নিদিধ্যাসন কি জন্য? ইহার উত্তর এই যে শ্রুতি প্রথমেই ফল শুনাইলেন। অর্থাৎ আত্মা দর্শনই হইল শ্রেষ্ঠ ফল। ইহা বলিবারই পর বলিলেন যে কি উপায়ে ইহা হইবে? না, প্রথমে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যিনি আত্মতত্ত্ববিৎ বলিয়া বিবেচিত হইবেন তাঁহার নিকট এই আত্মা বা "অহং" বা "আমি কে" ইহা শুনিবেন। ইহার পর নিজে ইহা বুঝিতে হইলে, এ বিষয়ে যে যে সন্দেহ উঠিবে তাহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিবেন ও গুরুমুখে সন্দেহের সমাধান করাইয়া লইবেন। এই যে বিচার, ইহাই হইল "মনন"। কিন্তু ইহা বিচার করিয়াও ইহার যথার্থ স্বরূপ বোধ হইবে না। এজন্য কি প্রকারে ইহার

অনুভূতি হয়, তজ্জন্য দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে উহার ধ্যান করিতে হইবে বলিলেন। এই ধ্যানপথে স্বরূপের অনুভূতিই হইতেছে "নিদিধ্যাসন"। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ। শ্রদ্ধাও ভক্তির সহিত গুরুদেবের নিকট শুনিলেন যে, "চিনি খাইলে পরম আনন্দ হয়" ইহা শুনিয়া বুঝিলাম যে, চিনি খাওয়া ভাল, এজন্য ভক্তি সহকারে গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এ চিনি খাওয়া-রূপ আনন্দ কিরূপ। ইহা শুনিয়া আনন্দ কি ও চিনিভক্ষণের কিরূপ আনন্দ ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় তিনি শুনাইলেন। ইহা হইল তখন "শ্রবণ"। যে, ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহার হয়ত অন্যান্য ভক্ষ্য পদার্থের আনন্দ কিছু কিছু বোধ আছে অথবা অন্যান্যের নিকট শুনা আছে। এখন এই আনন্দ বিষয়ে তাহার যে সন্দেহ, তাহা গুরুর নিকট শ্রুত চিনি খাওয়ার যে আনন্দ তাহার সহিত মিলাইবার জন্য অবশ্যই এক বিচার বুদ্ধি আসিবে—এই যে বিচার ইহাই হইল "মনন"। কিন্তু এ সকল করিয়াও যতক্ষণ গুরু মুখের উপদেশানুসারে চিনি লাভ করিয়া ভক্ষণ না করিবে ততক্ষণ চিনির স্বাদ পাইবে না। এই শেষোক্ত বিষয়ই নিদিধ্যসন সুতরাং বিচার কি প্রকার ইহা বোধ হয় বোধ হইল।

দ্বিতীয়খণ্ড উপদেশাবলী

কথমিদং জাতং কোবৈ কর্ত্তাস্য বিদ্যতে, উপাদানং কিং?

এ প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে যে, বিচার বিনা শান্তি লাভের উপায় নাই। সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ণভাবে বিচারজনিত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। আমরা শ্রুতিমুখে শুনিয়াছি যে, এই "অহংরূপী আত্মা কি? ইহাতে শুনিলাম যে, এই সৎরূপী পরমাত্মা "এক" ও অদ্বিতীয়"। বেশ, তিনি যদি ইহাই হইলেন, তবে এই যে সম্মুখে নানাবিচিত্রতাবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছি—এই যে "আমি" ও "তুমি" প্রভেদ দেখিতেছি, এ সকল তবে "কথমিদং জাতং"? এই যে আমি ও অন্যে প্রভেদ দেখিতেছি ইহা কিরূপে হইল? শ্রুতি শুনাইলেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যং শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

অর্থাৎ এই আত্মা কখনও জন্মেন না, বা মরেন না এবং উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকেন না। কারণ ইনি জন্মরহিত, নিত্য, ক্ষয়শূন্য ও পরিণামশূন্য। শরীরের বিনাশ হইলেও ইহার বিনাশ নাই।

আবার গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান বলিলেন—

"যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং সঃ পশ্যতি"।

এই যে আত্মা তিনি অকর্ত্তা। সুতরাং এক্ষণে অবশ্যই জানিবার ইচ্ছা হইবে, যে "কো বৈ কর্ত্তা অস্য বিদ্যতে, উপাদানং কিং?" এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখিতেছি ইহার তবে কর্ত্তা কে? এবং ইহার উপাদানই বা কি? এই সমুদয় চিন্তা করাই হইতেছে "মনন" জনিত বিচার।

সাংখ্যকারেরা এই সৃষ্টি বর্ণনা করিলেন এই বলিয়া—প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেই এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি। ইহার মধ্যে পুরুষ হইতেছেন শ্রুতিবর্ণিত—"অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ"। অথবা এই পুরুষ "নপ্রকৃতির্ন বিকৃতি পুরুষঃ"। আর প্রকৃতি হইতেছেন "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা; প্রকৃতের্মহান, মহতোঽহঙ্কারাহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি"॥ অর্থাৎ সাংখ্যকার এই সৃষ্টি বর্ণনা করিতে যাইয়া স্পষ্টই বলিলেন যে, দ্বৈত বা পুরুষ-প্রকৃতি হইতেই এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যকারেরা এজন্য শ্রুতির এই শ্লোকের উপরও নির্ভর করেন—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাং সৃজমানাং স্বরূপাং
অজো হ্যেকো মুষমানোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ।

অর্থাৎ এক শুক্ললোহিতকৃষ্ণবর্ণা অজা (ছাগী বা প্রকৃতি) বা সত্ত্বঃ রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট প্রকৃতি এক অজের অর্থাৎ পুরুষের জন্য সমুদয় সৃষ্টী করিয়াছেন। পুরুষের ভোগের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভোগ শেষ হইলেই অজ (পুরুষ) অজাকে (প্রকৃতিকে) পরিত্যাগ করেন। গীতার—"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" ইহাও সাংখ্যবর্ণিত এই দ্বৈতরূপ দুই মূল বস্তুর সৃষ্টীর উপরে। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণ আর একটু উপরে উঠিলেন। ইহারা বলিলেন—

"দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব ইহাই হইতেছে সাতটী পদার্থ। ইহা হইতেই সৃষ্টি ও ইহার বিচার হইতেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

এইরূপ বড় বড় দর্শনশাস্ত্র-প্রণেতাগণের একরূপ বিচার; আবার অন্যদিকে শ্রুতিতেও এ সৃষ্টি বর্ণনা আছে। শ্রুতি এই সৃষ্টী-তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া স্পষ্ট-ভাবে জানাইলেন যে, "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং—"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশ সম্ভূতঃ। আকাশদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যাঃ ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঃ হন্নং অন্নাটদ্রতঃ। রেতস পুরুষঃ!"

বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বুঝাইতেছেন যে, এই আত্মা "এক" "অদ্বিতীয়"। যাহা কিছু প্রপঞ্চ দেখিতেছ, সকলই এই পরমাত্মা। সাংখ্যকারেরা ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনকারেরা যে বিচার উঠাইয়াছেন তাহা শ্রুতিসম্মত নয়। এ সমুদয় দর্শনকারগণের পরস্পর তর্ক-বিবাদ এ স্থলে সম্পূর্ণভাবে প্রকটন করা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে সামান্য মাত্র একটু দিবার প্রয়াস করা যাইতেছে।

সত্ত্ব, রজ ও তম ইহারা জড়পদার্থ। যে সকল বস্তু জড়, সূক্ষ্মভাবে তাহাদের আদি কারণও অবশ্যই জড় হইবে। সুতরাং এই সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি যখন সত্ত্ব, রজ ও তমের সাম্যাবস্থা, তখন তাহা জড়ভূত হইয়া চৈতন্যময় বুদ্ধিজ্ঞান-বিশিষ্ট কিরূপে হইবে? কারণ শ্রুতিতে আছে যে, সেই জগৎ-কারণ "ঈক্ষণ" করিয়া বা আলোচনা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন সৃষ্টী হয় নাই, তখন এই পুরুষ ও প্রকৃতি কি অবস্থায় ছিলেন, আর প্রকৃতি যে সৃষ্টি করিলেন, ইহা পুরুষের ভোগের জন্য না মোক্ষের জন্য? এরূপ ইচ্ছা চৈতন্যবিশিষ্ট পদার্থেরই হয়। পুরুষত অসঙ্গই ছিলেন, তবে আবার তাঁহার ভোগ কি জন্য আবশ্যক হইবে? আর "চুম্বক লোহবৎ" যে একটী দৃষ্টান্ত দেখান হয় তাহাও সমীচীন দৃষ্টান্ত নয়। লৌহ বা চুম্বকের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি কোথায় আছে, ইহা ত স্থির হয় না। কখন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে এবং কখন লৌহও চুম্বককে আকর্ষণ করে। ঘড়ীর লকেটের সহিত যে Compass আছে, তাহার উপর বড় লৌহ টুকরা রাখিলেও, লকেটের ভিতরস্থ চুম্বক আকর্ষিত হইতে দেখা যায়। ইহা ভিন্ন, লৌহ ও চুম্বক এক সমান্তরালে না আসিলে, কখনই আকর্ষিত হয় না। এরূপভাবে সমান্তরালে বা এক সূত্রাকারে তাহাদিগকে স্থাপন করিতে হইলে দেখা যায় যে অন্য চৈতন্য-

জীব কর্ত্তৃক ইহা সংঘটিত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ ও প্রকৃতি কিরূপ ভাবে ও কাহার দ্বারায় এরূপ একসূত্রে আসিয়া উভয়ে উভয়ের আকর্ষণরূপ সৃজন করিয়াছিল? এইরূপ এইরূপ সাংখ্যের বিপক্ষে বহুবিধ খণ্ডন আছে। বেদান্ত-দর্শন এই ভাবে বহু যুক্তি ও শাস্ত্রের বচন দ্বারা সাংখ্যপক্ষীয়—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণবর্ণাং" এবং গীতাশাস্ত্রে উক্ত "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" প্রভৃতির খণ্ডন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এইরূপে বৈশেষিক মতও খণ্ডন করা হইয়াছে। সেখানে প্রথমতঃ দ্রব্য প্রভৃতির বিচার বা জগতের উপাদান-কারণ যে পার্থিব, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় প্রভৃতি পরমাণু কর্ত্তৃক সমবায় সম্বন্ধ হইয়া এই প্রপঞ্চের উৎপত্তি কারণ স্থির করা হইয়াছে তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। যুক্তির দ্বারা বলা হইয়াছে যে, এই সমবায় সম্বন্ধ প্রথম হইয়াছিল "আকস্মিক" ভাবে বা "অদৃষ্টবশতঃ"। যদি "আকস্মিক" ভাবে হইয়াছিল বলা যায়, তবে যখন জলীয় প্রভৃতির পরমাণু পৃথক্ পৃথক্, তখন দ্ব্যণুক প্রভৃতি জলীয় পরমাণু জলীয়ের সহিত মিলিত না হইলে ত দ্ব্যণুক হয় নাই। ইহা কি প্রকারে হইল? যদি "অদৃষ্ট" বলা যায়, তবে সৃষ্টীর আদিতে এই পরমাণুর সহিত অন্য শক্তি লুক্কাইত ছিল। সুতরাং ইহাও শ্রুতিবিরুদ্ধ। বিশেষতঃ একবস্তুর স্থানে বহু স্বীকৃত হইল।

আবার যদি চার্ব্বাক মতও উত্থাপিত হয়, তবে তাহাও শ্রুতি-বিগর্হিত মত ইহা দর্শন করান যাইবে। অথবা যদি কেহ আরও বলেন যে, এ সৃষ্টীর আদি অন্ত নাই; ইহা Matter ও Motion এর সম্বন্ধে পাইয়া চলিতেছে, তবে তাহাতেও বিচার উপস্থিত হইবে। কারণ দেখা যাইবে যে, object ও subject আছে। Subject বা চৈতন্য, object বা বিষয় না পাইলে কার্য্যকারী হয় না, এবং বিষয় বা objectও Subject এর সহিত সম্বন্ধ যুক্ত না হইলে ক্রীড়াশীল হয় না। তখন সৃষ্টী রহস্যের বিচার নাই। কিন্তু এ সকলের মীমাংসা কতকটা বেদান্তপক্ষে লওয়া যাইতে পারিবে। কারণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যাহা চৈতন্য তাহাই Feeling, willing or knowcing রূপে চৈতন্যময়, আর যাহা object তাহা জড়।

জড় মাত্রেই আশ্রয়শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। যদি বল ইহা চিরকালই চৈতন্যসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে বা চৈতন্যের আশ্রয়ে থাকে, (শেষোক্ত ব্যাপারটী স্বীকার করিলে ইহা অনেকটা বেদান্তের সমীপবর্ত্তী হয়) যদি চিরকালই এক জড়-চৈতন্য ব্যাপার স্বীকার করা যায়, তবে সৃষ্টি রহস্যের বিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ সেখানে ঈশ্বরও নাই, বন্ধ-মোক্ষ বলিয়া কিছু নাই। কেন না যেখানে কেবল পঞ্চভূত ও তৎ-সংযুক্ত চৈতন্যের একটা ব্যাপার মাত্র সেখানে "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনর্জন্ম কুতো ভবেৎ"। কিন্তু এ সব বলিলে যেখানে এ জন্মে জন্মান্তরের জাতিস্মরতা দেখা যায়, আধুনিক Spiritualism এর উৎকৃষ্ট জ্ঞানে যেখানে সূক্ষ্মদেহ বা ভূতদেহ প্রভৃতির ব্যাপার দেখা যায়, ব্যবহারিক স্থূলদেহের কার্য্য-লোপ করিয়া Hypnotism, Mesmerism প্রভৃতির কার্য্য দেখা যায়, সেস্থলে বুঝাইবার উপায় নাই।

এ সকল চিন্তা করিয়া চৈতন্যের পৃথক্‌ত্ব স্বীকার ভিন্ন বুঝাইবার অন্য কোনরূপ উপায় নাই। ইহা করিলেই বেদান্তমতকে প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। পুনরায় এ মত যোগক্রিয়ার অনুভূতির দ্বারাও উপলব্ধ হয়, এ মত শ্রুতি-সম্মত। তবে এ অনুভূতি কিরূপ তাহা বাক্যে প্রকাশ করা কঠিন। এ জন্য বেদান্তদর্শন পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি-রহস্য কিরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই জানান যাইতেছে। যদি কেহ কখনও এ অনুভূতি লাভ করেন তবে তিনি ইহা বুঝিবেন। এ সৃষ্টিরহস্যের মূল প্রশ্ন হইতেছে যে, ইহার কর্ত্তা কে? উপাদান কি? কি প্রকারে হইল?

এ সমস্ত সৃষ্টি-রহস্যের অবলম্বন কি তাহা একটী শ্লোক দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে;—যথা,—

"সৃষ্টী নাস্তি জগন্নাস্তি জীবো নাস্তি তথেশ্বরো।
মায়য়া দৃশ্যতে সর্ব্বং ভাস্যতে ব্রহ্মসত্তয়া॥"
(শান্তিগীতা)

অর্থাৎ সৃষ্টী নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বরনাই। এই যে সৃষ্টী-প্রপঞ্চ যাহা দৃষ্ট হইতেছে ইহা মায়ার ক্রীড়া মাত্র। এই মায়া ব্রহ্মসত্তার আশ্রয় লইয়া একটা মিথ্যাভ্রম উৎপাদন করিয়া সমুদয় প্রসঙ্গ করিতেছে মাত্র।

শ্রুত্যুক্ত সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন। যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ইহা ভ্রম মাত্র। ইহা মায়ার শক্তির দ্বারা স্ফুরিত হয় মাত্র। এ মায়া ব্রহ্ম-আশ্রিত। শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টীর বর্ণনা আছে তাহা লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য একটা গৌণসৃষ্টির বর্ণনা মাত্র। ইহা শুনিলেই ত একটা বিষম চমক লাগিয়া যাইবে। আমরা প্রত্যক্ষ সম্মুখে দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, অথচ শুনিলাম এ সকল কিছুই নয়। বেদান্তবাদীরা বলেন যে, এইরূপ শুনিয়াই চমকাইবার কোন কারণ

নাই। এ সম্বন্ধে কয়েকটী বচন শুনান হইতেছে। এই কয়েকটীর মর্ম্ম কেহ হৃদয়ে অনুভব করিয়া লইলেই এই বেদান্ততত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

১। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ।

অর্থাৎ আকাশে একটী মাত্র চন্দ্রই আছে ইহা সকলেই দেখিতেছে। কিন্তু নানাবিধ পাত্রে যদি স্বচ্ছ জল রাখা যায়, তবে ঐ একই চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নানা পাত্রে পড়িয়া উহা অনেকগুলি বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ পরমাত্মা একই, কিন্তু এক এক আধারে বহুভাবে প্রকাশিত হইতেছেন।

২। ঘট-সম্ভৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা।
ঘটো নীয়েতেনাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥

বিভিন্নরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ঘটে এক আকাশ ভিন্ন ভিন্নরূপে আছে। ঘটটী ভগ্ন করা যায়, তবে এ ঘটাকাশ আর থাকে না, বাহিরের আকাশের সহিত মিলিয়া যায়।

৩। "স্তিমিতে তথা গম্ভীরে জলরাশৌ মহার্ণবে।
সমীরণবশাদ্বীচির্ন বস্তু সলিলেতরা"॥

যেরূপ নিস্তব্ধ বা স্তিমিত গম্ভীর মহাসমুদ্রের জলরাশি বায়ুযোগে তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ্‌প্রভৃতি নামবিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করে অথবা উক্ত সমুদ্রের জলরাশি হইতে ভিন্ন অন্যবস্তু বলিয়া প্রতীত করে সেই প্রকার একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম চৈতন্যই মায়াতে "যেন" ক্ষোভিত হইয়া এই বিভিন্ন নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের বোধ করাইতেছেন। ব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন এ সকলের অন্য সত্তা নাই।

৪। জগদ্ বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন!
ব্রহ্মাত্মভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা॥

এই যে নামরূপবিশিষ্ট জগৎ প্রপঞ্চ ইহা হইতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জগতে অন্য কিছুই নাই। এই যে নামরূপবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হইতেছে, তৎসমুদয় মরুভূমিস্থ মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা। ইহা ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়।

এইরূপ এইরূপ মিথ্যা ভ্রম অনেক প্রকারে হয়—যথা "শুক্তিকে রজতং যথা"—দূরে পড়িয়া আছে একখানি ঝিনুক, কিন্তু মনে হইল যে উহা ঝিনুক নয়, উহা একখণ্ড রজত। "রজ্জু সর্পবৎ"—দূরে পতিত আছে এক টুকরা রজ্জু ইহাকে কেহ মনে করিল সর্প এবং এজন্য ভয়ে পলাইতে গিয়া পড়িয়া গেল

ও হাত পা ভাঙ্গিল। কেহ মনে করিল উহা একটী জলরেখা, কেহ মনে করিল ঐস্থানের মৃত্তিকা ফাটিয়াছে। "স্থানৌ পুরুষবৎ"—একটু দূরে শাখা-পল্লবশূন্য একখণ্ড বৃক্ষের গুঁড়ী খাড়া আছে, কিন্তু ভ্রমক্রমে মনে করিল যে, একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ ভ্রম আরও হয় "নীল বস্ত্রাদি যোগেন স্ফটিকো যথা"—স্বচ্ছস্ফটিকের কোন প্রকার রং নাই; কিন্তু ইহা একটী নীলবর্ণ বস্তুর নিকটে থাকিলেই ইহাকে নীলবর্ণ বোধ হয়। "গগনে নীলাদিবৎ"—আকাশের কোন বর্ণ নাই, কিন্তু এইরূপ স্বচ্ছ আকাশে সকলে নীলবর্ণ দেখিয়া থাকে। "অয়োঽগ্নি-যোগাদিব"—লৌহ নিজে কাহাকেও দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু অগ্নির সহিত সংযোগ হইলে এই লৌহ রক্তবর্ণ হয় ও হাত পুড়াইয়া দেয়। সকলে বলে "লৌহে হাত পুড়িয়া গিয়াছে।" এইরূপ এইরূপ বহুবিধ ভ্রান্তি সর্ব্বদাই হয়, কিন্তু ইহা নিবারিতও হয়। কারণ ইহা দেখা যায়, যে, "স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ ভবেৎ"—অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় কোন বিষয় ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও, উহার যথার্থতা দৃষ্ট, শ্রুত বা কৃত বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় স্বপ্ন দূর হইলেই, যেমন জাগরণ হয়, অমনি ঐ সমুদয় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ একমাত্র অবিদ্যাপুষ্ট এক ভ্রম অজ্ঞান বশতঃ মায়াকর্ত্তৃক উক্ত নানারূপ ভ্রান্তি আনয়ন করে। যে বস্তু যথার্থ যাহা নয় তাহাতে অন্য বস্তুর অধ্যাস বা মিথ্যা আরোপণ করিয়া থাকে। এইরূপ ভ্রান্তি হইবার কারণ ইন্দ্রিয়জনিত দোষ অথবা সম্প্রয়োগ ও সংস্কার। ইহারা আবার কার্য্যকরী হয় নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া। ইহা দূর হইলেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ বোধ হয়। এ অবশ্যই হইতেছে পরমার্থমার্গে জাগরণ বা ব্রহ্ম-উপলব্ধির দ্বারা মায়া-অপসরণ।

বেদান্তবাদীগণ শ্রুতির উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করিয়া ও পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয় ইহা স্বীকার করিয়া বলেন যে, এই যে জগদ্‌প্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে, ইহা স্বরূপতঃ কিছুই নয়। ইহা ব্রহ্ম-সত্তায় এক ভ্রান্তি মাত্র। এ ভ্রান্তি কেবল অজ্ঞানজনিত। এ সংসার "স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষাদি সংকুলং"—ইহা অজ্ঞানজনিত একদীর্ঘ স্বপ্নমাত্র। নিদ্রার পূর্ব্বেজাত স্বপ্নাবস্থা অল্পকালের জন্য বিষয়াদি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ গোচর না হইলেও ঐ সকলকে যথার্থ বলিয়া মনে করায়। এই সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি বা শুনিতেছি ইহাও সেইরূপ এক বহুকালজনিত অজ্ঞানাবস্থার স্বপ্ন-মাত্র। মেঘ সূর্য্যকর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যকে আবৃত করে। সেইরূপ ব্রহ্মের মায়া তাহার ইচ্ছায় অজ্ঞান

অন্ধকাররূপ একটা আবরণ আনয়ন করে ইহা "প্রবোধে অসভ্যবৎ ভবেৎ"—অর্থাৎ এই অজ্ঞান নিদ্রা যদি কখন দূরীভূত হয় ও জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়, তবে এ সকলই মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে। মরুভূমিতে জলের লেশমাত্রও নাই, কিন্তু সূর্য্যকিরণের দ্বারা প্রতিবিম্বজনিত এক দোষ উৎপন্ন হইলে, জন্তুগণ পিপাসা শান্তির জন্য জল ভ্রমে ধাবিত হয়। ইহা উপরোক্ত নিমিত্তগত কালগত ও দেশগত হইয়া ভ্রম উৎপন্ন করে। আকাশে চন্দ্র একটীই আছে। জলাশয় বায়ু হিল্লোলে বিক্ষুব্ধ হইল। উহাতে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়া ঐ চন্দ্রকে বহু বলিয়া উপলব্ধি করাইল। সমুদ্রে জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু বায়ুহিল্লোলে বিচালিত হইয়া ইহা হইল তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্‌বুদ্। জলাশয়ে বা সমুদ্রে বায়ুর নিস্তব্ধতা হইলেই, একটীমাত্র চন্দ্র, ও একমাত্র জলরাশিই পরিদৃষ্ট হইবে। অজ্ঞান বশতঃই এইরূপ ভ্রম হয়, আর এই অজ্ঞান দূরও হয়। গীতাশাস্ত্রে এজন্য শ্রীভগবান বলিলেন—

"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং॥"

অর্থাৎ এই পরমাত্মা যে এক ও অদ্বিতীয় এবং এই যে জগৎ যাহা পরিদৃষ্ট হইতেছে ইহা তিনিই, এইরূপ জ্ঞান অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন আছে, এজন্যই সকলে এক এক পৃথক্ পৃথক্ জীবভাব কল্পনা করিয়া ভ্রান্তিবশতঃ "আমার" ও "তোমার" এরূপ বোধ করিতেছে ও সেইরূপ ভ্রান্তিতে মুগ্ধ আছে। কিন্তু যেমন জ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ বুঝিতে পারে এক পরমাত্মাই আছেন অমনি সূর্য্য যেমন তমোনাশ করে, সেইরূপ একমাত্র পরমাত্মাই প্রকাশিত হন, অন্যান্য ভ্রমজনিত প্রপঞ্চ দূর হয়।

এতদূর পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝা গেল যে, অজ্ঞান বশতঃ এক ভ্রান্তি উৎপন্ন হইলে মানুষ মোহ প্রাপ্ত হয়, ও এ অজ্ঞান দূরও হয়। কিরূপে এ অজ্ঞান দূর হয় তাহা পরে "অভ্যাস" ও "বৈরাগ্য" বর্ণনার সময় শুনান যাইবে। কিন্তু এখনও "কথমিদং জাতং" "কো বৈ কর্ত্তাস্য বিদ্যতে" "উপাদানং কিং" ইহাও শুনা হয় নাই।

শ্রুতি বলিলেন যে, এই পরমাত্মা "এক" ও "অদ্বিতীয়"। গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবানও বলিলেন,—

"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥"

অথবা—"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।"

অর্থাৎ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তি যোগ্য কিছুই নাই।" সুতরাং এক্ষণে প্রশ্ন হইল যে, তবে কর্ত্তব্য না থাকিলে, এ সৃষ্টি প্রপঞ্চ কোথা হইতে আসিল? যদি এক ও দ্বিতীয় রহিত (অর্থাৎ স্বজাতি, বিজাতি ও স্বরূপ-ভেদ রহিত) এই পরমাত্মা, তবে নানারূপ আকৃতি ও কর্ম্মবিশিষ্ট এই জগৎ প্রপঞ্চ কিরূপে বা কোন্ উপাদানে হইল? শ্রুতিতে লিখিত হইল "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েতেতি।" অর্থাৎ তিনি আলোচনা করিলেন যে, আমি একা হইলেও বহুরূপে প্রকাশিত হইব। তবে তাঁহার কর্ত্তব্য না থাকিলেও এ ইচ্ছা কেন হইল? দ্বৈত ভিন্ন বা দুইটী না হইলে ত ক্রীড়া হয় না, এজন্য ইহা করিব এরূপ আত্মারামের সংকল্প কেন হইল ও ক্রীড়া জন্য দ্বিতীয় বস্তুই বা কোথা হইতে মিলিল? অর্থাৎ সৃষ্টি কেন হয়? এজন্য বেদান্ত দর্শন বলিলেন যে, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং"। অর্থাৎ প্রথমতঃ যাহাকে সৃষ্টী বলিতেছ ইহা স্বরূপতঃ মিথ্যা। তথাপি যদি কেহ প্রশ্ন করে, "ইহা কিরূপে হইল?" তবে বলিতে হইবে যে, শ্বাস প্রশ্বাস যেমন বিনা প্রয়োজনেই স্বভাব-বশতঃ চলিতে দেখা যায়, সেইরূপ এ সৃষ্টী—প্রপঞ্চও এই পরমাত্মা পরমেশ্বরের একপ্রকার লীলামাত্র। লীলায় যদিচ একটু উল্লাসাদির প্রয়োজন কল্পনা করা যায়, তথাপি এ সৃষ্টীকার্য্যে কোনরূপ প্রয়োজনের কল্পনা করা যায় না; কারণ তিনি "আপ্তকাম" পূর্ণ বা নিত্যতৃপ্ত। তবে ইহা কিরূপে হয়?—ইহা তাঁহার স্বভাব বশতঃই হয়। এই স্বভাব কি?—ইহা ঈশ্বরের কাল-কর্ম্মসচিব মায়া শক্তির সহিত এক খেলা।

ইহার অধিক আর কেহ কারণ দর্শাইতে পারিবেন না। কোন বিশিষ্ট প্রভাবশালী রাজার কোন অভাবই নাই, তথাপি সময়ে সময়ে তিনি আয়াস-সুলভ ক্রীড়া করেন, ইহাও তাহাই।

এক্ষণে পরমেশ্বরের এই "স্বভাব" বা "প্রকৃতি" কি ইহা বুঝিলেই এ বেদান্তমার্গ-প্রদর্শিত সৃষ্টী রহস্য বুঝা হইবে। গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান এ স্বভাব কি তাহা পুনঃ পুনঃ এরূপভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

(১) "ন কর্ম্মফল সংযোগং স্বভাবস্তু-প্রবর্ত্ততে॥"

(২) অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মাভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া॥"

(৩) "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্ব্বশঃ।"

(৪) "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

অর্থাৎ আমার বা পরমেশ্বরের কিছুমাত্র ফলের সহিত সংস্পর্শ নাই। ইহা আমার স্বভাবই করিতেছে। আমি জন্মমৃত্যুরহিত এক ও অদ্বিতীয়। গুণকর্ম্ম যুক্ত যে সমুদয় ক্রিয়া তাহা প্রকৃতিই করিতেছে। এই প্রকৃতি হইতেছেন আমার এক মায়াস্বরূপ। ইহাকে বশীভূত করিয়াই এই সৃষ্টী। নিজের মায়া "অহং" রূপাভাব ব্যক্ত হইতেছে ইহাও এক বিমূঢ়ভাব মাত্র। ইহাও পরমেশ্বরের এক বিশিষ্ট মায়া শক্তি দ্বারা ভ্রান্তি উৎপাদন মাত্র।

বেশ, এখন না হয় বুঝা গেল যে, এই সৃষ্টী এক মায়া প্রপঞ্চতা এখন বুঝাইতে হইবে যে এ মায়া কি, এ স্থানেই সকলকে চুপ করিতে হইবে। কারণ এ মায়ার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়।

"শৃণু মহাদ্ভুতা মায়া সত্বাদি ত্রিগুণান্বিতা।

উৎপত্তিরহিতাহনাদি নৈসর্গিক্যপি কথ্যতে॥"

এই যে মায়া ইহা মহা অদ্ভুতা। ইহা সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ সমন্বিতা। ইহা অনাদি, কার্য্য দেখিয়া ইহা আছে বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা উৎপত্তিরহিতা, ইহা আশ্রয়রূপ সদ্বস্তু ব্রহ্ম হইতে এবং কার্যরূপ অসদ্বস্তু জগৎ হইতে ভিন্নও বটে, ও ভিন্ন নয়ও বটে, এজন্য ইহা অনির্ব্বচনীয়। ইহা পরমেশ্বরের এক শক্তিবিশেষ। শক্তি লইয়াই সকলে শক্তিমান হয়, এজন্য ইহার স্বরূপ পৃথক্ ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। অথচ যখন শক্তি বলিতেছি, তখন ইহার আশ্রয় বা অধিষ্ঠান অবশ্যই আছে ইহা অনুমান করিতে হইবে। এজন্য শ্রুতি বলিলেন—

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং।"

অর্থাৎ এই মায়া শক্তি আছে বলিয়াই মহেশ্বরকে মায়িন্ বলা যায়।

গীতাও বলিলেন যে—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"॥

অর্থাৎ এই অলৌকিকী গুণময়ী মায়া হইতে অতি কষ্টে উত্তীর্ণ হইতে হয়।

ইহা আমার স্বরূপ দর্শন হইলেই তবে অতিক্রান্তা হয়। ইহা আমারই এক দ্যোতনশীলা শক্তি।

সুতরাং মায়া বুঝিবার পর, এখন এই সৃষ্টি বুঝিতে হইলে, বেদান্ত মতে বুঝিতে হইবে যে, এই মায়া যখন গুণময়ী অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তমোগুণী, তখন ইহার কার্য্যও তিনপ্রকারে হয়। এই মায়া যে সময়ে শুদ্ধ সত্বপ্রধানা হইয়া বিদ্যা আখ্যা প্রাপ্ত হন, সেই সময়ে যখন চৈতন্যের প্রতিবিম্ব ইহাতে পড়ে, তখনই পরমাত্মা ঈশ্বররূপে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া প্রতিভাত হন। আর এই মায়া অজ্ঞান-প্রধানা হইলে অবিদ্যা আখ্যা-প্রাপ্ত হন। এই শেষাবস্থায় যখন ইহাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে তখন ঈশ্বর চৈতন্যই জীবরূপে অল্পজ্ঞতা ও পরিচ্ছিন্নতা ভাব-প্রাপ্ত হন। এ অজ্ঞানাবস্থায় ইহার মল, আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি সকল কার্য্য করিতে থাকে। একটী জলাশয়ের জল যখন স্বচ্ছ থাকে বা উহাতে বায়ুর হিল্লোল না থাকে তখন উহাতে কোন বৃক্ষের প্রতিবিম্ব পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়। কিন্তু ঐ জল যদি কর্দ্দমময় হয় কিম্বা বায়ু দ্বারা উদ্বেলিত হইতে থাকে তবে প্রতিবিম্ব অস্বচ্ছ ও চঞ্চল দেখা যায়। আমাদের এই অন্তঃকরণ হইতেছে এইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন মলবিক্ষেপ-সংযুক্ত এক জলাশয়। বহুকাল হইতে ইহা রজ ও তমোভাব দ্বারা আচ্ছন্ন আছে ও সে অবস্থায় এক এক জন এক এক রূপ অহমাভিমানী জীব হইয়াছে। যদি ইহার রজ ও তমোভাব দূর হইয়া সত্বভাবের উদয় হয় তখন ঐ জীবেরই ঈশ্বরত্ব অনুভূত হয়। ইহার অহংভাব যাইয়া "সোঽহং" ভাব বোধ হয়। নতুবা তমোভাব প্রধান হইলে প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা ও মোহভাব আক্রমণ করে। আর রজঃপ্রধান হইলে রাগ তৃষ্ণা প্রভৃতির উদয় করে। ইহাতে সত্বভাবের পরিস্ফুরণই হইতেছে সাধনা বা এই সাধনাই হইতেছে অভ্যাস।

এই জীবত্বভাব দূরীকরণ জন্য কেন চেষ্টা করা উচিত ও করিলে কি হইবে ইহা বুঝা হইল "বিচার", আর কি উপায়ে হইবে ও তাহার সাধনাই হইল "অভ্যাস"।

নগরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হন। তাঁহাদের এই ধর্ম্ম প্রচারে পূর্ব্ববঙ্গে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইল।

কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন; এখন হইতে তিনি দ্বিগুণিত উৎসাহে মহিলাগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার জন্য অধিকতর যত্নপর হইলেন। "ব্রাহ্মবন্ধু সভা" ও ব্রাহ্মিকা সমাজ এই শুভকরী অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইল। ১৮৬৬ খ্রীঃ মাঘোৎসবে সর্ব্বপ্রথম "ব্রাহ্মিকা সমাজের" মহিলাগণ বেদীর নিকট পর্দ্দার আড়ে বসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার অব্যবহিত পরই কেশবচন্দ্র মহিলাদিগকে পাদরী রবসনের বাটীতে সান্ধ্যসমিতিতে যোগদানে অনুমতি প্রদান করেন। এ দিকে ঠাকুর পরিবার হইতেও এ বিষয়ে উৎসাহ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মহিলাগণকে এই প্রকারে অন্তঃপুরের বাহির হইয়া অবাধে প্রকাশ্যভাবে পুরুষগণের ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া দেশের লোক একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল!

১৮৬৬ খ্রীঃ কলিকাতা মেডিকেল কলেজের থিয়েটার গৃহে কেশবচন্দ্র Jesus Christ—Asia and Europe (যীশুখ্রীষ্ট—এসিয়া এবং ইউরোপ) নামক একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তার আবেগময় ও আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তি শ্রবণে, বিশেষতঃ এই সুপ্রসিদ্ধ বক্তৃতার অংশ বিশেষে যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বক্তা যে প্রকার গাঢ় ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র যথার্থই অচিরে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিবেন। খ্রীষ্টানেরা উল্লাসিত হইল—এদিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণও এই নবোদিত ব্রাহ্মদলকে খ্রীষ্টান বলিয়া অপবাদ করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই বৎসর, ডিসেম্বর মাসে Great Men ("মহাপুরুষ") নামক একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া কেশবচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত অপবাদ খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতা শ্রবণে বড়লাট হইতে সকলেই তাঁহার অসাধারণ শক্তির প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্বিত হন।

অতঃপর এই নবোদিত ব্রাহ্মদলের মফঃস্বলে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইলে এবং তত্রত্য নবগঠিত সমাজ সমূহকে একতাসূত্রে বন্ধন করিবার আবশ্যক হইলে ১১ই নভেম্বর তারিখে উন্নতিশীল নবোদিত ব্রাহ্মদলের মধ্যে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামক একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এখন হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"

১৮৬৭ খ্রীঃ হইতে কেশবচন্দ্র নিজভবনে দৈনিক উপাসনা পদ্ধতি এবং খোল করতালসহ সংকীর্ত্তনের প্রথা প্রচলন করেন।

১৮৬৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নিমিত্ত উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তাহার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পর বৎপর এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭০ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। এখানে তিনি বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়, বুধমণ্ডলী ও ধনিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপ সমাদৃত হন। ইংলণ্ড যাইবার সময় কেশবচন্দ্র মাত্র এক মাসের বাসোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর ছয় সাত মাস কাল অবস্থান করিবার ব্যয় তথাকার ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় বহন করেন। সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডাক্তার মার্টিনোর ভজনালয়ে কেশবচন্দ্র, "ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন—এই ভজনালয়ে বক্তৃতাকালীন অনেক সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণও উপস্থিত ছিলেন। অনন্তর তিনি নানা স্থানে বিবিধ বিষায়াবলম্বনে অনেকগুলি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সমুদয় বক্তৃতা প্রদান কালে সকলেই তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। "ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" নামক বক্তৃতায়, ভারতবর্ষীয় নীচশ্রেণীর ইংরাজদিগের অত্যাচারের কথা ইংলণ্ডের জনসাধারণের সমক্ষে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের গূঢ়ত্ব আলোচনা করিয়া "খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টধর্ম্ম" নামক একটি বক্তৃতা করিলে সুইডেনবর্গ সভা হইতে তিনি অভিনন্দিত ও পুরস্কৃত হন। ইহার পর তিনি ব্রীষ্টলে আগমন করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের সমাধি এবং ষ্ট্রার্টফোর্ডে আসিয়া সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দর্শন করেন। এই সময় তিনি কয়েকজন পাদরী কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে অনুরুদ্ধ হন। অপরাপর কয়েকস্থান ভ্রমণের পর লিভারপুলে গিয়া অসুস্থ হইলেন; এই নিমিত্ত তথায় দুই সপ্তাহকাল বিশ্রামের পর লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর তিনি গ্ল্যাসগো ও এডিনবারা গমন করেন। এই সময় তিনি সুবিখ্যাত পণ্ডিত জনষ্টুয়ার্ট মিল, নিউম্যান প্রভৃতি মনস্বিগণের সহিত পরিচিত হইলেন; এবং এই সময়ই অসবর্ণ প্রাসাদে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মহারাণী কেশবচন্দ্রকে নিজের এক খানি প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর দুইখানি জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড প্রবাস

দয়া করিয়া আমার গৃহে চলুন, আমি কিঞ্চিৎ দান করিতে ইচ্ছা করি।
ঐ ব্রাহ্মণ হারাধনের বিপুল অর্থের বিষয় অবগত ছিলেন, মনে করিলে
বিধি সদয় হইয়াছেন। দানের লোভে ব্রাহ্মণ হারাধনের সঙ্গে চলিলেন।
বাটীর মধ্যে আসিয়া হারাধন ব্রাহ্মণকে গোয়াল ঘরে লইয়া গিয়া মৃতপ্রা
গাভীর গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "আপনাকে এই গাভী দান করিলাম।"
ব্রাহ্মণ কিছুতেই গাভীটী লইতে চাহিলেন না, কিন্তু হারাধন কিছুতে
ছাড়িলেন না। অগত্যা ব্রাহ্মণ গাভীটী লইয়া বাড়ী গেলেন, হারাধন
হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ২।৩ দিন পরেই গাভীটী মরিয়া গেল। গাভীটী
ফেলাইতে ব্রাহ্মণের কিছু খরচ হইল।

ইহার কিছুকাল পরে হারাধনের আয়ুঃ-সূর্য্য অস্তমিত হইল। জগতে
কেহই চিরকাল থাকে না,—রাজা প্রজা সকলেরই এক দশা হইবে। হারাধনও
বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন, তাঁহার দরিদ্র ভাগিনেয়ের
অদৃষ্ট ফিরিল, মাতুলের সমুদয় সম্পত্তি পাইল। চিরদিন সমান থাকে না,
আজ ভিখারী রাজা হইল। যমদূতগণ আসিয়া হারাধনকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া
ধর্ম্মরাজ যমের কাছে লইয়া গেল। ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া হারাধনের
বিচার আরম্ভ করিলেন। চিত্রগুপ্ত খাতার পাত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া
বলিলেন, "এ লোকটা বড়ই কৃপণ, আজীবন কেবল বহু পাপ করিয়া অর্থ
সঞ্চয় করিয়াছে, তবে পুণ্যের মধ্যে একটা মরা গরু একজন ক্ষুব্রাহ্মণকে
দান করিয়াছিল,—তাহার ফল দুইদণ্ড স্বর্গবাস।" ধর্ম্মরাজ এই কথা শুনিয়া
হারাধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু, তোমার তো পাপ অনেক,
তাহার ফলে অনন্ত নরক, তবে তোমার একটী পুণ্য আছে, তাহার ফল
দুইদণ্ড স্বর্গবাস—তা তুমি আগে স্বর্গে যাইতে চাও, না, নরকে যাইতে
চাও?" তাহা শুনিয়া হারাধন ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি
অগ্রে স্বর্গে যাইতে চাই।" তাহা শুনিয়া যম বলিলেন, "তথাস্তু"। তৎক্ষণাৎ
একটী বলিষ্ঠ বৃষভ আসিল, হারাধন তাহার পৃষ্ঠে চড়িলেন, এবং বৃষভকে
বলিলেন, "যমকে গুঁতাও।" বৃষভ মাথা হেঁট করিয়া যমকে তাড়া করিল।
ধর্ম্মরাজ প্রথমে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে গেলেন, সেখানে আশ্রয় না পাইয়া
শিবলোকে শিবের নিকট গেলেন। শিব বলিলেন, "ও বৃষভ ধর্ম্মবলে বলী,
উহাকে রোধ করা আমার সাধ্য নয়, তুমি শীঘ্র অন্যত্র গমন কর।" তাহা শুনিয়া
যমের আক্কেল গুড়ুম হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি বিষ্ণুলোকে গিয়া দেখেন,

নারায়ণ শয়ন করিয়া আছেন, লক্ষ্মী পদসেবা করিতেছেন। যম প্রাণভয়ে
নারায়ণের কাছে প্রাণভিক্ষা করিতেছেন এমন সময় বৃষভটীও সেই স্থানে
গমন করিল। হারাধন বৃষভটীকে বলিলেন, "এইবার লক্ষ্মী-বেটীকে গুঁতো,
ঐ বেটি সর্ব্বনাশের মূল, নিজের হাতে কুবেরের ভাণ্ডার আর পৃথিবীর লোক
খেতে পায় না।" আদেশ পাইয়া বৃষভ লক্ষ্মীকে গুঁতাইতে গেল, লক্ষ্মী ভয় পাই-
লেন। তখন নারায়ণ ভয় পাইয়া হারাধনকে বলিলেন, "ওহে বাপু, তুমি
কি চাও?" হারাধন বলিলেন, "অক্ষয় স্বর্গ।" নারায়ণ বৃষভের ভয়ে ভীত হইয়া
বলিলেন, "তথাস্তু"। তৎক্ষণাৎ দেববালাগণ আগমন করিয়া হারাধনকে মাল্য
চন্দনেতে সুসজ্জিত করিয়া দিব্য রথে চড়াইল। হারাধনের অক্ষয় স্বর্গলাভ
হইল। যম এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া নারায়ণকে তিরস্কার করিয়া
বলিলেন, "একি! আপনি মহাপাপীকে অক্ষয় স্বর্গবাস দিলেন।" নারায়ণ
যমকে দানের মহিমা বুঝাইয়া দিলেন। যম সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

বীরভূমির তীর্থ।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর

ধন্য ধন্য বীরভূমি তোমার চরণে নমি
বহু নদ নদী বন
অঙ্কেতে তোমার।
পুষ্পিত উদ্যান-রাজি কেমন রয়েছে সাজি
প্রদানিতে শ্রীচরণে
জগৎ মাতার॥
দেবীর চরণ-পদ্ম সকল মঙ্গল-সদ্ম
বিরাজিত বীরভূমে
কৃপায় জননী।
অবতীর্ণা কালী মূর্ত্তি নলহাটে পায় স্ফূর্ত্তি
যোগেশ ভৈরব সনে
পার্ব্বতী যোগিনী।

পর্ব্বত-বাসিনী কালী স্মেরাননা মুণ্ডমালী
অপূর্ব্ব শোভায় মাতা
শোভিতা হেথায়।
কুসুম বাসিত স্থান শান্তিপ্রদ মূর্ত্তিমান্
রাগ, রাগিণীর সনে
মনানন্দে গায়॥
উঠিছে ওঙ্কার ধ্বনি, পর্ব্বত উপরে, শুনি—
দেবেন্দ্র বাসব আসি
স্বগণ সহিতে।
পূজিয়া কালিকা-পদ সকল মঙ্গলপ্রদ
আশীষ লইয়া যান
অমরাবতীতে॥
দয়াময়ি! কত রূপে বিরাজিছ বিশ্বকূপে
তারারূপে তারাপুরে
তাপিততারিণী।
অট্টহাসে ফুল্লরা বিশ্বেশের মনোহরা
নন্দীপুরে নন্দময়ী
তুমি মা নন্দিনী।
ভ্রূমধ্য পড়িল যথা "বক্রনাথ" শিব তথা
বিরাজিছে প্রস্রবণে
আশ্চর্য্য মহিমা।
উষ্ণজলে করি স্নান, রোগীজন স্বাস্থ্য পান
কৃপাময়ি! তবগুণে
দিতে নাহি সীমা॥
"রুরু" ভৈরবের সনে কাঞ্চি দেশে নিরজনে
"দেবগর্ভা" নাম ধরি
বিরাজিত তুমি।
কুণ্ড জলে পূজা করি কোপাই তটিনী' পরি
তোমার চরণ-পদ্মে
ভক্তি ভরে নমি॥

ব্যাপ্ত তুমি সর্ব্বস্থলে তথাপি ভক্তেরা বলে
পীঠের মাহাত্ম্য বড়
মহিমা-নিলয়।
যথা যথা কৃপা তব তথায় বিরাজে ভব
শিব শক্তি সুমিলিত
আনন্দ-আলয়॥
প্রকৃতি জননী উমা কভু শ্যাম কভু শ্যামা
নানা রূপে নানা স্থানে
পাও মা প্রকাশ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তমঃ আর রজঃ সত্ত্ব
তিন গুণে তিন মূর্ত্তি
কর মা বিকাশ॥
সত্ত্ব গুণে সৃষ্টি কর "বৈষ্ণবী" উপাধি ধর
কালী মূর্ত্তি জগতের
সৃষ্টির কারণ।
বিপরীত রতাতুরা মহাকাল-মনোহরা
রজঃ গুণে পৃথ্বী
তুমি কর মা পালন।
তমোগুণে তব পাশে নিয়ে যাও অনায়াসে
পুনঃ সৃষ্টি কর দেবি! আনন্দে অপার।
কালী তারা মহাবিদ্যা পরমা প্রকৃতি আদ্যা
কে জানে মহিমা! মাগো তুমি বিশ্বসার॥

ভিক্ষা।

লেখক—শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনাথ রায়।

উচ্চশির নত করে দাও
তোমার চরণ-তলে;
দহ বা নিমেষে ভীম হুতাশনে
লালসা-কামনা-দলে

করগো দৃপ্ত আমার "আমার"—
চির বিনাশ সাধন ।
লভুক্ নির্ব্বাণ রাজীব চরণে
তরুণ মুক্ত জীবন ॥

প্রেম ।

প্রেম নহে ক্রীড়নক্, মিছা-অভিনয়,
কামনার পূতিগন্ধ আবিলতা-কূপ,
লালসার তীক্ষ্ণশর কালকূট-ময়,
নহে তুচ্ছ আকাঙ্খার আবর্জ্জনা-স্তূপ ।
কোমল পরশ নহে প্রেমের লক্ষণ,
সোহাগ যতন নহে ভালবাসা-চিন্,
উভয়েই দূরান্তরে ; অচ্ছেদ্য বন্ধন,—
সেই ত জীবন্ত-প্রেম রবে চিরদিন ॥

জগতে ।

লেখিকা—শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু বি, এ, ।

আমি জগতে এসেছি সুধু গো দুখ সহিতে,
দেখিবে না আর কাহারে এমন
আমার মতন বেদন ভার বহিতে ।
ওই তারকার মালা
বাড়ায় আমার জ্বালা,
ওই সুধাকর হাসি
পরাণের সর্ব্বনাশী,
সারা প্রকৃতি আমায় রহে হুতাশে দহিতে ।
প্রতি মানব জীবন
দানব দেবনে ভরা
সুধু স্বার্থ সুধু স্বার্থ
সুধু শ্রান্তি সুধু জয়া,
আমি বুঝিনু ভুবন
নিরমম পাষাণ সম
হয়েছে কঠিন রচন,
তা' না হ'লে কেন কিছুই পারে না মোহিতে ?

শুক্ল-যজুর্ব্বেদ সংহিতা-প্রকাশিকা

লেখক—শ্রীযুক্ত তারানন্দ ব্রহ্মচারী ।

(সন ১৩৩৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিতের পরবর্ত্তী) ।

এই শুক্ল যজুর্ব্বেদকে এই জন্যই মাধ্যন্দিনীয় শাখা বলা হয় । ইহার প্রথমেই সূত্রিত হইয়াছে যে, "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১।৫।৬) অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য তাহা স্বীয় শাখোক্ত হওয়া প্রয়োজন । বেদের প্রতি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, বিনিয়োগ ও অর্থ-জ্ঞান সহিত অধ্যয়ন করা সর্ব্বথা বিধেয় । অন্যথা মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয় । "এতান্যবিদিত্বা যোঽধীতে নুব্রূতে* জপতি জুহোতি যজতে যাজয়তে তস্য ব্রহ্ম নির্বীর্য্যং যাতযামং ভবত্যথান্তরাশ্নগর্ত্তং বাপদ্যতে স্থাণুং বর্চ্ছতি প্রমায়তে পাপীয়ান্ বা ভবতি" (কাত্যায়ন অনুক্রম ১।১) যে ব্যক্তি বেদমন্ত্রের ঋষি ছন্দ আদি বিদিত না হইয়া পাঠ করে, শ্রবণান্তর উচ্চারণ করে, জপ হোম এবং যজন ও যাজনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, প্রথমতঃ তৎপ্রযুক্ত মন্ত্রের শক্তি হ্রাস হয়, পর্য্যুসিত হয়, সে অশ্বগর্ত্ত নামক নিরয়গামী হইয়া থাকে, স্থাণুত্ব প্রাপ্ত হয়, প্রমাদে পতিত হয় এবং পাপভাক্ হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, "অথ বিজ্ঞায়ৈতানি যোঽধীতে তস্য বীর্য্যবদথ যোঽর্থবিত্তস্য বীর্য্যবত্তরং হুত্বেষ্টা তৎফলেন যুজ্যতে" (অনু ১।১) যিনি ঋষি ছন্দ আদি জ্ঞাত হইয়া অধ্যয়ন করেন তাঁহার মন্ত্রে শক্তি আইসে এবং যিনি অর্থজ্ঞ তাঁহার অধিকতর মন্ত্রশক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই প্রকারে মন্ত্রের সম্পূর্ণ অবয়ব পরিজ্ঞাত হইয়া হোম ও যাজন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন । অতএব বেদ মন্ত্রের ঋষ্যাদি জ্ঞান ও অর্থজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক ।

এই শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ (২৮) কণ্ডিকা পর্য্যন্ত দর্শপূর্ণমাস ইষ্টি বিষয়ক মন্ত্র কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষোক্ত ছয়টী কণ্ডিকা পিতৃযজ্ঞ সম্বন্ধীয় মন্ত্র, তাহাদিগের প্রজাপতি ঋষি । এই সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি ঋক্ এবং

* অনুব্রূতে—অনু (পশ্চাৎ) ব্রূতে (বলা হয়) অর্থাৎ পূর্ব্বকালের এবং অধুনাও বেদ পাঠের নিয়ম এই যে, গুরু প্রথমে সমস্ত মন্ত্রটী শিষ্যকে শুনাইতে থাকেন ও শিষ্য পুস্তক অবলোকন করিতে থাকে । পশ্চাৎ গুরু-মুখ হইতে শ্রবণানন্তর শিষ্য পাঠ করিয়া থাকে ।

কতকগুলি যজুঃ নামে অভিহিত হয়। যাহা নিয়তাক্ষর পাদাবসানা তাহা ঋক্ এবং যাহা অনিয়তাক্ষর পাদাবসানা সেগুলি যজুঃ। প্রথম অধ্যায়ের কেবল মাত্র "পুরা ক্রূরস্য" (১।২৮) কণ্ডিকাটী ব্যতিরিক্ত সবই যজুর্নামক মন্ত্র। এই যজুর্মন্ত্র গুলির পিঙ্গল ছন্দ সূত্রানুসারে ছন্দ জ্ঞাতব্য। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কণ্ডিকাটীতে সর্ব্বসমেত পাঁচটী মন্ত্র আছে; তন্মধ্যে প্রথম দুইটী ত্র্যক্ষর, তৃতীয়টীতে চারিটি অক্ষর, চতুর্থমন্ত্র বাষট্টি অক্ষরের এবং পঞ্চমটি নবাক্ষরযুক্ত। যথা "ইষেত্বাদি"- এইটি এই সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কণ্ডিকা; ইহার প্রথম মন্ত্র 'ইষেত্বা'। এই প্রথম মন্ত্রটী দ্বিপদ ত্র্যক্ষর সম্বলিত। দৈবী অনুষ্টুপ্ ইহার ছন্দ,শাখা দেবতা, পলাশ শাখা ছেদনে ইহার বিনিয়োগ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শাখা দেবতা কিরূপে হইল যেহেতু শাখা অচেতন। স্বয়ং ব্যাসদেবের "অভিমান ব্যপদেশস্তু" নামক সূত্রটীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার অর্থ এই যে, শাখা অচেতন হইলেও তদভিমানী দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়াই শাখা দেবতা বলা হইল। শ্রুতিতেও প্রমাণ আছে যে, "মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্" অর্থাৎ মৃত্তিকা বলিল, জল বলিল ইত্যাদি। অতএব শাস্ত্রে অচেতন পদার্থের অভিমানী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই চেতনত্ব বিধান করা হয়।

প্রতিপদে দর্শযাগ চিকীর্ষু হইয়া অমাবস্যার প্রাতঃ কালে অগ্নিহোত্র সমাধা করতঃ তন্নিমিত্ত "মমাগ্নেবর্চঃ" (কাত্যায়ন সূত্র ২।১।৩) এই মন্ত্রে অগ্নিতে সমিদাধানরূপ অন্বাধান করিয়া বৎসকে গাভীর নিকট হইতে অপসারণ করিতে হয়, নচেৎ দধির জন্য দুগ্ধ পাওয়া যাইবে না। দর্শযাগে আগ্নেয় অষ্টকপাল, ঐন্দ্রাগ্ন ও ঐন্দ্রপয় নামক তিন প্রকার হবি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ দধিহবনকল্পে দধি নিষ্পত্তি হেতু অমাবস্যার রাত্রে গো দোহন করিবেন। গো দোহনের জন্য প্রাতঃ কালে দোহনান্তে মাতৃগণসহ চরণশীল বৎসগণকে পলাশ দণ্ড দ্বারা অপসারণ করিতে হয়, যেহেতু পলাশ শাখা ছেদনের বিনিয়োগ প্রযুক্ত হইয়াছে। পলাশ দণ্ডই আবশ্যক তাহার কারণ এই যে, একদা গায়ত্রী দেবী পক্ষিরূপ ধারণ করতঃ স্বর্গ হইতে যখন সোমলতা আহরণ করিতেছিলেন তৎকালে তৎপুত্র পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহা হইতে পলাশ উৎপন্ন হয় (শতপথ ব্রাহ্মণ), অতএব যজ্ঞকার্য্যে পলাশ শাখা প্রশস্ত, এইজন্যই পলাশবৃক্ষকে ব্রহ্মবৃক্ষ বলা হয় সুতরাং পলাশ শাখা ছেদনের বিধান করা হইয়াছে।

কর্ম্ম বিপাক।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

কর্ম্ম সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—সৎ ও অসৎ। সৎ কর্ম্ম করিলে মন প্রফুল্ল হয় সেইজন্য পুণ্যলাভ। এবং অসৎ কর্ম্ম করিলে মন বিষণ্ণ হয় সেই জন্য মনে হয় ঈশ্বর কুপিত হইয়া আমাকে শাস্তি দিবেন। প্রারম্ভে সকল মানুষেরই এই ভাব হয়, অভ্যস্ত হইলে ঐ ভাব ক্রমেই লুপ্ত-হইয়া যায়। পাপে অভ্যস্ত লোকের পাপভীতি থাকে না।

কর্ম্মজন্য ফলের যে পরিপাক তাহাই কর্ম্মবিপাক। নানাবিধ ব্যাধি শোক তাপ ঐ কর্ম্মের ফল। এই কর্ম্ম ত্রিবিধ, যথা—পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত, ইহ জন্মের কৃত ও আগামী জন্মের কর্ম্ম। কর্ম্মফলও তিন প্রকার-প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী।

মহামুনি শাতাতপ, ভৃগু ও ভরত-প্রমুখ ঋষিগণ পাপজ ব্যাধি বিনাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া গিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত বিহীন পাপীর নরকভোগের অন্তে প্রতিজন্মে তৎপাপ-সূচিত রোগযুক্ত শরীর লইয়া অশান্তিতেই কাল কাটে। এইজন্য প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য।

মানবের দুষ্কর্ম্মজনিত রোগ, ব্যাধি, দেবার্চ্চন, জপ, হোম ও দানাদি কর্ম্মে শান্ত্য ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মহাপাতক হইতে জাত ব্যাধি সপ্তজন্ম বর্ত্তমান থাকে। মানুষ বুঝিতে না পারিয়া বহুবিধ চিকিৎসা করায়, অনেক মুষ্টিযোগ সেবন করে কিন্তু ব্যাধির শান্তি হয় না। তখন যদি গুরূপদেশে দেবার্চ্চনাদি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে তবে অনেকটাই শান্তি হয়।

মহাপাতক পর্য্যায়, ঃ—কুষ্ঠ, (শ্বেতরক্ত ও কৃষ্ণ) রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাসঃ, অতিসার, ভগন্দর দুষ্টব্রণ গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষি-নাশন ইত্যাদি। উপপাতক সম্ভূত ব্যাধি পঞ্চজন্ম গতায়াত করে। যথা—যকৃৎ, প্লীহা, শূল, ব্রণ, শ্বাস, জীর্ণজ্বর, ছর্দ্দি ভ্রম, মোহ, গলগ্রহ, রক্তার্ব্বুদ বিসর্প ইত্যাদি। ইহাতে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই চলে।

পাপসম্ভূত ব্যাধি তিনজন্ম ব্যাপিয়া গতায়াত করে। দণ্ডাপতানক, চিত্রবপু, কম্প বিচর্চ্চিকা, বাল্মীক, পুণ্ডরীক ইত্যাদি। ইহাতে ষষ্ঠাংশ প্রায়শ্চিত্ত, অতি পাপে অর্শ আদি রোগ উৎপন্ন হয়।

রোগাদির শান্তি কল্পে প্রায়শ্চিত্ত করিবার কালে গবাদি দানের ব্যবস্থা আছে। তাহার সাধারণ বিধি এই, গোদানে সুশীলা সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী

বৃষদানে শুক্লবস্ত্র কাঞ্চন। ভূমিদানে দশনিবর্ত্তন-পরিমিতা ভূমি। সুবর্ণদানে শতনিষ্ক স্বর্ণ। অশ্বদানে সাজ-সরঞ্জাম সহিত সুশীলাশ্ব। মহিষদানে স্বর্ণাভরণ যুক্ত মহিষী। গজদানে সুবর্ণফলযুক্ত গজ। দেবার্চ্চনে লক্ষীপুষ্প দান করিতে হয়। বস্ত্রদানে কর্পূর মিশ্রিত পট্টবস্ত্র দিতে হয়। ধান্যদানে যষ্ঠিসংখ্যক খাড়ী পরিমিত ধান্য এবং ব্রাহ্মণভোজনে সহস্র ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্ন দান করিতে হয়।

কর্ত্তা দশজন অথবা পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। প্রথমে বিষ্ণুপূজা করিয়া (তৎশক্তে করাইয়া) সংকল্প করিবেন। পরে ব্রাহ্মণকে ধেনু দান করিয়া এবং বস্ত্রালঙ্কার দক্ষিণাদি প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডপ্রমাণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

জন্মান্তরীয় মহাপাতকের শেষ চিহ্ন কুনখাদি রোগ ও গলৎকুষ্ঠাদি। ইহার জন্য পরাক ব্রত আচরণ করিবে। কুষ্ঠাদির জন্য দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

কর্ম্মফলে ভ্রাতৃবধজনিত পাপে লোকে মূক হয়। তাহাতে চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিতে হয়। তৎপরে নিম্ন লিখিত মন্ত্রে পল পরিমিত সুবর্ণ সহিত পুস্তক (গীতা, ভাগবতাদি) ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। যথা :—

"সরস্বতি ! জগন্মাতঃ
শব্দ ব্রহ্মাদি দেবতে !
দুষ্কর্ম্ম করণাৎ পাপাৎ পাহি মাং
পরমেশ্বরি !"

কর্ম্মফলে মাতৃবধ-জনিত পাপে লোকে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহাতে— "ত্রিংশৎ প্রাজাপত্যানি কৃত্বা পল পরিমিতাং সুবর্ণ নাবং কারয়েৎ" অর্থাৎ ত্রিশটি প্রাজাপত্য করিয়া একপল পরিমিত সোনায় নৌকা তৈয়ার করাইবে। পরে তামার পাত্রে রূপার কলসী স্থাপন করিয়া নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত বিষ্ণুকে পট্টবস্ত্রে বেষ্টন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। তৎসমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবে। নিমন্ত্রিত অন্যান্য ব্রাহ্মণকে ভূরি ভোজনে পরিতুষ্ট করিয়া প্রচুর দক্ষিণা দানকরিবে। স্মৃতি শাস্ত্রে নানাবিধ ব্যাধির নানাবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। অলমতি বিস্তারেণ ইতি।

দেবতার বাহনতত্ত্ব।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

আর্য্য ঋষিগণ পুরাণে অনেক কথাই সোজাসুজি না বলিয়া ভঙ্গীক্রমে বলিয়া গিয়াছেন এবং ভঙ্গীকে সঙ্গী করিয়া তাঁহারা নানা রঙ্গী বাহনের কাছে রহস্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার চাবি কাটিটী ফেলিয়া রাখিয়াছেন।

মহাভারতে জগদ্বিখ্যাত ধার্ম্মিকা সাবিত্রীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বিষয়টীর সার মর্ম্ম কি ? পতিপরায়ণা সাধ্বীর ধর্ম্মবল কিরূপ তাহাই সবিস্তারে বলা হইয়াছে। আগের কথাই ধরি না কেন ? সত্যবানের আয়ুর অল্পতার বিষয় জানিয়াও দ্যুমৎসেন তাঁহারই করে কন্যার্পণ করিলেন। সত্যবান ভিন্ন সাবিত্রীর যে গতি নাই। কেননা "ইষ্টং ধর্ম্মেণ যোজয়েৎ" শাস্ত্রের এই বাক্যটি সফল হওয়া চাই ত।

যিনি চিরজীবন সত্য পালন করিয়া সাবিত্রী লাভ করিয়াছেন তিনি যে মরিয়াও অমর :—

"সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য পূজে সর্ব্বজন।"

সাবিত্রীর সহিত পাপ-পুণ্যের বিচারক ধর্ম্মরাজ যমের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। সেই সাক্ষাৎকারে ধর্ম্মের যে গূঢ় রহস্য প্রকাশিত, তাহা অতীব আশ্চর্য্য—অনির্ব্বচনীয়। সাবিত্রী ভিন্ন—সত্যবানজায়া সাবিত্রী ভিন্ন, সেই জটিল তত্ত্বের অর্থ বোধ করিবার সাধ্য কাহারই নাই। সেইজন্যই ত ধর্ম্ম মর্ম্মকথাগুলি অযাচিতভাবে সাবিত্রীকেই বলিলেন।

"যৎ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তং তেন যোজয়েৎ।"

সত্যবান ভিন্ন সাবিত্রীর পতি নাই, সাবিত্রী ব্যতীত সত্যবানের গতি নাই। ধর্ম্ম যাঁহাকে স্নেহ করেন, মধুময় ধর্ম্মকথায় মর্ম্মদেশ সিক্ত করেন, তিনি কি সাধারণ লোক ? জীবনের পরপারে বিচারক রূপে হয় ত ধর্ম্মরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে, কিন্তু জীবিতাবস্থায় কে কবে ধর্ম্মের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে ? সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ চিরভাস্বর তপনাত্মজের শাসন কি কম ?

তপনের বাহনগুলির দিকে লক্ষ্য করি। তিনি সপ্তাশ্ব বাহন। অশ্বগুলিও এক বর্ণের নহে, সপ্তবর্ণের। বেগুনে, নীল, আশমানি, সবুজ হরিদ্রা, কমলা ও

লোহিত এই সপ্তবর্ণ। সূর্য্যকিরণে ঐ সপ্তবর্ণ প্রকাশিত হয়। প্রাবৃটের দিনান্ত-কালে প্রতীচ্য গগনাঙ্গনে যখন বিরাট ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হয়, তখন তাহার নয়নবিমোহন শোভা দেখিয়া কে না মুগ্ধ হন ?

ইন্দ্রই সূর্য্য। অথবা সূর্য্যই ইন্দ্র। এই কথা বহু দিন পূর্ব্বে মহাত্মা কুমারিল্ল প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধগণকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। অহল্যাহরণ সংক্রান্ত কথা পড়িয়া বেদবিদ্বেষী বৌদ্ধগণ হিন্দুশাস্ত্রকে নিন্দা করায়, কুমারিল্ল ভট্টপাদ বলিলেন, "সমস্ত তেজের অধীশ্বর বলিয়া সূর্য্যকে ইন্দ্র বলা যায়। দিবসে লয় হয় বলিয়া রাত্রির নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্রকে অহল্যাজার বলে। পরস্ত্রী ব্যভিচার জন্য নহে।"

ইন্দ্রের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। সূর্য্যবাহনও অশ্ব। ইন্দ্রের সহস্রাক্ষি সূর্য্যের সহস্র কিরণ। সূর্য্যের একটি নাম ব্রহ্মা। ব্রহ্মার বাহন হংস! হংসের বর্ণ শ্বেত। এক সূর্য্যদেব কতই রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন!

বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—"একমাত্র রবিই ঋক্, যজু ও সাম ত্রয়ী শব্দার্থ প্রকাশিকা বিষ্ণুর ত্রয়ীরূপা শক্তি।" বিষ্ণুর ধ্যানে পাই, "শারদ-চন্দ্র-কোটি সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদাসম্ভোজং দধতং সিতাব্জ নিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহার কুণ্ডল মহামৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণং শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং বন্দে মুনিন্দ্রৈঃ স্তুতম্।"

বিষ্ণুই যে সূর্য্য তাহার প্রমাণ আর একটি ধ্যানে পাই "সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন সন্নিবিষ্টং"। সূর্য্যের যতগুলি বাহন, সময় সময় জগৎ কার্য্য ব্যপদেশে তিনি ততগুলি রূপধারণ করেন। প্রভাতের বালারুণ দ্যুতি দর্শনে মুগ্ধ আর্য্যগণ ভক্তি ভরে "বিবস্বতে ব্রহ্মণ-ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে" বলিলেন।

মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী শক্তির বন্দনায় নীলোৎপলদলপ্রভ কান্তির প্রকাশ দর্শন করিলেন। সায়াহ্নে শিবরূপা সরস্বতী মূর্ত্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিলেন। ঋক্ যজু ও সাম নাম্নী বিষ্ণুশক্তিই ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী।

সূর্য্যের সারথি অদিতিজ অরুণ। বিষ্ণুর বাহন ও অদিতিজ গরুড়। সূর্য্য ও বিষ্ণু উভয়ই আদিত্য। সমস্ত তেজের ও শক্তির ঈশ্বর ভগবান বিষ্ণুর শক্তিমান ও বেগবান বাহন গরুড় ভিন্ন আর কে হইতে পারে ?

সূর্য্যের স্ত্রী ছায়া ও সংজ্ঞা। কি সুন্দর সঙ্কেত! ঋষিগণের বর্ণনা কি গভীর রহস্যাবৃত! চাবিখানি হাতে দিয়া বলিতেছেন, "ঘর খোল", "পারিলে না? আচ্ছা,

চাবি দাও, শাস্ত্রান্তরে সকল রহস্যের সমাধান করিতেছি।"

এই বলিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞ আর্য্যগণ ঘর খুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপ এই, চোকে ছানি পড়িয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায় না। অবিশ্বাসী মন, ভাল করিয়া বিশ্বাস করে না। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

যেখানে সৌরকিরণ, সেইখানেই ছায়া। যেখানে চন্দ্ররশ্মি, সেই স্থানেই ছায়া। চন্দ্রের একটী নাম গোতম বা গৌতম। গো মানে কিরণ, তম্ অর্থে বাঞ্ছা করা। তাহা হইলে গোতম অর্থে কিরণপ্রার্থী। চন্দ্র সূর্য্যের নিকট কিরণ প্রাপ্ত হয়েন। সূর্য্য-কিরণ প্রাপ্ত না হইলে সকলেই সংজ্ঞাহীন হইত সন্দেহ নাই। পালনকর্ত্তা ভগবান বিষ্ণু। তাঁহার সহায় আদিত্য গরুড়। শক্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পালন করিতে হইলে ধনধান্যের প্রয়োজন। ধনদাত্রী লক্ষ্মীদেবীই ধনধান্য প্রদান করেন। তাঁহার বাহনটিও তাঁহার উপযুক্ত। মাতা কমলা মৃদুপ্রকৃতি, বাহনটিও তদ্রূপ। বাহনটির বর্ণ শ্বেত। নিষ্পাপ ধর্ম্মময়। ইন্দুরে ব্রীহি যবাদি শস্য ভক্ষণ করিয়া জীবগণের ক্ষতি করে; সেই জন্য ষড়্‌বিধ ঈতির পর্য্যায়ে ইন্দুর বাবাজীর সাক্ষাৎ পাই। যথা—

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভাঃ মূষিকাঃশুকাঃ।
অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ঈতয়ঃ ষড়্‌বিধস্মৃতাঃ।"

পেচক ইন্দুর ধরিয়া খায়। সুতরাং পেচক আমাদের উপকারী। অমঙ্গলা রূপিণী বায়সপত্নীর সঙ্গে মঙ্গলময়ী কমলার বাহনটির বনে না। মহাকবি দাশরথী রায় মহাশয় বলিয়াছেন, "যেমন ভীম আর কীচকে, তেমনি কাক আর পেচকে'। পেঁচা বলিয়া আমরা নির্ব্বিরোধ "ঘরকুনো" (যাঁহারা ঘরের মধ্যেই শাস্ত্র চর্চ্চা করেন) ভদ্রলোককে যেন আর গাল না দিই।

কুন্দেন্দুধবলা বাগীশ্বরীর বাহন হংস এবং শ্বেতশতদল। বর্ণময়ী সরস্বতী মাতা বাক্য কথনের শক্তি। কথা না কহিলে জীব-জগতের উন্নতি হইত কিরূপে? পরম ধর্ম্মবিদ্ আর্য্যগণ জ্ঞান নেত্রে যাহা দর্শন করিয়াছেন, আমরা বাহ্য দৃশ্যে ভুলিয়া কিছুই দেখিতে পাই না।

পদ্মাসনা বাক্‌বাদিনী বীণাযন্ত্র বাদ্য করিতেছেন, আর মহাভক্ত হংসদেব শুনিতেছেন। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী স্তব করিতেছেন। কোকিল, ভ্রমর, অলি প্রভৃতি বিহঙ্গনিচয় স্তব্ধভাবে সঙ্গীতালাপ শ্রবণ করিতেছে, এমন সময় দেবর্ষি

নারদ আগমন করিলেন। তাঁহার হস্তে বীণাযন্ত্র, বাহন, সেকালের এয়ারোপ্লেন—ঢেঁকী। এই ঢেঁকী তত্ত্ব বুঝাইবার শক্তি দেবর্ষি ব্যতীত আর কাহারই নাই।

বহুদিন পূর্ব্বে একটি যাত্রার দলে "ঢেঁকীতত্ত্ব" শ্রবণ করিয়াছিলাম। দেবর্ষি বলিতেছেন :—

এ তো সহজ ঢেঁকী নয়।
গুরুদত্ত মন্ত্র মুসল, তুষ গুঁড়া সব করে লয়।
সাধন মহাক্ষেতে জ্ঞানশূর্পবাতে
কাম ক্রোধ লোভে করে ক্ষয়।
তখন আসল শস্যবাজে
হরিনামে ম'জে সংসার সমরে লভে জয়।

সুতরাং এ ঢেঁকী কেবল সর্ব্বত্রগামী এবং কলহরত মনুষ্যগণের উৎসাহ দাতা নহেন, ইনি সাধকের মহাসাধন সহায়। যেমন দেবর্ষি তাঁহার বাহনটিও তেমনি! মহাসাধক নারদের উপযুক্ত বাহনই বটে!

এক দেবতা—বাহনে, অস্ত্রে, সপরিবারে মিলিয়া তেত্রিশ কোটি! বোধ হয় তাহারও উপরে। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, মহামারী ম্যালেরিয়া ইহাদেরও দেবতা আছেন। ওলাদেবী, বিসূচিকা রাক্ষসী ও শ্রীশ্রীশীতলা দেবীর নাম ত্রিভুবনবিদিত। ইহা ছাড়া সর্প, ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লুক, শৃগাল, কুকুর, ইহাদেরও দেবতা আছেন। মনসা, দক্ষিণরায়, ভগবতী দুর্গা ঋক্ষপতি জাম্বুবান শিবানী ও শ্রীশ্রীদত্তাত্রেয় ইহারাই যথাক্রমে ঐ সকল জীবজন্তুর প্রভু।

বাহ্য জগতের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আর্য্যগণ বৈদিক দেবদেবীর পূজা করিতেন। শেষে যেমন যেমন বিপদ বাড়িল, দেবতার সংখ্যাও তেমনি বাড়িয়াই চলিল! বেরি-বেরি, ইনফ্লুয়েন্জা, ব্রঙ্কাইটস্ প্রভৃতি দেবতাগণ কবে প্রকাশিত হইবেন?

ভূমণ্ডলস্থ ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়গণের মতে প্রস্তুত বিংশবর্ষকাল সুপ্রচলিত

প্রত্যেক মহৌষধাবলীর নাম ও ট্রেডমার্ক হাইকোর্টের সুবিখ্যাত এটর্নী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল, দ্বারা আইনানুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে—ক্রেতাগণ ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।



বর্ত্তমানকালে জ্বররোগে যত প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে ডাক্তারি মতের ঔষধই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আশু ফলদায়ক তাহা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার মহাশয়গণের দ্বারা এই "**শম্ভুসুধা**" মহৌষধটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শম্ভুসুধা সেবনে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর, নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ঘুস্‌ঘুসে পালাজ্বর, কম্পজ্বর, মেহ ও প্রমেহ ঘটিত জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, বাতজ্বর পিত্তজ্বর কফজ-জীর্ণ জটিল জ্বর, কালাজ্বর ও ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বরই শম্ভুসুধা সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়, এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। শম্ভুসুধা ২৪ মাত্রা সেবনেই জ্বর বন্ধ হয়, কিছুদিন ব্যবহারে প্লীহা যকৃৎ কমিয়া যায় এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরভাব সর্দ্দি কাশী হইলে শম্ভুসুধা একমাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের জড়তা দূর হইবে। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে টনিকের কার্য্য করে; অতএব শম্ভুসুধা প্রত্যেক গৃহস্থের সর্ব্বদা গৃহে রাখা আবশ্যক, শরীর সামান্য একটু শ্লেষ্মা ভারাক্রান্ত বোধ হইলে একমাত্রা "শম্ভুসুধা" সেবন করিলে শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। মূল্য প্রতি ৮ আট আউন্স শিশি ৸০ আনা ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।

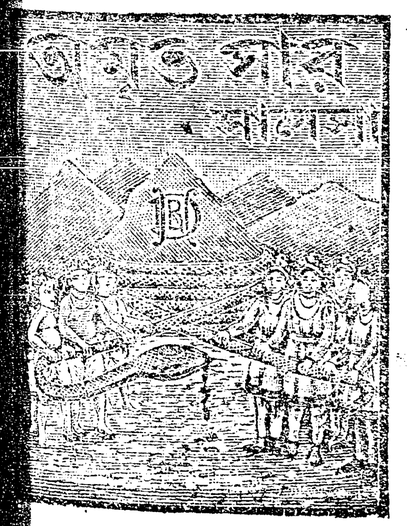

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্নস্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে "**অমৃত সাল সালসা**" সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের "অমৃত সালসা" সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে যে কয়টী গুণ থাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ; মাঃ ।৵০ ছয় আনা।—৬ শিশি ৫।০ টাকা ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র, এক ডজন লইলে ১০৲ টাকা।

স্থাপিত—১৮৩৩

চিরায়ত

রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহস্থ মহোদয়গণের জন্য হীরা, চুনি, পান্না, এবং মুক্ত বিমণ্ডিত আধুনিক ডিজাইনের সর্ব্বপ্রকার জহরতের অলঙ্কার, সেপ্টিপিন, লেশপিন, ইয়ারিং আংটি ও সকল রকম ঘড়ি, সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের জিনিষ লইলে নগত টাকায় শতকরা ১৫৲ টাকা কমিশন পাইবেন।

রায় ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৪ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্রষ্টব্য—সোল এজেণ্টস্—বেনলোমণ্ড ওয়াচ কোং ও দি পি, ওয়াচ কোং।

এন, দত্ত ব্রাদার্সের স্বর্ণ ঘটিত অমৃতসার সালসা

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে 'অমৃতসার সালসা' সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনেরকোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের 'অমৃতসার সালসা' সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটী গুণথাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সার সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ মাঃ ॥০ আনা। ৩ শিশির মূল্য ২॥০ অড়াই টাকা মাঃ ১৲ এক টাকা।

৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র।

জন্মভূমি

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী)

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

সপ্তত্রিংশ ভাগ—সপ্তত্রিংশ বর্ষ।

১৩৩৮ সালের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত

দ্বাদশ সংখ্যাসম্পূর্ণ।

কলিকাতা হাটখোলা দত্তবাটী

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট,

জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে

সত্ত্বাধিকারী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

printed by N. Dutta at the

"JANMABHUMI PRESS"

39, Manick Bose's Ghat Street

CALCUTTA.

1932.

[বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা] [ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা]

সপ্তত্রিংশ বর্ষের সূচীপত্র।

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	অভিমান ও অহঙ্কার	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬০
২।	অধঃপতন	„ „ „	১০৮
৩।	অনুপ্রাস ও মাধুর্য্য	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	১২৫
			১৫৭১৭৭,
৪।	অধিকার	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	২৫৩
৫।	অন্নপূর্ণা	„ নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি	৩৬৫
৬।	আর্দ্রক বা আদা	কবিরাজ-শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ রসায়ন শাস্ত্রী	২৭৯
৭।	আশুতা	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৫১
৮।	আচার ও যোগ	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধায় কাব্য-রত্নাকর	২১১
৯।	আবাহন	„ নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য	১৮০
১০।	কর্ম্ম-বিপাক	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	৩৪৬
১১।	কবিবর ৺দাশুরায়ের অনুপ্রাস	„ „ „	৫৭
১২।	কবির বিভ্রাট	„ যতীন্দ্রলাল দাস বি, এল,	৭৮
			১১৯, ১৪৭
১৩।	কলির শেষ	„ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১১৭
১৪।	কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয়	„ শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৪
১৫।	কয়েকখানি পত্র	„ অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	২৪২
১৬।	কেন	„ শৈলরাণী বসু বি, এ,	৩৬৩
১৭।	গীত	„ রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	৮৮
১৮।	গোবর্দ্ধন জামাই	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি	৩০৮
১৯।	গুরুভক্তির পরিণাম	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	২১৩, ২৮১
২০।	চির-দুঃখী	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	৪১

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
২১।	চাণক্য	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মৈত্র বি,এ,	১১০
২২।	চৈত্রের চিতা	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩১৯
২৩।	জগতে	শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু বি, এ,	৩৪৪
২৪।	জীবই কৃষ্ণ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ	৩১
২৫।	দেবতার বাহনতত্ত্ব	„ রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪৯
২৬।	দশবার দুর্গানাম জপ	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২৮৩
২৭।	নিরাশায় আশার আলো	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	২৮
২৮।	নব বর্ষ	... ...	১
২৯।	নারিকেল	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি	২৮২
৩০।	পরীক্ষা	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩০৫
৩১।	প্রেম	„ পূর্ণেন্দুনাথ রায়	৩৪৩
৩২।	পাগল	„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৩
৩৩।	প্রাচীন গল্প সংগ্রহ	শ্রীহ-জ-বর-ল	১৮৩
৩৪।	বিশ্বামিত্র ও বিধাতা	শ্রীযুক্ত রাম সহায় বেদান্তশাস্ত্রী	১৪৪
৩৫।	বর্ষাকাল	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি	৮৩
৩৬।	বিদায় কালে	শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু বি, এ,	৫৬
৩৭।	বীরভূমির তীর্থ	„ রাজেন্দ্র নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর	৩৪১
৩৮।	বীর বালক	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০২
৩৯।	ব্লাডপ্রেসার	কবিরাজ শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র শাস্ত্রী	২৯৮
৪০।	বিনামূল্যে দেশীয় ঔষধ	„ „ ইন্দুভূষণ সেন	২২২
৪১।	বহুমূত্র	ডাঃ সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার এম, ডি, কে, টী	২৭৩
৪২।	বরষারাণী	শ্রীযুক্ত জহরলাল বিশ্বাস	৬১
৪৩।	বঙ্কিম স্মৃতি	„ হরেন্দ্রনাথ সিংহ কবিভূষণ	৬৩
৪৪।	বালক ও বালিকা	শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়	৬৬
৪৫।	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব		১৭
৪৬।	বন্ধকী পুত্র		২৯
৪৭।	ভিক্ষা	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু নাথ রায়	৩৪৩
৪৮।	ভক্তের ভগবান	কবিরাজ „ আশুতোষ ধন্বন্তরী	১৪০

সংখ্যা	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
৪৯।	ভূতের গল্প	„ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৪৩
৫০।	মনের কথা	„ আশুতোষ ঘোষ	৯৫
৫১।	মানসী	„ কমলাকান্ত মৈত্র বি, এ,	৭৯
৫২।	মায়াজাল	„ আশুতোষ ঘোষ	৭
৫৩।	মিত্রসহ রাজার কর্ম্মফল	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর	২৮৬
৫৪।	যে হও সে হও	„ আশুতোষ ঘোষ	১০৭
৫৫।	যুগধর্ম্ম বা কালস্রোত	গোপীচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ	৩৭০
৫৬।	রাতপ্রভাতে	শ্রীযুক্তা শৈলরাণী বসু বি, এ,	৩৬৪
৫৭।	লুচি মোণ্ডার বিবাদ	„ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	১৫
৫৮।	লেবুর উপকারিতা		১৪১
৫৯।	শ্রীগৌরাঙ্গ	শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৭৮
৬০।	শ্রীমদ্ বালানন্দ	শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২, ৩৩, ৬৫, ৯৭, ১২৯, ১৬১, ১৯৩, ২১৭, ২৫৭, ২৮৯, ৩২১, ৩৫৩
৬১।	শ্রেষ্ঠ কে ?	„ আশুতোষ ঘোষ	৯৩
৬২।	শঙ্খ	„ নরেন্দ্রনাথ ভটাচার্য্য	১৮৫
৬৩।	শক্তি	„ শৈলরাণী বসু বি, এ,	১৮১
৬৪।	শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রকাশিকা	তারানন্দ ব্রহ্মচারী	৩৪৫
৬৫।	স্বর্গীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	„ শ্রীশচন্দ্র চটোপাধ্যায়	১০
৬৬।	স্মৃতির রেখা	„ রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	২৫৬
৬৭।	সত্যকাম জাবাল	„ রাজেন্দ্র নারায়ণ কাব্যরত্নাকর	৪২
৬৮।	সমালোচনা	৬৪, ১৬০, ১৯২, ২৫৬	
৬৯।	সুন্দরীর উপকথা	„ কমলাকান্ত বসু	৪৬
৭০।	সন্ধানে	„ „ বি, এ,	২০৯
৭১।	সংসারে ব্রহ্মসাধন	„ ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস, সি, বি, এল	২১৬
৭২।	সিঁথির সিন্দুর	„ কমলাকান্ত বসু	২৭৭
৭৩।	হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা	শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু	৩৩৮, ২৬৬, ৩১৩, ৩৭৯
৭৪।	হাণ্টারের পরিণাম	„ রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮৪
৭৫।	হারাধনের স্বর্গলাভ	„ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি	৩৩৮
৭৬।	হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্ম্ম	„ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এম এ, বি, এল্,	৩৭৩

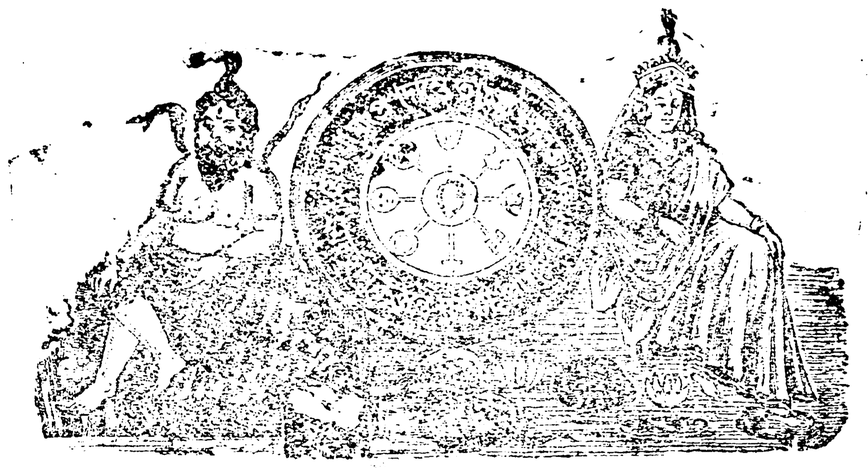

সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৩৭শ বর্ষ | ১৩৩৮ সাল, চৈত্র | ১২শ সংখ্যা

শ্রীমদ্‌বালানন্দ।

লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় খণ্ড উপদেশাবলী।

২। অভ্যাস—

অভ্যাস সাধন দুহ হৈ একরূপ।
ছোড়নে দুঃখ করনে সুখ হৈ ব স্বরূপ॥

পূর্ব্ব প্রবন্ধ বিচারে এটুকু বুঝা গিয়াছে যে পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয়। তবে আমরা "অহং অহং" করিয়া যে একটা দ্বৈত বুদ্ধি লই ও তাহা বোধ করিয়া একটা পার্থক্যজ্ঞান ও পরিচ্ছিন্নতা বোধ করিয়া লই, তাহা অজ্ঞানসম্ভূত। ইহা একটী ভ্রান্ত কল্পনা। এ ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় পরমাত্মা-আশ্রিত মায়ার মল বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তির দ্বারা। ইহা যে ভ্রান্তি তাহা শতবার শ্রবণ করিলেও অপনোদিত হয় না। ইহা দূর করিয়া পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে "মনন" ও "নিদিধ্যাসন"

মানুষ নিদ্রাবস্থায় যে সুখানুভব ও দুঃখ নিবৃত্তির বোধ করে ইহা কি জন্য এখন ভাবিয়া দেখা যাউক। বেশ বুঝা যায় যে এ অবস্থায় "মনোনাশ" বা "বাসনাক্ষয়" হয়। নিদ্রাবস্থার এ সুখ যদিও স্থায়ী নহে তথাপি এ সুখের উপলব্ধি করিয়া ও এই মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া যদি ঐরূপ "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" রূপ সুখ পাইবার পথ থাকে এবং তজ্জন্য যদি তাহার অন্বেষণ না করে তবে আর মনুষ্যজীবন লাভের ফল কি? মনুষ্য সর্ব্বদাই সাবধান থাকে যে কেহ যেন তাহাদিগকে ফাঁকী না দেয়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে সে নিজে নিজকে কিরূপ ঠকায় তাহা এক বারও ভাবে না। এ মনুষ্যজীবন যে অতি দুর্লভ তাহা কেহ ভাবে না। Darwin সাহেবের Swrvival of the fittest হিসাবেও এ মনুষ্যজীবনকে fittest বলা যাইবে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে—

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈত দৈবানুগ্রহ হেতুকং।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥"

বিবেক চূড়ামণি।

অর্থাৎ এ সংসারে তিনটী প্রাপ্তি মহা দুর্লভ। ইহা হইতেছে মনুষ্যজীবন-লাভ, মহাপুরুষের সঙ্গলাভ এবং মুমুক্ষুত্বরূপ পরমানন্দলাভ। এ তিনটীই দৈবানুগ্রহে লাভ হয়। তবে কি দেবতার পক্ষপাতিতা আছে? না, তাহা নহে। দেবতার অনুগ্রহলাভ নিজ চেষ্টা ও অভ্যাস সাপেক্ষ।

প্রকৃতির বশে সম্পূর্ণ না চলিয়া ইহার অনুকূলমতে বিধিযুক্ত সাধনা করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আছে। এই বিধিমত চলিলে যে ফল হয় তাহার কর্ত্তা দেবতারা। এ জন্যই দেবতার অনুগ্রহ অর্থের মূল হইতেছে নিজের সাধনা। মনুষ্য-জীবনে বুদ্ধি বা বিবেক, স্মরণ শক্তি ও বাক্ শক্তি অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া এ মনুষ্যজীবন শ্রেষ্ঠ। এ সকল শক্তি আছে বলিয়া মনুষ্যসকল পশু জাতির উপর অধিপত্য করে।

এরূপ দুর্লভ মনুষ্যজীবন পাইয়া

"ইত কোন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্ত স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষং॥"

অর্থাৎ এই দুর্লভ মানবদেহ পাইয়াও যে নিজের স্বার্থ সাধনরূপ উন্নতির চেষ্টা না করে তাহা অপেক্ষা মূর্খ আর কে আছে? এই যে চেষ্টা করা, ইহাই হইল "পুরুষকার"; কারণ "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মানুষ মাত্রেই কেহ দুঃখ চাহে না এবং নিজ নিজ সুখ কামনা করে। শরীর

একটু অসুস্থ হইলেই বিষম দুঃখিত হইয়া পড়ে এবং নানা ডাক্তার ও ঔষধের সাহায্য লয়। কিন্তু কি করিলে শরীর সুস্থ থাকিবে, পূর্ব্বে তাহার অনুসন্ধান করে না। বহুবিধ ব্যাধিযুক্ত হইয়া লোকে নানারূপ কষ্টের অনুভব করে। মানুষ সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে দহ্যমান হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে এ সমুদয় তাপ হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইবে তাহার জন্য একবারও চিন্তা করে না। নিজ দেহ বা দেহ-সংশ্লিষ্ট বিষয় পাইয়া কিরূপে সুখী হইবে তজ্জন্য সামান্য পৌরুষকারের কার্য্য করে কিন্তু যথার্থ পুরুষকার যে কি তজ্জন্য বড় অধিক চিন্তা করে না। এই যে "পুরুষার্থ" লাভের চেষ্টা, ইহাই হইতেছে "অভ্যাসের" মূলভিত্তি। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে "ত্রিভি-র্তাপৈ নিবৃত্তি পুরুষার্থ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিতাপের নিবৃত্তিরূপ যে ফল, তাহাই পুরুষার্থ। পূর্ব্বোক্ত তিন তাপ কি? (১) আধ্যাত্মিক তাপ—শরীর দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই অন্নময় কোষ। ইহা অন্নপ্রাপ্তির দ্বারা উৎপন্ন, পুষ্ট ও রক্ষিত হয়। আর বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা যাহা স্থিত, তাহাই হইল সূক্ষ্ম। ইহা অনুভূত হইলেও দৃষ্টিগোচর হয় না। আধি ও ব্যাধি দ্বারা বা রোগ ও কামক্রোধাদির দ্বারা এ শরীরই পরিতপ্ত হয়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। এই প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশকেই বলে আধ্যাত্মিক দুঃখ।

(২) আধিভৌতিক তাপ—মনুষ্য নিজ শরীর ব্যতীত বহিস্থ অন্যান্য মনুষ্য, হিংস্রজন্তু পশুপক্ষী হইতে যে দুঃখানুভব করে তাহাই আধিভৌতিক।

(৩) আধিদৈবিক—দৈব ঘটনা বশতঃ অর্থাৎ ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয় সেই দুঃখ হইল আধিদৈবিক।

মানুষমাত্রেই এ সমুদয় দুঃখের কিছু না কিছু প্রাপ্ত হয়, এ দুঃখ হইতে অব্যাহতিলাভের ইচ্ছাও করে; কিন্তু কিরূপে ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবে তাহার যথার্থ উপায় জানেনা বা জানিয়াও নিবৃত্তিলাভের অভ্যাস করে না। সাংখ্য দর্শনকার এজন্য বলিলেন,—

"দুঃখ ত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽ ভাবাৎ"

অর্থাৎ উক্ত তিন প্রকার দুঃখ দ্বারা তাড়িত হইয়া দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জানিবার জন্য সকলে ইচ্ছা করে। বেশ, দুঃখ নিবারণের জন্য নানারূপ দৃষ্ট

উপায় ত পড়িয়াই আছে সেই মত কার্য্য করিলেই ত হইল ? তজ্জন্য আবার চিন্তা কি ? এজন্য সাংখ্যকার বলিলেন—না, কেবল দৃষ্ট উপায় মত চলিলে হইবে না। এরূপ করিলে সাময়িক সামান্য মাত্র দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু একেবারে নিবৃত্তি হইবে না। কোনরূপ ব্যাধিকে যদি যথার্থরূপে নিবারণ করা আবশ্যক হয়, তবে কি কারণে রোগের উৎপত্তি হইল, তাহার নিদান ঠিক করিয়া ঠিক ঔষধ ব্যবহাররূপ চিকিৎসা করিলে তবে রোগের একেবারে নিবৃত্তি হয়। এজন্য উক্ত প্রকার দুঃখের নিদান শাস্ত্রসম্মত উপায়ে করা আবশ্যক। এজন্য সাংখ্যকার উক্তবিধ দুঃখের নিদান কি ও তাহা কিরূপে নিবৃত্তি হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনা করিলেন। এই যে তত্ত্বের আলোচনা ও তাহার বিধিমত অবলম্বন, তাহাই হইল অভ্যাস ॥

সুতরাং বুঝা গেল যে এ দুঃখ নিবারণের বা পরমানন্দ প্রাপ্তির উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এজন্য প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে শাস্ত্র কি ? শাস্ত্র আর কিছু নয়—ইহা হইতেছে শ্রেষ্ঠ পুরুষবিশেষ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নিয়মাবলী। ইহা ভবিষ্যতে যাহাতে কল্যাণ হইতে পারে তজ্জন্য স্বাভাবিক উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে শাসন করিবার উপায়। যখনই শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হইবে তখনই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে যিনি এসব নিয়মাবলী আচরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন তিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ ! তিনি সকলের হিতার্থে করিয়াছেন ! সাধারণের যাহাতে হিত হয় এ বিষয়ে বিবেচনা করিবার তাঁহার দক্ষতা আছে।

পুনরায় শাস্ত্রের উপদেশ ও বিধি বলিলেই স্বীকার করিতে হইবে যে এ নিয়মের অভ্যাস করিতে হইবে। এ অভ্যাসের ভিত্তিই হইতেছে যে নিয়মিত চেষ্টা অথবা পুরুষকার। কেবল মাত্র নিয়ম জানিয়া কোন ফল নাই। এখানে পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে ও কার্য্য করিতে হইবে। রীতিমতভাবেই এই কার্য্য করাই হইল অভ্যাস। ব্যবহারিক বা পারমার্থিক উন্নতি সাধনা অভ্যাস ভিন্ন কখনই হইবে না। ইহার মধ্যে ব্যবহারিক পুরুষকার হইতেছে অধিকাংশই দৈহিক সুখ লইয়া এবং ইহা কখনই স্থায়ী হয় না। কিন্তু পারমার্থিক উন্নতি হইতেছে স্থায়ী সুখ লইয়া। এজন্য এ স্থানে যে অভ্যাসের বিষয় অবতারণা হইয়াছে তাহা ইহার প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া বুঝিতে হইবে।

তবে ইহা বলা যাইতেছে যে ব্যবহারিক বা পারমার্থিক উন্নতি বাহ্যতঃ

বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইলেও যদি একান্তভাবে শান্তি লাভের বিষয়ে উহাদের চিন্তা করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, উহা একই, পৃথক্ নয়। একটী বিষয়ে জ্ঞান-লাভ হইলেই, এ উভয় একই রূপ হয়। এজন্যই শঙ্করাচার্য্য আত্ম-বোধে শুনাইলেন যে,—

"যল্লাভান্নাপরোলাভো যৎসুখান্নাপরং সুখং।
যজ্-জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ॥"

পূর্ব্বেই বলা হইল যে, ইহা অভ্যাস বিনা হয় না। চেষ্টা তিন কারণে হয়। ইহা হইতেছে (১) স্ব ইচ্ছা (২) পর ইচ্ছা (৩) দৈব ইচ্ছা। যখন নিজের অন্তরে এক প্রবল ইচ্ছা হইয়া লোকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তখনই ইহাকে স্বইচ্ছা বলা যায়। এরূপ ইচ্ছা বহু কারণে হইতে পারে। দ্বিতীয় হইতেছে পর-ইচ্ছা। নিজের মনে প্রথমতঃ কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্ত্রী পুত্র-বন্ধুবান্ধব ও গুরুজনেরা "এইটী কর, এইটী করা উচিত" বলিয়া প্রেরণা করিতে করিতে এক ইচ্ছার উদ্রেক হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্তি আইসে। তৃতীয় হইল দৈব-ইচ্ছা। কোন স্থান হইতে যাইবার আদৌ স্বতঃ বা পরতঃ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সে স্থান জলপ্লাবিত হইল, সুতরাং স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে হইল। ইহা হইল দৈব-ইচ্ছা। হঠাৎ কোন মহাপুরুষের কৃপালাভ হইল। এই সমুদয় ইচ্ছার মধ্যে স্ব ইচ্ছায় যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাতেই অভ্যাসের প্রবৃত্তি সমধিক। এই তিন ইচ্ছা-জনিত অভ্যাস ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় মার্গেই দৃষ্ট হয়।

পুনরায় সাধনপথে পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে, তিনটী কৃপার অপেক্ষা করে। ইহা হইতেছে "ঈশ্বর কৃপা"। "গুরুকৃপা" ও নিজ "অন্তঃকরণের কৃপা"। অনেকেই বলেন "যাহা করেন ভগবান" "যাহা করেন গুরুদেব"। এরূপ বলিয়া অনেকেই পুরুষকার অবলম্বন করিতে নিরস্ত থাকেন, কিন্তু ইহা কেহ বুঝেন না যে, এই ঈশ্বর কৃপা বা গুরুকৃপালাভ হয় যদি নিজ অন্তঃকরণের কৃপা জনিত পুরুষকার বর্ত্তমান থাকে। ঈশ্বর কৃপা বা গুরু কৃপার উপর একান্ত নির্ভরতারূপ পুরুষকারশূন্যতা আসিতে পারে এক সময়ে যখন সম্পূর্ণ পুরুষার্থ লাভ করিয়া মানুষ উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় হয়! "জনামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি" ইহা বলিয়া লোকে পুরুষকার শূন্য হইতে পারে, যখন সে পুরুষার্থ বলে অনুভব করিতে পারে "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন" এবং এরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদি কেহ চিন্তা করে, তবে বুঝিতে পারিবে যে "ঈশ্বর কৃপায়" বা "গুরু কৃপায়" কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব নাই। চন্দ্র সূর্য্য সমভাবেই কিরণ দিতেছেন, অগ্নি বায়ু সমভাবেই সকলের জন্য কার্য্য করিতেছে। গঙ্গার প্রবাহ সমভাবেই সকলের জন্য বহিতেছে। কিন্তু নিজ নিজ অন্তঃকরণের কৃপা দ্বারা যদি ঐ সকল কেহ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করে, তবে উহাদের প্রাপ্তি কখনই হইবে না। গঙ্গাজল পাইবার অতীব আবশ্যকতা আছে বুঝিয়াও যদি নিজের অন্তঃকরণের প্রেরণায় উহা লইতে না যায় অথবা গঙ্গাজল আনিবার জন্য কোনরূপ পাত্র না লইয়া যায়, তাহাতে গঙ্গাপ্রবাহের কোন দোষ নাই। অথবা যদি কেহ একটী ছোট ঘট লইয়া যায়, তবে সে ঘটের মত জলই লইয়া আসিবে। সুতরাং এই যে অন্তঃকরণের কৃপালাভরূপ পাত্র প্রস্তুত করা, ইহাই হইল স্বইচ্ছা-প্রণোদিত পুরুষকার। আর এই ইচ্ছার সহিত যে বার বার চেষ্টা, তাহাই হইল "অভ্যাস"। এই অভ্যাসই হইতেছে সমুদয় সাধনের মূল। সাধনার এই অভ্যাস পথে যে যতদূর অগ্রসর হয়, সে ততই ঈশ্বর-কৃপা ও গুরুকৃপালাভ করে। ইহা তাঁহাদেরই বিধি-বোধিত নিয়ম। কৃষকের দৃষ্টান্তে ইহা বেশ বুঝা যায়। গুরুরূপী মহাপুরুষ দুইটী কৃষকরূপ অজ্ঞকে কৃপা করিয়া তাঁহার রক্ষিত সজীব বীজ দুইজনকে প্রদান করিলেন ও উহার উৎকর্ষণের বিধিও বলিয়া দিলেন। যে কৃষক গুরুপ্রদর্শিত মার্গে উক্তবীজে জলসিঞ্চন করিল উহার ধ্বংসকারী ঘাসগুলির উচ্ছেদ করিল, ক্ষেত্রের যথার্থরূপ কর্ষণ করিল, সেই উত্তম ফসল প্রাপ্ত হইল। উপরোক্ত ফলপ্রাপ্তির প্রধান ক্রিয়াই হইতেছে তাহার "অভ্যাস" ও "পুরুষকার"। যে করিল না সে সব পাইয়াও এবং জানিয়াও উত্তম-হীনতার জন্য কিছুমাত্র ফসল পাইল না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যথার্থ শান্তি ও তজ্জন্য পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় "মনোনাশে" ও "কামনাক্ষয়ে"। এ দুইটীই হইতেছে পরম পুরুষার্থ। এইজন্য শ্রীভগবান গীতা-শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥"

অর্থাৎ মনের শান্তিতে সকল সুখ প্রাপ্তি হয় ইহা ঠিক এবং এ মনও যে, সহজে নিরোধ হয় না বা ইহা অতিশয় অস্থির ইহাও ঠিক। কিন্তু ইহাকে নিরোধ করিবার অভ্যাস ও ইহার নিরোধ হইলে কি ফল প্রাপ্তি হয় তাহা বিচার রূপ বৈরাগ্য দ্বারা জানিয়া তবে ইহাকে নাশ করা যায়। এই মনোনাশ ও কামনাক্ষয় ইহা একই বস্তুর দুইটী প্রকার ভেদ মাত্র।

তবে কিরূপ অভ্যাস করিলে, এই মনোনাশ হইবে তাহার কতকগুলি শাস্ত্র-বিধিযুক্ত নিয়ম আছে। আর এ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া, কেহ যদি স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, তবে তাহার ফল প্রাপ্তির আশা নাই। এজন্য এই গীতাতেই শ্রীভগবান বলিলেন যে,—

"যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥"

অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া, কেহ যদি কামচারী হইয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তবে সে সুখও পায় না ও পরাগতি (মোক্ষও) প্রাপ্ত হয় না। এ অভ্যাস কিরূপে করিতে হইবে বা কোন বিষয়ে করিতে হইবে, তাহা গীতা-শাস্ত্রেই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা,—

"বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
"শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌব্যুদস্য চ॥
"বিবিক্তসেবী লঘ্বশী যতবাক্কায়মানসঃ।
"ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
"অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
"বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

যত প্রকার সাধন আবশ্যক তাহা ইহাতেই সংক্ষেপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বলিলেন যে, সত্বগুণের উৎকর্ষতা দ্বারা বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, ধৈর্য্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিয়মিত বা নিরোধ করিতে হইবে, শব্দাদি বিষয় হইতে চিত্ত-বিক্ষেপজনক ভাব গুলিকে অপসারণ করিতে হইবে, তাহার পর পবিত্র ও নির্জ্জনস্থানে বাসের অভ্যাস করিতে হইবে, পরিমিত ও লঘুভোজন করিতে হইবে, ধ্যানযোগ দ্বারা যথার্থ চিত্তের অত্যন্ত শান্তি দায়ক যে অভীষ্ট তাহাতে সর্ব্বদাই স্পর্শযুক্ত থাকিতে হইবে, বৈরাগ্যযুক্ত বা নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার করিয়া যাহা নিত্য তাহারই প্রাপ্তি কামনা করিতে হইবে। ইহার পর অহংকার, দুশ্চেষ্টা, দর্প, অপ্রাপ্ত বা অনিত্য বিষয়ের ইচ্ছা, ক্রোধ প্রভৃতি ত্যাগ করিতে হইবে, কেবলমাত্র দেহরক্ষার্থ প্রাপ্ত বিষয়েই সন্তোষ গ্রহণ করিতে হইবে এবং মমতাশূন্য হইয়া সর্ব্বদাই প্রশান্তচিত্ততা লাভ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলে, তবে সেই অভ্যাসী ব্রহ্মত্ব লাভের যোগ্য হইবে। কিরূপ উপায়ে এ সকল অভ্যাস করিলে এই অবস্থা প্রাপ্তি হইবে, তাহাই হিন্দুদিগের

বিষয়	পৃষ্ঠা।
তুমিই আমার দেবতা	৪৮৩
দুঃখ	২৯৫
দেখা হইল না বলিয়া	৮০
নিশীথে গঙ্গাতীরে	৫৮০
সবিসেই, সবিসেই	৪৪০
হাস্যরস	৪২
শ্রীচারুশশী চট্টোপাধ্যায় এল, এম, এস্	
আরোগ্য বিধান	৪৪৮
শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত	
অজ্ঞাত (কবিতা)	৩১৩
বর্ষা ঐ	৪৮৭
শ্রীতুলসীদাস চক্রবর্ত্তী বি, এ,	
বীরভূমের ইতিহাসের একপৃষ্ঠা	৪৫৪
শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়	
চণ্ডীদাস ও তাঁহার কবিতা	৩২৮
দান (কবিতা)	৫১৩
দীপান্বিতা (কবিতা)	৬১১
শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় বি, এ,	
চণ্ডীদাসের নবাবিস্কৃত পদ	৫
রামায়ণ রহস্য	৫৩৩
শ্রীবরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি, এস,	
সিদ্ধি (কবিতা)	৪১৭
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,	
আগন্তুক (গল্প)	৩০৪
গঙ্গা পূজা (ঐ)	১৭৩
শ্রীব্রহ্মচারী নির্ম্মল বি, এ,	
দীনতা	৫২১

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
শ্রীবিশ্বনাথ মাইতি বি, এল,	
প্রমীলা ও ইন্দুবালা	২৫৩
শ্রীভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	
জুলিয়া ওয়ার্ড হাউ	২৯৭
শ্রীমণিভূষণ সেন এম, এ,	
প্রতিষ্ঠা ও ভক্ত	২০৪
বৈষ্ণবধর্ম্মে মধুর ভজন	২৪২
৺মহম্মদ আজীজ উস্ সোভান	
আমি বাহিত ভারত বুকে (কবিতা)	৫৫৪
কারে ভালবাসি ঐ	৪৩১
কি দোষ ঐ	৩১৬
দিও দেখা ঐ	১৩৯
ফুলের ভালবাসা ঐ	৪১
বঁধুয়া রহল পরবাসী ঐ	৭৯
বাসনা ঐ	৪৮৮
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বি, এ,	
ঈশ্বরতত্ত্বের দুরূহতা	১৯২
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য	
চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে স্থানীয় কিম্বদন্তী	৪৩৩
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি, এ,	
একখানি ছবি (গল্প)	১৯৬
কবি	১৬৯
কবি রজনীকান্ত স্মরণে	৯৫
থিওক্রিটাসের অনুকরণে (কবিতা)	৩১২
পদ্মকোটা ঐ	৪৪
প্রসাদ ঐ	১৫১
মানসিক ঐ	৯৯
মালাগাঁথা ঐ	৫৬৭

নিবিড় নীরদ চিরিয়া
দামিনী খেলিয়া বেড়ায় ?
কেন দশদিক্ হ'তে
দহিছে পরাণ উতাপে ?
কেন মিছামিছি কেন
অবিরত প্রাণ বিলাপে ?
কেন চারিদিক্ হ'তে
আসে না ভাসিয়া পাপিয়া ?
কেন উজল তপন
কাজল গগন ছাপিয়া
আভাস নাহিক ছড়ায় ?

প্রাতঃপ্রভাতে !

পোহ'াল পোহা'ল পোহ'াল রাত্রি।
শয়নে মগন কে অই যাত্রী ?
প্রভাতী কূজন গাহিছে পাখী,
বহিছে পবন দুলায়ে শাখী,
মন্দ মন্দ
কুসুম গন্ধ
আসিছে ভাসিয়া কানন-ধাত্রী।
উঠ উঠ ছাড়িয়া শরণ পান্থ !
মেল মেল যুগল শয়ন শান্ত,
দেখ দেখ চেয়ে
পূরব-গায়ে
ভাসিছে উজল তপন প্রভা,
জ্বালিছে নীহার মোহন শোভা
নিদ্রাহারা
মুগধ পারা—
আহা কি শান্তিধারা, দিল সে দাত্রী।

অন্নপূর্ণা।

লেখক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত হরিদেবপুরে বহু গণ্য মান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। এই স্থানে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন বহুদিন যাবৎ প্রতিপত্তির সহিত বাস করিয়া গত ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে শশিভূষণ ও নিশিভূষণ নামে দুই পুত্রকে রাখিয়া পরলোকগত হন। তখন শশিভূষণের বয়স অষ্টাদশ বৎসর, তিনি সংস্কৃত কলেজে এফ, এ, পড়িতেছিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা নিশিভূষণের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, তিনিও উক্ত কলেজিয়েট স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাশে পড়িতেছিলেন। উঁহাদের মাতৃদেবীও বহুদিন পূর্ব্বে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর চারি বৎসর পূর্ব্বে উভয় ভ্রাতার বিবাহ হইয়াছিল। পৈতৃক সম্পত্তির উপসত্ব হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত এবং দুই ভ্রাতায় পরস্পর খুব সদ্ভাব ছিল।

কিছু দিন পরে শশিভূষণ এফ,এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের আফিসে একটী চাকুরি করিতে লাগিলেন। নিশিভূষণ দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ করিতে না পারিয়া লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়া পৈতৃক শিষ্য যজমানের পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে লাগিলেন।

শশিভূষণ এক জন স্ত্রৈণ পুরুষ। তিনি স্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করিতেন—ইহাই ভ্রাতৃবিরোধের প্রধান কারণ। স্ত্রীলোককে পণ্ডিতেরা 'দারা' বলেন। দারার একটী বিশেষ অর্থ এই যে স্ত্রীলোকেরাই আপন সহোদর ভ্রাতাকেও পর করিয়া দেয়। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের প্রধান কারণ স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের ন্যায় ঝগড়া বাধাইবার গুরুমশাই আর দুটী নাই। মহাকবি তুলসীদাস স্ত্রী-বিরোধী ছিলেন, তিনি স্ত্রীলোককে বলিয়াছেন :—

"দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী,
ঝলক ঝলক লহু চুষে।
দুনিয়াকা আদমি সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পুষে॥"

আরও রামায়ণে দেখা যায় রাজা দশরথ একজন অত্যন্ত স্ত্রৈণ পুরুষ

ছিলেন। তাহার ফলে রামচন্দ্রের বনবাস হইয়াছিল এবং সেই শোকে দশরথেরও মৃত্যু হইয়াছিল।

শশিভূষণের একটী পুত্র ছিল,আর একটী কন্যা জন্মাইল এবং নিশিভূষণেরও একটী পুত্র সন্তান হইল। ক্রমে ক্রমে উভয় ভ্রাতার মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হইতে লাগিল। নিশিভূষণ শ্রাদ্ধ শান্তি করাইয়া ভাল ভাল তৈজসপত্রাদি ও খাট বিছানা পাইতেছেন দেখিয়া তাঁহার বৌদিদির চক্ষুশূল হইল। তিনি নানা প্রকারে স্বৈণ স্বামীর কাণ ভাঙ্গিতে লাগিলেন। কিছুদিনের পর স্ত্রৈণ শশিভূষণের ঔষধ ধরিল, স্ত্রীর পরামর্শে নিশিভূষণকে পৃথক্ করিয়া দিলেন এবং নিজে পৈতৃক সম্পত্তির চৌদ্দ আনা অংশ কাড়িয়া লইলেন। নিশিভূষণ অতি ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ইহাতে কোন আপত্তি না করিয়া পৃথক্ হইলেন এবং সন্তুষ্ট মনে যজমানের কার্য্য চালাইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শশিভূষণ তখন সুস্থির হইলেন এবং স্ত্রীর পরামর্শে কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশিভূষণের সহিত আর বাক্যালাপ করিতেন না। নিশিভূষণ জ্যেষ্ঠ সহোদরের এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন।

এইভাবে কিছু কাল কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নিশিভূষণের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল, কারণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশিভূষণ, তাঁহার প্রায় চৌদ্দ আনা শিষ্য যজমান হস্তগত করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ দিয়া যজমানগণের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। ইহাতে নিশিভূষণ কোন কথা না বলিয়া কেবলমাত্র ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। নিশিভূষণের স্ত্রী পতিব্রতা ছিলেন, সর্ব্বদাই স্বামীসেবা করিতেন, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

এই ভাবে আরও দুই বৎসর অতি-বাহিত হইল। নিশিভূষণের পত্নী একটী পরমা সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যাটী পাইয়া নিশিভূষণ আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এক দিন নিশিভূষণ নিদ্রা যাইতে যাইতে স্বপ্নযোগে জটাজুট-গৈরিকবসনধারী এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। সেই মহাপুরুষ যেন বলিতেছেন, "এই কন্যাই তোর একমাত্র উদ্ধারের পন্থা, এই কন্যাই তোর পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দিবে।" নিশিভূষণের নিদ্রাভঙ্গ হইলেও যেন মহাপুরুষের ঐ কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিশিভূষণ প্রথমে ভাবিলেন স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র। মনে মনে তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন, আমি সর্ব্বদাই চিন্তাগ্রস্ত, আমার স্বপ্ন কি সত্য হইবে? তিনি তাঁহার পাঠ্য পুস্তকে যে শ্লোকটী পাঠ

করিয়াছিলেন, সেইটী আওড়াইলেন, "ব্যাধিতেন সশোকেন চিন্তাগ্রস্তেন জন্তুনা। দুরাকাঙ্খেন মত্তেন দৃষ্টঃ স্বপ্নঃ নিরর্থকঃ॥" কাজেই এইরূপ স্বপ্নদর্শন তাঁহার পক্ষে বড় সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইল না। সে যাহা হউক তিনি কন্যাকে বার বার নিরীক্ষণ করিয়া সস্নেহে কন্যার মুখচুম্বন করিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কি বলিলেন, কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। নিশিভূষণ কন্যার নাম অন্নপূর্ণা রাখিলেন।

ক্রমে ক্রমে নিশিভূষণের পুত্র সাত বৎসরে পড়িয়া পাঠশালায় পড়িতে লাগিল। তাঁহার পুত্রের নাম সুবোধ। সুবোধ অতি বুদ্ধিমান এবং দেখিতে অতি সুন্দর। কন্যা অন্নপূর্ণা সত্য সত্যই দেবী অন্নপূর্ণা, সেরূপ সুশ্রী কন্যা অদ্যাবধি মনুষ্যগৃহে কখন দৃষ্ট হয় নাই। অন্নপূর্ণার এমন রূপ যে, তাহাকে দেখিবার জন্য বহুদূর-দেশ হইতে স্ত্রীলোকগণ আসিতে লাগিল, অন্নপূর্ণার বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। নিশিভূষণের অবস্থা সেই সময় নিতান্ত শোচনীয়, অমন সুন্দরী কন্যারও তিনি ভালরূপ ভরণ পোষণ করিতে না পারায় তিনি সর্ব্বদাই হা হুতাশ করিতেন।

ছয় বৎসরে পদার্পণ করিয়া অন্নপূর্ণা পিতার নিকটে প্রথমভাগ শিক্ষা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অন্নপূর্ণা দশ বৎসরে পড়িল, নিশিভূষণ কি করিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করিবেন, এই চিন্তায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন এবং দিন দিন ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। এই ভাবে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন নিশিভূষণের স্ত্রী অন্নপূর্ণার একটী সৎপাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিশিভূষণের অবস্থা তখন অতি শোচনীয়। স্ত্রীর এই অনুরোধে মর্ম্মাহত হইলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বার বার ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। নিশিভূষণ সমাজের ব্যাপার জানিতেন; পাত্রের পিতা মেয়ে সুন্দরী দেখে না, শুধু টাকাই চেনে। নিশিভূষণ কপর্দ্দকশূন্য, কাজেই তিনি কাহারও নিকট ঘেঁসিতে না পারিয়া ভাবনার অকূল পাথারে ভাসিতে লাগিলেন, স্ত্রীর অনুরোধে "হ্যাঁ কি না" কিছুই বলিলেন না। অন্নপূর্ণার মাতা স্বামীর অবস্থার বিষয় বিশেষ অবগত ছিলেন, কাজেই আর কোন কথা না বলিয়া মনে মনে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকিতে লাগিলেন। মায়ের দয়া হইল, সত্বর অন্নপূর্ণার একটী সৎপাত্র জুটিয়া গেল।

এক দিন কৃষ্ণনগরের একজন ব্রাহ্মণ জমিদার কোন কার্য্য উপলক্ষে হরিদেবপুরে আসিয়াছিলেন এবং ঘটনাক্রমে নিশিভূষণের বাটীর সম্মুখ

দিয়া যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে অন্নপূর্ণা দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল। অন্নপূর্ণার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের দিকে জমিদারের নজর পড়িল। তিনি বালিকাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাহাকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া লজ্জাবনত মস্তকে তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জমিদার কিন্তু অন্নপূর্ণার পরিচয় লইবার জন্য সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় নিশিভূষণের একজন প্রতিবেশীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তাহার নিকট হইতে অন্নপূর্ণার সমুদয় পরিচয় পাইয়া নিশিভূষণকে ডাকিতে লাগিলেন। নিশিভূষণ বাহিরে আসিলেন। উভয়ে কিছুক্ষণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। জমিদার নিশিভূষণকে বলিলেন, "আমি আমার পুত্রের জন্য একটী সুন্দরী পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এক্ষণে আপনার কন্যাকে আমার পছন্দ হইয়াছে, আপনার কন্যাকে আমার পুত্রের সহিত বিবাহ দিব।" এই কথা শুনিয়া এবং জমিদারের পরিচয় পাইয়া নিশিভূষণ স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। জমীদার বলিলেন, "অদ্যই পাকা দেখা হউক," এই বলিয়া নিশিভূষণের সহিত বাটীর মধ্যে গেলেন এবং আর একবার অনিমিষ নয়নে অন্নপূর্ণার দিকে দেখিতে লাগিলেন এবং অন্নপূর্ণার হস্তে পাঁচটী গিনি দিয়া পাকা দেখা করিলেন। অন্নপূর্ণা গিনিগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়া ভক্তি সহকারে জমীদারকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। সুবোধও তাহাই করিল। জমিদার নিশিভূষণকে বলিলেন, "বেহাই মহাশয়! আপনার কোন ভয় নাই, আমি পুত্রের বিবাহে এক পয়সাও চাইনা। আমি এই বিবাহের সমুদয় ভার স্বয়ং বহন করিব।" সত্য সত্যই জমীদার তাহাই করিয়াছিলেন। জমীদার-পুত্র কার্ত্তিকেয়সদৃশ রূপবান, অন্নপূর্ণা যেন তাঁহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল।

স্বল্প দিন পরেই মহা ধুমধামের সহিত অন্নপূর্ণার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া গ্রামবাসী সকলেই অবাক হইল। নিশিভূষণ ও তাঁহার পত্নী অন্নপূর্ণাকে সৎপাত্রস্থ করিতে পারিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। শশিভূষণ ও তাঁহার পত্নী এই ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া ঈর্ষানলে পুড়িতে লাগিলেন। শশিভূষণের কন্যা কদাকার, বহুঅর্থ ব্যয় করিয়াও পাত্র জুটিল না। জমীদার অন্নপূর্ণাকে বধূরূপে গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই নিশিভূষণকে বাটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। নিশিভূষণ সেই অর্থে পৈতৃক ভদ্রাসনের উপর-সুন্দর একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহা

দেখিয়া তাঁহার বৌদিদির হৃদয় হিংসায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চিরদিন কখন সমান যায় না। এক দিন অন্নপূর্ণা তাহার জেঠামহাশয়ের দুর্ব্যবহারের কথা স্বামীকে জানাইল। তাহার স্বামী সেই কথা পিতাকে জানাইল। জমীদার এই বিষয় অবগত হইয়া লোকজন সঙ্গে লইয়া শশিভূষণের বাটীতে গেলেন এবং নিশিভূষণের সমুদয় সম্পত্তি উদ্ধার করিলেন। নিশিভূষণের শিষ্য যজমানও বজায় হইল। নিশিভূষণ পরম আনন্দিত হইয়া বার বার ভগবানকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় তিনি স্বপ্নাবস্থায় যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কথা স্মরণ হইল এবং তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন। "সত্য সত্যই মা অন্নপূর্ণা কন্যারূপে আমার গৃহে আসিয়া এ যাত্রা আমার জীবন রক্ষা করিলেন।"

অনেকের মনের ধারণা এই যে, কন্যাই জগতে দুঃখের কারণ কিন্তু তাহা নহে। "শত পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রস্থ হয়,"। অন্নপূর্ণার ব্যাপার হইতে সে ভ্রম দূর হইবে। প্রায়ই দেখা যায়, সুলক্ষণা কন্যার পাত্র অনুসন্ধান করিতে হয় না, পাত্র আপনা আপনি আসিয়া জুটে। আরও দেখা যায়; ধার্ম্মিক ব্যক্তির কখন কষ্ট হয় না। নিশিভূষণের ন্যায় পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কি কখন কষ্ট হয়?

ওদিকে অধার্ম্মিক পরশ্রীকাতর শশিভূষণের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কাল গ্রাসে পতিত হইল, তাঁহার পত্নী পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে অমঙ্গল ঘটিতে লাগিল। শশিভূষণের চাকুরির জবাব হইয়া গেল। অনুতাপে শশিভূষণ মৃত প্রায় হইয়া মনে মনে বুঝিতে পারিলেন ধর্ম্মেরই জয়।

যুগধর্ম্ম বা কাল-স্রোত।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোপীচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ।

আজকাল যুগ-ধর্ম্ম বা কালস্রোত বলিয়া একটা বাক্য-স্রোত চারিদিকে বেশ বহিতেছে। নব্য ভাবুকের বিশ্বাস কালস্রোতে ভাসিতেই হইবে। এই স্রোত অপরিহার্য্য, অপ্রতিকার্য্য—তার বিরুদ্ধে চলা বা চেষ্টা করা অবিমৃশ্যকারিতামাত্র। কিন্তু সনাতনপ্রথা-রক্ষণশীলদলের বিশ্বাস অপরিহার্য্য বা অপ্রতিকার্য্য বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা বা গা ঢালিয়া চলা মূর্খতার কার্য্য। ভাগীরথীর খরস্রোতে পড়িলে আত্মরক্ষা হইবে না জানিয়াও আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া কেহ থাকিতে পারে কি? তুচ্ছ তৃণই স্রোতে গা ঢালিয়া দেয় ও অনন্ত ঘাত প্রতিঘাতে অনির্দ্দিষ্ট বিপৎসাগরে বিলীন হইয়া যায়, গুরুত্ব-বিশিষ্ট বস্তু স্রোতে ভাসিতে জানে না এবং তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্নও হয় না, কোন রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে। স্রোতের গতি সর্ব্বদা তীব্র থাকে না, মৃদু গতি আসিলে বিপৎ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু লঘু বস্তু তৃণাদির দ্রুত গতিতে অন্তর্দ্ধান অবশ্যম্ভাবী।

গঙ্গার প্রখর স্রোতে হস্তী ভাসিয়া গিয়াছে বলিয়া কি সে স্রোত প্রকাণ্ড সেতু দ্বারা আবদ্ধ হয় নাই? খাল কাটা হেতু গঙ্গার প্রখরতা মন্দীভূত হয় নাই কি? এইরূপ কত কত প্রবল স্রোতের উপর সেতু স্থাপিত হইয়াছে। এই কাল-স্রোতের উপরও চেষ্টা, অর্থব্যয়, কৌশল, শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রভৃতির সেতু স্থাপিত হইতে পারে। সময়ের অপেক্ষা করিতে হইবে বটে।

প্রবল গ্রীষ্ম শীত বর্ষা প্রভৃতির খর স্রোতে প্রাণিমাত্রই বিরুদ্ধ চেষ্টা দ্বারা আত্মরক্ষা করিতেছে, গা ভাসাইয়া দিতেছে কয়জন? চেষ্টা ও দ্রব্যগুণে গ্রীষ্মে শীত ও শীতে গ্রীষ্ম বোধ হইতে পারে না কি? এই কলিতে সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক নাই কি? সত্য সতীত্ব সদাচার এখনও অনেকই আছে। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের আধিক্য থাকিতেও হিরণ্যকশিপু রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছিল। যাঁহাদের ভিতরে জাতিত্বাভিমান আছে তাহারা উন্মাদ প্রভৃতি বিকট রোগ বা অভাব গ্রস্তের ন্যায় জাতিত্ব ত্যাগ বা আত্মহত্যা করিতে পারে না।

কালস্রোতে মিথ্যা ভণ্ডকতা, কদাচার ব্যভিচার প্রভৃতি অধর্ম্ম প্রবল

ভাব ধারণ করিয়াছে বলিয়া নিজের পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে বা নিজকে সেই স্রোতে ভাসাইয়া দিতে সকলের ঐকমত্য হওয়া কি উচিত? তাহা হইলে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা কেন? ছেলে অসচ্চরিত্র হইলে দুঃখ করা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে না কি? ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সৎ পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক নহে কি? বিধবাদের পবিত্র নিয়ম আচার জলাঞ্জলি দেওয়াই কি কর্ত্তব্য? যুগধর্ম্মে যাহা যাহা হইবার সম্ভাবনা শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন সেই সেই বিষয়ে বাধা না দিয়া তাহার আনুকূল্য করাই কি উচিত? কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রবল স্রোতে সকলেই নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া আত্মরক্ষার উপায়ে যত্নবান হয় কেন? বৃদ্ধ পিতা মাতা বা বালক যুবক প্রভৃতির আসন্ন মৃত্যু ধ্রুব জানিয়াও সেবা বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কেন? তাহাতে ত কোন মতদ্বৈধও হইতেছে না কেন?

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং বহু ভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং॥

ইত্যাদি শাস্ত্রকে অগ্রিসাৎ করাই কাল-স্রোতবাদীর প্রধান কর্ত্তব্য।

কাল স্রোতের জোয়ার ভাটা অথবা বর্ষা শীতের ন্যায় বৃদ্ধি হ্রাস হয় না কি? তাহা হয় কেন? লোকের চেষ্টা দ্বারা নহে কি? অথবা তাহা দৈব বা ভগবানের খেলা নহে কি? সামাজিক রীতি নীতি ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল বিষয়ের স্রোতই সমান ভাবে স্থায়ী নহে। আর্য্য ধর্ম্মের স্রোতের প্রাবল্য কমিয়া বৌদ্ধ জৈন যবন ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মের উত্থান পতন এবং সকল ধর্ম্মের নিষ্পেষণে হিন্দু ধর্ম্মের এখনও অস্তিত্ব দেখিয়া শুনিয়া কালস্রোতের নিত্যতা বা প্রখরতা ও অপরিহার্য্যতা পক্ষান্তরে হিন্দু ধর্ম্মের বিনাশ আশঙ্কা হইতে পারে কি? স্রোতে গা ভাসাইয়া ঘাত প্রতিঘাত খাওয়াতে পৌরুষ নাই নিজেকে বা সমাজকে স্রোতের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক কালের একটা বৈশিষ্ট ও সুরুচি কুরুচি নামে ২টী পদার্থ আছে। বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি সময়ে দুষ্ট স্রোতের হাত হইতে রক্ষার জন্যই শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে।

আজ কাল যাহা যাহা যুগ-ধর্ম্ম বলা হইতেছে, তাহাকে কাল-স্রোত বা যুগ ধর্ম্ম না বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতই বলা উচিত। সৎ ও অসৎ সংসর্গে লোক সৎ ও অসৎ হইয়া থাকে, ইহা সকলেরই বিদিত।

যৌবনেন ন যে নষ্টা নষ্টা নান্যেন তে জনা। যোগবাশিষ্টবলিয়াছেন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নে কফ পিত্ত বায়ুর প্রবাহ হয়, মানব তার বিরুদ্ধ ব্যবহারে সুখী হয়। রাত্রিতে অন্ধকার প্রবাহ হয়ঃ তাহার বিরুদ্ধ আলোর ব্যবহার হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রবাহে অন্নাদি পানাদি দ্বারা সেই স্রোত দূর করা হয়।

এইরূপ ক্রোধ লোভ কাম প্রভৃতির প্রবাহ রোধ করা মঙ্গল ও প্রশংসার বিষয়। ইত্যাদি বহু বহু সরল সুবোধ্য বিষয় আমাদের নিত্যই চক্ষুর উপর ক্রীড়া করিতেছে, একটু মনোনিবেশ করিলেই বেশ বুঝা যাইতে পারে।

যে বিষয়ের স্রোতের ফল মঙ্গলকর, তাহার বাধা দেওয়া উচিত নহে, তাহা মানবস্বভাবও নহে, যেমন সত্য, সরলতা, দয়া, ধর্ম্ম, জ্ঞান, দান, রীতি, নীতি, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, ও অধ্যায়ন ইত্যাদি। এই বিষয়ে বহু দৃষ্টান্ত আছে, বাহুল্য ভয়ে নীরব থাকা গেল।

প্রত্যেক জিনিষকে রূপক দ্বারা ভাল রূপে বুঝান যায় বটে, কিন্তু সর্ব্বাংশে রূপকত্ব রাখা যায় না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে তাকে রূপক দৃষ্টান্ত বা উপমা বলা যাইতে পারে না। কতক বিষয়ের সাম্যই রূপক বা দৃষ্টান্ত। চন্দ্রবৎ বলিলে শুভ্রতা বা গোলাকার বুঝিতে হয় না। গর্দ্দভতুল্য বলিলে চতুষ্পাদ কদাকার জন্তু বুঝায় না। বুঝায় চন্দ্রের আহ্লাদকতা, গর্দ্দভের মূর্খতা।

হে কালস্রোতভীত ভারতসন্তানগণ! আমরা নিত্যই কাল স্রোতের প্রতিকূল ভাবাপন্ন হইয়া চলিতেছি। কলিতে মানুষ রুগ্ন, দুর্ব্বল, অল্পায়ু, দরিদ্র ও অধার্ম্মিক হইবে, আমাদের তার প্রতীকারে প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব কলির কর্ম্মনাশা নদীর তীব্রস্রোতে ধর্ম্মসেতু স্থাপন করিয়া অদ্যাবধি লোকের যাতায়াত ব্যাপারের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। রামকৃষ্ণ, তুলসীদাস প্রভৃতিকেও একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা কি অন্যায় করিয়াছেন? তাঁহাদের কার্য্যের সুফল ভোগ করিতেছি না কি?

যাঁহারা কাল স্রোতে ঘূর্ণী পোকার মতন ভাসিয়াছেন, কতদূর শান্তি সুখে আছেন, তাহা তাঁহারা সত্য করিয়া বলুনত?

ঘূর্ণী পোকা কাকতালীয়বৎ কাননের নানাপুষ্পের সুবাস-গন্ধ উপভোগে কদাচিৎ কৃতার্থ হইলেও অথবা কোন মহাপুরুষমস্তকে বা ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে সমর্থ হইলেও কত প্রকার ঘাতপ্রতিঘাত মলমূত্রাদি অপবিত্র দুর্গন্ধ বস্তু। বৃহৎ জলজন্তুকেও ঘূর্ণীপাকের কবলে অবশ্যই পতিত হইতে হইবে। সামান্য ও আপাতমধুর সুখ ভোগের পরিণাম কি, তাহা কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না, স্রোতপতিতের দুর্দ্দশা দেখিয়াও দেখেন না।

কালস্রোতের অনুকূলে চলা আর জাতি, ধর্ম্ম ও সমাজনাশক কার্য্যে যত্ন করা একই কথা হইতেছে এবং কালস্রোতের প্রতিকূলে চলা আর জাতি ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য চেষ্টা করা একই কথা দাঁড়াইতেছে। কাল স্রোতে চলিতে গিয়া যথেচ্ছাচারিতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি? যাহারা দেশ ও সমাজের হিতকামী, তাহাদের পক্ষে সমাজ ও ধর্ম্ম বিপ্লব উৎপাদন না করিয়া পৃথক ভাবে থাকিয়া প্রাচীন প্রথায় সমাজের মঙ্গলকর কার্য্য করাই সমীচীন।

খাদ্যাখাদ্যাদি বিচারের গূঢ় রহস্য যতক্ষণ নিশ্চয় রূপে জানা যাইতেছে না তত দিন অতি প্রাচীন—যাহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ ভাবে ধ্বংস করা মূর্খতা ও উপহাসাস্পদ।

হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্ম।

লেখক—শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্ম্ম উভয়ে উভয়ের নিকট কতদূর ঋণী, এবিষয়ে প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন পণ্ডিতগণই একমত হইতে পারেন নাই। অনেক খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণের মতে হিন্দুধর্ম্মের বহু আচার পদ্ধতি খৃষ্টধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আবার অনেক প্রত্নতত্ত্ববাদী খৃষ্টধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অনুকরণ বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং যীশুখৃষ্ট যে বারাণসীধামে আগমন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ বিষয়েও প্রমাণ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা উভয় ধর্ম্মের কোন্ কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা বিবৃত করিব। এস্থানে বলা আবশ্যক যে বিষ্ণুর নবম অবতার প্রচারিত প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মকে আমরা হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করি।

প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র স্বরূপ ভারতবর্ষ যখন এসিয়ার মহাতীর্থ রূপে পরি-

গণিত হইত, তদানীন্তন অন্যান্য জাতিবৃন্দ যে অল্পবিস্তর ভারতীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল ইহা নিশ্চয়।

পণ্ডিতপ্রবর হার্ডার ভারতভূমিকে সমগ্র ধর্ম্মের প্রসূতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাঁর মতে মেসাসেস্ কতিপয় ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের উপদেশ সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র; বাইবেল কথিত গিহন সিন্ধুনদেরই অপর নাম, আরব-দিগের মধ্যে এই নাম অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

প্রাচীন খৃষ্টানদিগের যে মঠবাস প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং রোমান ক্যাথলিকগণ অদ্যাবধি যে প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, সেই প্রথার উৎপত্তি স্থান যে, ভারতবর্ষ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত; মঠবাস ভারতের চিরন্তন সম্পত্তি। ঠিক বৈদিকসময়ে ইহার অভ্যুদয় না হইলেও, ইহা খৃষ্ট জন্মিবার বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। খুব প্রাচীন আর্য্য শাস্ত্রে ইহার নিদর্শন দেখা যায় না। বস্তুতঃ যখন ব্রহ্মচর্য্য গুরুগৃহেই পালিত হইত, এবং গৃহস্থগণ পঞ্চাশের পূর্ব্বে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন না, তখন ঋষির আশ্রম হইতে পৃথক্ এই প্রকার আবাস স্থানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ অনুপকুর্ব্বান ব্রহ্মচারী এবং অকৃতদার বৈখানসের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় মঠবাস প্রথা বিস্তৃতি লাভ করে। বুদ্ধদেব ইহাকে স্বীয় ধর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপ গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের "সঙ্ঘের" স্থান কিরূপ উচ্চ তাহা, সকলেই জানেন। বুদ্ধদেবের পর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীমৎ রামানুজ স্বামী, শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সমভাবে এই প্রথার সমাদর করিয়াছেন, এবং অধুনা মঠবাস হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরি-গণিত হইয়াছে। অনেকেই জানেন, খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ, এক বিস্তৃত মঠরূপে পরিণত হইয়াছিল। রোমের পোপ এই বিশাল সঙ্ঘের নেতা ছিলেন, এবং সেণ্টপিটারের উত্তরাধিকারী স্বরূপ, তাঁহার হস্তে স্বর্গের চাবি থাকিত। জ্যাকলিয়ট নামক ফরাসী লেখকের সুপ্রসিদ্ধ পিতৃতত্ত্ব নামক গ্রন্থে আমরা ভারতবর্ষীয় মঠবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল দেখিতে পাই। জ্যাকলিয়ট তাঁহার পুস্তকে খৃঃ পূঃ ৪ হাজার বৎসরের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন; এবং তাঁহার প্রণীত এই পুস্তকের একাংশে এইরূপ লিখিত আছে:— (ভারতীয়) মঠের অধিবাসীগণ এক সভা নির্ব্বাচন করিতেন এবং সভাপতি ব্রহ্মাত্মা নামে অভিহিত হইতেন * * * * তিনিই গুপ্তমন্ত্রের একমাত্র রক্ষক ছিলেন * * * স্বর্ণময় ত্রিকোণ যন্ত্রে মন্ত্র

সংরক্ষিত হইত, এবং যে কৌটার ভিতর মন্ত্র থাকিত তাহার চাবি ব্রহ্মাত্মা ভিন্ন অপর কেহ স্পর্শ করিতে পারিত না। * * মরণকালে তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীকে ঐ চাবি দিয়া যাইতেন।

ইহা ব্যতীত বহুবিধ আচার ও অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ও ক্যাথলিক ধর্ম্মের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবুহক্ নামক জনৈক রোমান ক্যাথলিক মিশনারি তিব্বত ভ্রমণ কালে এইরূপ বহু জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তিব্বতীয় লামাগণ, মন্দি-রের বাহিরে ধর্ম্মকার্য্য করিবার সময় ক্রশিয়ার ও মিটার ব্যবহার করেন, বৌদ্ধ মন্দিরে ক্রীশ্চান সামের ন্যায় সংগীত প্রথার প্রচলন আছে, বৌদ্ধ যতিগণ শিষ্যের মস্তকে বাম হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ইহাঁদের মস্তক মুণ্ডনের প্রথা খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় ধর্ম্মযাজকগণের নিকট আত্মাপরাধ স্বীকার, সেণ্ট বা মহাত্মাদিগের উপাসনা, মন্দিরে পুষ্প, অর্ঘ এবং বর্ত্তিকা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে উভয় ধর্ম্মের ঐক্য যথার্থ বিস্ময়কর। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টধর্ম্মের "ত্রিমূর্ত্তি" সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। খৃষ্টধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি বলিতে "পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা" বুঝায়। পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। বৌদ্ধ ধর্ম্মেও 'বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ' নামক ত্রিমূর্ত্তি বিরাজমান। বস্তুতঃ অনেক প্রাচীন জাতির ধর্ম্মের মধ্যে এই প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। জরোষ্ট্রীগণের আহুর মার্জদা ত্রিভাবে বিকাশ পাইয়াছিলেন। প্রাচীন মিশরবাসীদিগের ভিতরও দেবতাত্রিতয় অসিরিস্, আইসিস্, ও হোরাস্ (পিতা, মাতা, ও পুত্র) এর স্থান সর্ব্বদেবতার উপর। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তি কোন্ ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন, তবে আর্থার লেলি প্রমাণ করিয়াছেন, যে ইহা বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তির অনুরূপ "বুদ্ধ" ও "ধর্ম্মের" মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ এবং সঙ্ঘ উভয়ের সম্মিলনকারী পবিত্র আত্মাকে বুঝায়।

বুদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্বতঃই প্রতীয়মান হয়, যে, একের উপদেশ অন্য হইতে গৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধদেব বা যীশুখৃষ্ট কেহই কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই, উভয়েরই শিষ্য সংখ্যা দ্বাদশ, উভয়েই সমভাবে শিষ্যবৃন্দকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে বলিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের গল্পচ্ছলে উপদেশ দিবার নিয়ম অবিকল বুদ্ধদেবের অনুকরণ। প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মে এমন কোন আদর্শই দৃষ্ট হয় না।

বাইবেলের দশ-আজ্ঞা সকলেই জানেন, মনুর মতেও ধর্ম্মলক্ষণ দশবিধ—

"ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥"

(মনু ৬, ৯২)

আবার "প্রতিমোক্ষ সূত্রে" আমরা নিম্নলিখিত বৌদ্ধ দশআজ্ঞা দেখিতে পাই :—

১। হত্যা করিবে না। ২। অপহরণ করিবে না।
৩। শীলভঙ্গ করিবে না। ৪। মিথ্যা বলিবে না।
৫। বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে না। ৬। শত্রুরও মরণাকাঙ্ক্ষা করিবে না।
৭। পরধনে লোভ করিবে না। ৮। অবাচ্য বলিবে না।
৯। বিলাসী হইবে না। ১০। দানগ্রহণ করিবে না।

মথি লিখিত "সুসমাচারে" (১৯ অধ্যায়) দেখিতে পাই খৃষ্টশিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গুরুদেব! কি উপায়ে অনন্ত জীবন লাভ করা যায়?"

খৃষ্ট উত্তর করিলেন; "আজ্ঞা পালন কর।" কোন্ কোন্ আজ্ঞা? "হত্যা করিবে না, পরধন অপহরণ করিবে না, পরদার গ্রহণ করিবে না, মিথ্যা সাক্ষী দিবে না।"

আবার "পিটকাট্যনে" দেখিতে পাই—বুদ্ধশিষ্য বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বোধি লাভের উপায় কি? কি উপায়ে উপাসক হওয়া যায়?" বুদ্ধ বলিলেন, 'বিধি প্রতিপালন করা' 'কোন কোন্ বিধি'—'হত্যা করিবে না, অপহরণ করিবে না, সত্যের অপচার করিবে না, ব্যভিচার করিবে না।" সেই একই উত্তর, কেবল স্থান কালের প্রভেদ। উপদেশ ছাড়িয়া দিয়া গল্প বা উপাখ্যান ভাগ দেখিলে, আরও বিস্ময়কর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

খৃষ্ট ও বুদ্ধদেবের জন্ম বৃত্তান্ত প্রায় একরূপ। উভয়েরই জন্মের পূর্ব্বে দৈববাণী হইয়াছিল, উভয়েই কুমারী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ললিত বিস্তরের মতে বুদ্ধদেবের মাতাও দ্বাত্রিংশত মাস কাল যাবৎ কুমারী ছিলেন।

অসিত ঋষির ন্যায় সেণ্ট সিমিয়নও নবপ্রসূত বালককে দেখিয়া অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন। 'মিরাকেল' বা অলৌকিক কাহিনী উভয়েতেই আরোপিত হইয়াছে। মারের সহিত বুদ্ধদেবের যুদ্ধ, খ্রীষ্টের সয়তান জয়ের অনুরূপ।

আবার হিরোড কর্ত্তৃক শিশুনিধন, কংসের বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দেয়। কালীয়দমনের ন্যায়, খৃষ্টও সর্পের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন এবং অন্তিম

কালে কৃষ্ণ বৃক্ষারূঢ় হইয়া শরাহত হওয়ায় কতকটা ক্রুশবিদ্ধেরই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সব সংঘটন কখনই আকস্মিক কারণপ্রসূত নহে, ইহার ভিতর অবশ্যই কোন সত্য আছে। এক ধর্ম্মের ভাব অপর ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। তবে একের অনুকরণে অপরের গঠন হয় নাই ইহা নিশ্চয়, কারণ সাদৃশ্যের মধ্যে বিভিন্নতাও যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

খৃষ্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই যে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে সুদূর ইউরোপে শ্রমণগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান খোদিত লিপিতে অ্যান্টিয়োকাস্, টলেমি প্রভৃতি নাম দৃষ্টে জানা যায় যে তাঁহার প্রেরিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর প্রভৃতি রাজ্য অতিক্রম করিয়াছিল, সুতরাং এই সময়ে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনতিকাল পরেই আমরা সিরিয়া ও মিশরে এক অভিনব ধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্ট হইতে দেখিতে পাই, ইহাঁরা থিরাপিউটস বা এসেনিস্ নামে অভিহিত হইতেন। ইহাঁদের আচার ব্যবহার সমস্তই বৌদ্ধ যোগীগণের মত। ডিন্ ম্যানসেল ইহাঁদিগকে ভারতীয় ধ্যানপরায়ণ যোগীগণের বংশ সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তাঁহারা বৌদ্ধদিগের ন্যায় নিরামিষাশী ছিলেন, কখনও জেরুজেলামের বলিদান উৎসবে যোগ দিতেন না। তাঁহারা বৌদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং সপ্তসম্বোধিতে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বৌদ্ধ "অভিষেকের" ন্যায় ব্যাপটিস্ম্ প্রথা প্রচলিত ছিল।

স্বভাব ইতিহাস লেখক প্লিণী এসেনিসদিগের বর্ণনাকালে লিখিয়াছেন—"ডেডসির পশ্চিমে, নিভৃত স্থানে এসেনিসগণ বাস করিতেন; অর্থ ও স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইহাঁদের কোন সংশ্রব ছিল না—প্রত্যহ সহস্র সহস্র সংসারতাপদগ্ধ নরনারী ইহাঁদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে আসিত। এবং যদিও তাঁহারা সকলেই অকৃতদার ছিলেন তথাপি তাঁহাদের সংখ্যার হ্রাস কদাচ দেখা যাইত না।"

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই যে, খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করে, এবং ভারতীয় যোগীগণের অনুরূপ এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ গল্প, গাথা,

উপদেশ সমূহ বহুল প্রচার হয়, ও পরিশেষে ইহুদি জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

যখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এরূপ সম্বন্ধ ছিল, তখন অন্য দ্রব্যের ন্যায় ধর্ম্ম ভাবেরও রপ্তানী হইতে পারে, ইহা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে প্রাচীন কালে ভারতই যে গুরুর আসনে উপবিষ্ট ছিল এবং অন্যান্য জাতিবৃন্দ জ্ঞানার্থী শিষ্যের ন্যায় তাঁহার চরণতলে সমাগত হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ।

লেখক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর।

এস এস, দয়াময়!
এস এস হৃদে হেরি আঁখি মুদে
দুঃখ তাপ হোক ক্ষয়
আনন্দ-ময়ের আনন্দ-কণিকা পানেতে আনন্দময়!
এস নদীয়ার চাঁদ এস!
এস পাতক বারণ দুঃখনিবারণ শচীর রতন এস!
জীবতাপ হেরি ওহে প্রেমময়! ব্যথিত হইলে—দিলে সুধাময়
"হরিনাম" গান, করি দিলা প্রাণ ভারত সন্তান গণে,
মূরখ বিদ্বান যবন ব্রাহ্মণ শরণ লইল মনে।
কাঞ্চন প্রতিমা গৌর শোভিছে নদীয়া কমল মাঝে,
শত শত নারী, অপাঙ্গে নেহারি, বলে "আহা কিবা রূপ মনোহারী"
মন্মথ-মথন শচীর নন্দন রতিপতি হেন সাজে!
অদ্বৈত নিতাই এস!
প্রভুর তনুরে বেড়িয়া আদরে পাশে তাঁর সুখে বস।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ মিলিত হইয়া, অগুণ ব্রহ্মা সগুণ মিলিয়া
এস দয়াময়! এস প্রেমময়!
জীবন জুড়াও এস!

হরিদ্বারের দিনপঞ্জিকা।

লেখক—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বসু।

হৃষীকেশ—লক্ষ্মণঝোলা।

মঙ্গলবার ২৬ শে আশ্বিন ১৩৩৮

আহারাদির পর বেলা আন্দাজ দেড় ঘটিকার সময় আমরা 'হৃষীকেশ' ও 'লক্ষ্মণতীর্থ' পরিদর্শনে বহির্গত হইলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ ১৪ মাইল উত্তরে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য প্রত্যহ অনেকগুলি মোটরবাস গমনাগমন করে। (১) ভাড়া হৃষীকেশ অবধি মাথা-পিছু পাঁচসিকা। কিন্তু বাস আরও অগ্রসর হইতে পারে শুনিয়া আমরা 'স্বর্গাশ্রম' পর্য্যন্ত মাথা-পিছু যাতায়াতের ভাড়া ঠিক করিলাম—দেড় টাকা।

বাস ছুটিল। দুর্ভেদ্য বন-কান্তারের মধ্য দিয়া পথ (পূর্ত্তবিভাগকে এই পথের জন্য ধন্যবাদ!) বনপর্ব্বত ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। (২)—মধ্যে মধ্যে গঙ্গার কলকল্লোল—তরুমর্ম্মর। ড্রাইভারের মুখে শুনিলাম সন্ধ্যার পর এই পথে চলা বিপজ্জনক। বন্য শ্বাপদ অনেকবার তাহার সম্মুখীন হইয়াছে। রাত্রে পথে আলোক দেওয়া হয় না। গো-যান তো আসিতেই পারে না, মোটর-বাসকে টর্চ্চ লাইট ফেলিয়া অনবরত হর্ণ দিতে দিতে চালাইতে হয়। তাহা ছাড়া, পথও মধ্যে মধ্যে বেজায় খারাপ—কোথাও শুষ্ক নদীগর্ভ, কোথাও সঙ্কীর্ণ স্রোতোরাশি। বর্ষাকালে কিরূপে যে যানগুলি অতিক্রম করে তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। ততোধিক বিস্মিত হইলাম, শিবালিক শৈলশ্রেণীর নিসর্গ-বিলাস ও শ্যাম-সমারোহ দেখিয়া। সে ধূমায়িত রহস্যরাজ্যের রূপচিত্র কি অঙ্কিত করিব! আবার সেই তন্ময়তা—যে তন্ময়তা কতবার আসিয়াছে লীলাচঞ্চল গঙ্গার নীলাম্বু-নৃত্য দেখিয়া! ওগো সত্যই—

---

(১) হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ রোড (২৩ মাইল) পর্য্যন্ত Light Train এরও ব্যবস্থা আছে।

(২) তবে যাত্রাপথের বামভাগে উত্তুঙ্গ শৈলশিরে টেহ্‌রী রাজার নবনির্ম্মিত লোভনীয় সৌধটী দেখিয়া আমার Shelley র পংক্তিদ্বয় মনে পড়িয়াছিল—

"fair as one flower adorning
An icy wilderness"

এবং Milton এর—"The Cynosure of neighbouring eyes"

"To her fair works did Nature link
The human Soul that through me ran."

দেখিতে দেখিতে 'ভীমগদা' নামক স্থানে গাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। স্থানটীকে 'ভীমঘোড়া'ও বলা হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, গঙ্গার অবতরণপথ-নির্দ্দেশের উদ্দেশ্যে পাণ্ডুপুত্র (৩) ভীমকে এই স্থানে স্থাপিত করা হইয়াছিল; তাঁহারই অশ্বের ক্ষুরাঘাতে ভীমকুণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। অন্যমতে, ভীম মহাপ্রস্থান-কালে এইস্থানে গদানিক্ষেপ করিয়া যাওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। গদাকৃতি একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরকে (৪) পুরোভাগে পতিত দেখিয়া যে এরূপ জনশ্রুতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। ভীমঘোড়ার গিরিগাত্রস্থ গহ্বরের ঠিক নিম্নদেশ হইতে যে ক্ষুদ্র উৎসটী উৎপন্ন হইয়া নিকটস্থ কুণ্ডটী পরিপূর্ণ করিয়া প্রণালী-পথে গঙ্গার সহিত সঙ্গত হইতেছে, পাণ্ডারা অবোধ যাত্রীদের নিকট ইহাকেই 'গঙ্গোত্তরী' বা গঙ্গা-নির্গমের স্থান বলিয়া বুঝাইয়া থাকে। ভীমেশ্বর মন্দিরটী ক্ষীণাঙ্গ হইলেও দেখিতে সুন্দর।

গিরিবর্ত্ম দিয়া বাস আবার ছুটিয়াছে। করপত্রাকৃতি শিবালিক পর্ব্বত-পুঞ্জ যেন আর ফুরায় না। কিন্তু উহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে মনে হয়, ও যেন আমাদিগকে কুহক-ইঙ্গিতে মায়াচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ইহার আকৃতি বর্ণন করিতে গিয়া Dr. Royle বলিয়াছেন,—"They are formed by a succession of parallel ridges, abrupt towards the plains and sloping towards the Himalayas In many places, each hill, if separated, might be represented by a right-angled triangle, the base resting on the pass, the perpendicular facing towards the S. W.,and theh ypo tenuse sloping towards the N. E." (৫)

(৩) পর্ব্বতকন্দরে পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

(৪) বলা ভাল ইহাতে আঘাত করিলে একপ্রকার শ্রুতিসুখকর শব্দ উত্থিত হয়।

(৫) Natural History of the Himalayan Mts., 1839, vol i, p. xxvii.

সুশিক্ষিত ডাক্তার ও কবিরাজ মহোদয়গণের
মতে প্রস্তুত বিংশবর্ষকাল সুপ্রচলিত
প্রত্যেক মহৌষধাবলীর নাম ও ট্রেডমার্ক হাইকোর্টের সুবিখ্যাত
এটর্নী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ, বি, এল, দ্বারা
আইনানুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে—ক্রেতাগণ
ট্রেডমার্ক দেখিয়া লইবেন।

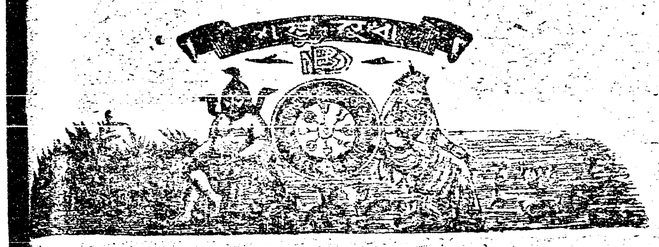

বর্ত্তমানকালে জ্বরোগে যত প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে,—তন্মধ্যে ডাক্তারি মতের ঔষধই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আশু ফলদায়ক তাহা সকলকেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তাই আমাদের পৃষ্ঠপোষক ডাক্তার মহাশয়গণের দ্বারা এই "শম্ভুসুধা" মহৌষধটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। শম্ভুসুধা সেবনে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া জ্বর, নবজ্বর, পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, ঘুস্‌ঘুসে পালাজ্বর, কম্পজ্বর, মেহ ও প্রমেহ ঘটিত জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, অমাবস্যা পূর্ণিমার জ্বর, বাতজ্বর পিত্তজ্বর কফজ-জীর্ণ জটিল জ্বর, পালাজ্বর ও ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার জ্বরই শম্ভুসুধা সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়, এবং পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। শম্ভুসুধা ২।৪ মাত্রা সেবনেই জ্বর বন্ধ হয়, কিছুদিন ব্যবহারে প্লীহা যকৃৎ কমিয়া যায় এবং শরীর হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বরভাব সর্দ্দি কাশী হইলে শম্ভুসুধা একমাত্রা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই দেহের জড়তা দূর হইবে। সুস্থ শরীরে সেবন করিলে টনিকের কার্য্য করে; অতএব শম্ভুসুধা প্রত্যেক গৃহস্থের সর্ব্বদা গৃহে রাখা আবশ্যক, শরীর সামান্য একটু শ্লেষ্মা ভারাক্রান্ত বোধ হইলে একমাত্রা "শম্ভুসুধা" সেবন করিলে শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে। মূল্য প্রতি ৮ আউন্স শিশি ৸০ আনা ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।

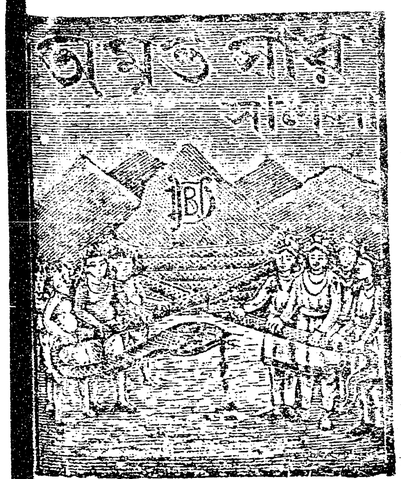

রক্তদুষ্টির ধন্বন্তরী ভগ্নস্বাস্থ্যের
পরমসুহৃদ।

যদি শরীরের দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে চান, তবে "অমৃত সারু সালসা" সেবন করুন। ইহা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতে ও সহজ শরীরে সেবন করা যায়, এবং সেবনের কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইচ্ছামত স্নান আহার কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন। ইহাতে যে সকল দ্রব্য আছে, তাহা অন্য কোন সালসাতে নাই। এমন কি অনেকে হয় ত তাহার নাম ও গুণ পর্য্যন্ত অবগত নহেন। আমাদের অমৃত সালসা" সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সালসা সমূহের মধ্যে যে কয়েকটি গুণ থাকা আবশ্যক তাহা এই "অমৃত সালসা" তেই দৃষ্ট হইয়া থাকে প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা, ডাঃ, মাঃ ।৵০ ছয় আনা।—৬ শিশি ৫।০ টাকা ডা. মাঃ ইত্র, এক ডজন লইলে ১০৲ টাকা।

বিচক্ষণ চিকিৎসক মাত্রেরই মুক্তকণ্ঠে সু-প্রশংসিত ও ব্যবস্থাপিত হাটখোলা দত্ত বাটীর অমূল্যনিধি বিশ্ববিখ্যাত আদি ও অকৃত্রিম যাবতীয় চক্ষুরোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।

বিনা অস্ত্রে ছানি আরোগ্য

পদ্মমধু

কে না জানে চক্ষু না থাকিলে অন্ধের পরগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়?

অতএব চক্ষুপীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিত **পদ্মমধু** ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিধ চক্ষুপীড়ায় বিশুদ্ধ **পদ্মমধু** তুল্য মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইবেন। সাবধান! ক্রয় কালে এন্ দত্ত ব্রাদার্স নাম দেখিয়া লইবেন। মূল্য প্রতি ড্রাম ১৲ এক টাকা, ৩ ড্রাম ২৷৷০ টাকা, ডাঃ মাঃ ৷৵০ আনা। **এন্ দত্ত ব্রাদার্স**

৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট,

আহিরীটোলা কলিকাতা।

জন্মভূমি কার্য্যালয়।

PRINTED By N. DUTTA AT THE JANMABHUMI PRESS
39 MANICK BOSE'S GHAT STREET, CALCUTTA.